স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

'মন ও মানুষ' ধারাবাহিকভাবে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা হয়েছিল ও স্বামিজী মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে যে সকল বিষয় আলোচনা করেছিলেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাদের কিছু কিছু লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং স্মৃতি থেকে সে' সকল আলাপ-আলোচনার অনুলিখনই 'মন ও মানুষ'-এর আলোচ্য বিষয়। চিন্তাশীল ও সাধনসিদ্ধ মহামনীষীদের প্রতিটি কথা ও আলোচনাই মানুষের কল্যাণকর। সুতরাং আশা করি 'মন ও মানুষ' স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যসান্নিধ্য স্মরণ করিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞানের ও আনন্দের সামগ্রী জোগাতে সক্ষম হবে। স্বামী অভেদানন্দজীর কয়েকটি ছবি এতে সন্নিবেশিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
আগষ্ট ১৯৫০

॥ ভূমিকা ॥

শুধু রক্ত মাংস দিয়ে তৈরী মানুষ হলেই তাকে ঠিক ঠিক 'মানুষ' বলা যায় না, তার মধ্যে যদি মন বা চিন্তাধারা, বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ও যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ থাকে তবেই তাকে সত্যকারের মানুষ বলা যায়। ভারতের সত্যদ্রষ্টা ও চিন্তাশীল মনীষীরা বলেন শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা সকলেরই পরিবর্তন আছে, পরিবর্তনের গতিশীল প্রবাহের মধ্যে তারা বিকাশ ও বিনাশের অভিনয় করে, আবার বিকাশ ও বিনাশের অবকাশ বা অন্তবর্তী সময়টুকুতে তারা স্থিতি লাভ করে। এই স্থিতির মধ্যে তারা তাদের জীবন, তাদের কর্মপ্রবাহ, তাদের চরিত্র-মাধুর্য, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান প্রভৃতির পরিচয় দান করে। সুতরাং দু'টি অনন্ত সীমা-রেখার মাঝখানে প্রাণী ও প্রাণস্পন্দনশীল পদার্থমাত্রে তাদের বিকাশের সার্থকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এই প্রমাণ করার পিছনে চলতে থাকে তাদের অফুরন্ত কর্মপ্রবাহ বা জীবন-সংগ্রামের অভিনয়। তারা উন্নতি ও অবনতির বিচিত্র ধারা সৃষ্টি করে ও এ'ভাবে তাদের পৃথিবীতে বাঁচার বা জন্মের সার্থকতা প্রমাণ করে।

মানুষের যাওয়া-আসার অবকাশে মাঝে মাঝে এক একজন মহামনীষী অবতারকল্প পুরুষ বা উন্নতচেতা মানুষের আবির্ভাব হয়। তাঁরা যেন প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মতো। তাঁদের নিজেদের জীবন মহিমময়, আবার অপরের জীবনকে

প্রদীপ্ত ও মহিমান্বিত করার জন্যই যেন মানুষের ছদ্মবেশে তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। এই মহামনীষীদের মধ্যে বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি আছেন। তাঁরা নিজেদের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারার আদর্শ দিয়ে সর্বসাধারণকে পরিচালিত করেন অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে, ভোগ থেকে ত্যাগের দিকে, পার্থিব সংসার থেকে অপার্থিব মুক্তিলোকের দিকে। এ'সকল মহামনীষী বা অবতারপুরুষরা মাঝে মাঝে আসেন, আর সঙ্গে আসেন তাঁদের সাধনসিদ্ধ পার্ষদ পরিকররা। তাঁরা মানুষের বেশেই আসেন, কিন্তু সকল মানুষের সীমায়িত চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভূতিকে প্রদীপ্ত ও প্রসারিত করেন মানুষেরই সমাজে মিশে অথচ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হ'য়ে।

উনবিংশ শতকের প্রদীপ্ত দীপশিখা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কেন্দ্র রচনা ক'রে সে'রকম এসেছিলেন কয়েকজন জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী যাঁরা দেশের ও দশের জন্য রেখে গেলেন পবিত্র আদর্শ ও সেই আদর্শের অনুসারী হ'য়ে কত মানুষ পেলো জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা। 'মন ও মানুষ'-এর নায়ক শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের ছিলেন অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অন্যতম। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা, কর্ম, চিন্তাধারা, বুদ্ধি ও সম্যকবোধির আদর্শ দিয়ে মানুষের জীবনে সৃষ্টি করেছেন তিনি অসীম কর্মপ্রেরণা, আশা, উৎসাহ, আনন্দ ও মুক্তির আকুলতা। তারই জন্য আমাদের প্রণম্য ও বরেণ্য তিনি, তারই জন্য আমাদের বাধা-বিপত্তিসঙ্কুল দুঃখ-সুখময় সংসারে পথপ্রদর্শক তিনি। 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দের বিচিত্র কর্মধারা, জীবন, চিন্তা, বুদ্ধি

ও বোধির অবদান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার অধিকাংশই কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পরিচালিত 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পুস্তকাকারে তা' প্রকাশিত হ'ল অনেক-কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন নিয়ে। এর আগে স্বামী শংকরানন্দ রচিত 'জীবনকথা', স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ সংকলিত 'মহারাজের কথা', লেখক সংকলিত 'তীর্থরেণু', ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য সংগৃহীত 'যেমন শুনিয়াছি', শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী অভেদানন্দ (কালী-তপস্বী) প্রভৃতি গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের বিচিত্র ঘটনা, প্রসঙ্গ ও অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে। 'মন ও মানুষ' গ্রন্থেও তাদের অনেক ঘটনার স্থান পেয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর সন্তান ও শিষ্যদের সামনে আলোচনা-প্রসঙ্গে যেমনটি ভাবে বলেছেন সে' সবেরই অনুলিখন স্থান পেয়েছে এই 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে। জায়গায় জায়গায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তব্য ও শাস্ত্র-আলোচনাকে পরিস্ফুট করার জন্য লেখক কিছুটা মার্জিত ও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ ক'রে সতেরো সংখ্যক স্মৃতির আলোচনাটি তো বটেই।

স্বামিজী মহারাজের আলোচনা ও বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব চাক্ষুষ ও যথাযথ রাখার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং আলোচনার কোন অংশে যদি ত্রুটি দেখা যায় তবে তা' লেখকেরই স্মৃতি থেকে অনুলিখনের ত্রুটি ও বিচ্যুতি। এই গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশ করার জন্য যাঁরা আন্তরিক-ভাবে নানান সহায়তা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি

জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। 'মন ও মানুষ' স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 'মন' বা বিশাল বিচিত্র চিন্তাধারা ও 'মানুষ' তথা অপার্থিব ব্যক্তিত্বকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করতে পারলে অনুলিখনের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রজ্ঞানানন্দ

॥ বিষয় সূচী ॥

॥ মন ও মানুষ ॥

॥ স্মৃতিঃ এক ॥

একটি একটি অংশের সমাবেশে গড়ে ওঠে পরিপূর্ণতার রূপ। রোমনগরী কেন—সকল দেশ, সকল জাতি, সকল সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, ললিতকলা, ধর্ম ও দর্শন এই নীতিকে কখনো অতিক্রম করতে পারে না। স্বামী অভেদানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বময় জীবনের আসল ইতিহাস লেখার বোধহয় এখনো সময় আসে নি, অথচ কোন-কিছু না লিখলে, সামান্য-কিছুও তাঁর ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের পরিচয় না দিলে মনের মধ্যে আশ্বাস ও সান্ত্বনার বাণী কিছু পাওয়া যায় না। অসংখ্য অসংভাবনা ও সংকোচের দুর্বলতাকে স্মরণ ক'রে ও ছোট ছোট আড়ম্বরহীন উপকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে তাই রচনা করতে চাই তাঁর এই স্মৃতির আলেখ্য 'মন ও মানুষ'—তাও মনে করি নির্ভর করছে তাঁরি কল্যাণময়ী ইচ্ছা ও অভয় প্রসাদের ওপর।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক—অন্ততঃ এটাই মনে হ'ত সাধারণ সকলের কাছে। আমরা তাঁর সংগে দিবারাত্র মিশেছি, কত গল্প—কত হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ-আহ্লাদ করেছি, কিন্তু তবুও প্রথম প্রথম মনে যেন কেমন ভয় হ'ত তাঁর সাম্নে যেতে, গা থম্ থম্ করত, ভরসায় ততো কুলাতো না। তবে যো সো ক'রে যদি একবার হাজির হ'তে পারতাম তাঁর সামনে, সকল ভয়ের বোঝা, সকল-কিছু সংকোচের ভাব মন থেকে একেবারে দূর হ'য়ে যেত। তখন স্বামিজী

মহারাজেরও সেই চিরপরিচিতের মতো কথা : ‘কিগো, কেমন আছ ?’ আমরা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিতাম : ‘আজ্ঞে, ভাল আছি’। তিনি হয়তো একটা চিঠি লিখছেন, না হয় কোন কাজ করছেন, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন : ‘বেশ, বসো বসো’। আমাদের তখন চিরনির্ভয়ের ভাব। দূরত্ব ও সংকোচের ভাব তো পরের কথা, ভাবতাম স্বামিজী মহারাজ আমাদের কত আপনার জন, কত আমাদের ভালবাসেন !

এটাই ছিল স্বামী অভেদানন্দের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড় ভাল-মন্দ তাঁর কাছে কিছু ছিল না। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মদ্দো সবাই ছিল যেন এক বয়সের মানুষ, সবার সংগেই ছিল তাঁর প্রাণখুলে মেশা ও অফুরন্ত ভালোবাসা। লুকোচুরি কিংবা আপন-পর ভাব তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্র ছিল না।

একবারের এক ঘটনা। একবার কেন, অনেকবারই ঘটেছে এ’রকম। স্বামিজী মহারাজ কি যেন একটা গুরুতর কথা শুনেছেন। মুখ গম্ভীর, মন একটু চঞ্চল। চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন। কপালের মাঝখানে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা। চোখের চাহনি একটু উদাস। ঠিক এমনি সময় হাজির হ’ল আমাদের একজন তাঁর সাম্‌নে। প্রণাম ক’রে দাঁড়াতেই স্বামিজী মহারাজ তাকিয়ে বল্লেন : ‘কিগো, এসো’। তারপর আবার একটু আন্‌মনা। আগতও দু’একটি কথা ক’য়ে চলে আসার উপক্রম করছে। এমন সময় স্বামিজী মহারাজ বল্লেন : ‘ছাখো, ব্যাপার এই ঘটেছে, তা’ কাকেও যেন কিছু বলো না বাবু’। আগত ঘাড় নেড়ে বল্লে : ‘আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ’। একটা

প্রণাম ক'রে সে এলো বাইরে। সংবাদটা কাকেও বলা হবে না—স্বামিজী মহারাজের আদেশ। তু'একদিন এ'রকম ভাবে কেটে গেল। কিন্তু তারপর দেখা গেল স্বামিজী মহারাজের প্রাইভেট কথাটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই জানে, সবাইকে তিনি ঐ একই কথা বলেছেন: 'ছ্যাখো, কাকেও যেন কিছু বলো না বাবু'।

কি স্বচ্ছ সরল স্বভাব! কি সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি! এ' সরলতার অধিকারী না হ'লে কি মানুষ ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে পারত! কিন্তু সত্য বল্তে কি—আমরা ভাবতাম তখন একটু অন্যরকম। ভাবতাম—স্বামিজী মহারাজের বোধশক্তি হয়তো কিছু কম। পঁচিশটি বছর লণ্ডন আমেরিকার মতো দেশে তিনি কাটালেন কি ক'রে? কাকে কি রকম ক'রে বলতে হয়, কোন্‌টা প্রকাশ্য বা গোপনীয়, কোন্‌টা ভাল বা মন্দ—এটাও কি তিনি জানেন না? কিন্তু এ'কথা তো তখন বুঝিনে যে, পৃথিবীর যা-কিছু ভাল ও মন্দ, পৃথিবীর যা-কিছু পরিবর্তনশীল ও পঙ্কিল, সে সবের মর্যাদা কেবল আমাদেরি মতো সাধারণ মানুষের কাছে, তিনি সে' সবের ছিলেন অনেক উর্ধে! গোপনতা তো তাঁর মাঝে কিছুই ছিল না! পবিত্রতা ও সরলতার তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতীক। তাই যা সত্য, সবার কাছে তা' সহজ সরল মন নিয়ে বলতে তিনি বিন্দুমাত্রও কোনদিন দ্বিধা বোধ করতেন না। গোপনতার ভান তো পাটোয়ারি বুদ্ধিরই নামান্তর!

সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর বিদেশে প্রচার ক'রে স্বামী অভেদানন্দ যখন ভারতে ফিরে এলেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে, সঙ্গে এনেছিলেন তিনি নানান রকমের গ্রন্থ। বেশীর

ভাগ গ্রন্থ ছিল অবশ্য ইংরাজীতে। দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংরাজী-সাহিত্য, নাটক, কবিতা, শিল্প, ললিতকলা, ধর্ম, তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব এই নানান রকম বিষয়ের গ্রন্থ তিনি এনেছিলেন আমেরিকা থেকে। সংস্কৃত গ্রন্থও অনেক ছিল। সে' সব গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্যই কেবল আমাদের হয়েছে, কিন্তু পড়ার সুযোগ কোনদিন হবে কিনা জানি না। খৃষ্টধর্মের গ্রন্থও কম ছিল না। পাশ্চাত্যে খৃষ্টধর্মের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে অনেক সময় প্রচার করতে হয়েছে তাঁকে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন। তাই তাঁর জীবন ছিল শুধু গ্রন্থ-পড়ার জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আত্মানুভূতির প্রদীপ্ত আলোকে চিরসমুজ্জ্বল! যে সব গ্রন্থ তিনি সংগে এনেছিলেন, তাদের কোন কোনটার পাতা খুলে দেখার লোভও আমরা সংবরণ করতে পারিনি। কিন্তু দেখে অবাক্ ও স্তম্ভিত হয়েছি—কি ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই না ছিল তাঁর জীবনে! দেখেছি গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি পাতাতে প্রায় পেন্সিলের দাগ দেওয়া। পাতার ধারে ধারে মার্জিনে অসংখ্য নোট লেখা। ভেবেছি এ-ও কি কখনো সম্ভব হয়? আমাদেরি মতো তিনি পৃথিবীর একজন মানুষ, সারা পঁচিশটি বছর কাটিয়েছেন লণ্ডন, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, বক্তৃতা দিয়েছেন একদিন ও এক জায়গায় নয়—প্রত্যহ তিন চার বার নানান জায়গায়, তা'ছাড়া বই লেখা, বন্ধু-বান্ধব ও আগন্তুকদের সংগে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা, ক্লাশ করা, আশ্রম ও বাগানের কাজ নিজের হাতে করা—এ'সব শেষ ক'রে কখনই বা এত গ্রন্থ তিনি পড়তেন, আর

সময়ই বা পেতেন ক্যামন ক'রে। স্মরণশক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। কবে কোন্ গ্রন্থ পড়েছেন তিনি আমেরিকায় বা লণ্ডনে, আর তার চল্লিশ বছর পরে দেখেছি—হুবহু সব মনে আছে, এতটুকুও ভুল হয়নি।

পড়ার আগ্রহ ও একান্ত নিষ্ঠা স্বামিজী মহারাজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অবিচলিত ও একাগ্রভাবে ধ্যানমৌন সাধকের মতো তিনি গ্রন্থ পড়ে যেতেন, জানার আগ্রহের শেষ আর কোনদিনই তাঁর জীবনে ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'সখি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। সত্যই—জীবনে জানার ও শেখার আর শেষ কোথা! এই আদর্শই আমরা স্বামিজী মহারাজের জীবনে দেখেছি।

তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ বিশ্রামের অবসাদ কিন্তু কোন দিনই আমরা লক্ষ্য করিনি, বরং দেখেছি বিচিত্র কর্ম ও প্রচেষ্টার ভেতর তাঁর নিরলস বিরক্তিহীন অক্লান্ত পরিশ্রম। ইংরাজী ও বাংলা খবরের কাগজ প্রত্যহ তিনি পড়তেন। কাগজের 'কাটিংস্' কাটা থাকত নানান রকম বিষয়ের ওপর। নূতন বই পেলে আনন্দের আর সীমা থাকত না। কোথা কোন্ কাগজে বুক্-রিভিউ (পুস্তক-সমালোচনা) বার হয়েছে, কোথা কোন একটা ইতিহাস, দর্শন বা বিজ্ঞানের নূতন বই ছাপা হয়েছে, তিনি সে সকলের খবর রাখতেন। সকল কাজের ভেতর থেকে একটু সময় পেলেই ধ্যাননিরত সাধকের মতো ছিল তাঁর গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা। যে কেউ তাঁর কাছে আসতেন—অবশ্য বিশেষ জানাশোনা, তাঁকেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন কোন নূতন গ্রন্থ বার হয়েছে কিনা। জানাশোনা লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে পড়াও ছিল তাঁর একটি চিরদিনের অভ্যাস। কেউ হয়তো

এসেছে আমাদের বন্ধুলোক, অমনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন: 'কিগো, এ'বইখানা কি তোমার আছে?' যদি জানতেন আছে, স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সংগে তখুনি বলতেন: 'একবার আমায় দিতে পার পড়ার জন্যে?'

একদিনের এক ঘটনার কথা বলি। আমাদেরি এক বিশেষ পুরাতন বন্ধু স্বামিজী মহারাজের সংগে দেখা করতে এসেছেন। স্বামিজী মহারাজও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কথার প্রসংগে রিজ্ ডেভিড্সের (Rhys Davids) 'বুড্ডিষ্ট ইণ্ডিয়া' থেকে বৌদ্ধযুগের গৌরব-কাহিনী সম্বন্ধে দু'এক কথা তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। বইখানি নাকি স্বামিজী মহারাজ এর আগে একবার মাত্র পড়েছেন। বন্ধুটি উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে হাঁ, আছে'। বইখানির কথা শুনে স্বামিজী মহারাজ বেশ আগ্রহান্বিত হ'য়ে বল্লেন: "দ্যাখো রিজ্ ডেভিড্সের ঐ বইখানা কিন্তু আমি একবার মাত্র পড়েছি। আর একবার কিন্তু পড়া দরকার'। বন্ধুটি শুনে বল্লেন: 'আজ্ঞে, বইখানি যদিও নিজের নয়, তাহলেও আমি এনে দেবো'খন, পড়ুন না'।

আমরা ছিলাম দাঁড়িয়ে পাশে। স্বামিজী মহারাজের ঐ বিনীত আবেদনটি কি যেন কেন আমাদের কাণে বেশ ভাল লাগল না। ভাবলাম—স্বামিজী মহারাজের ওতে প্রেস্টিজেরই বরং হানি হ'ল। এত বড় একজন লোক, ভারতেই শুধু নয়—পৃথিবীর শ্রদ্ধা সম্মান জীবনে অজস্র লাভ করেছেন, অথচ সামান্য একজন লোকের কাছে তিনি ব'লে ফেল্লেন কিনা—বইখানি তিনি একবার মাত্র পড়েছেন। সীমাবদ্ধ সন্দেহলীপ্ত মন আমাদের, তাই ওতেই তখন ভেবেছিলাম যে, স্বামিজী মহারাজের মানসিক দুর্বলতাই

প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এ'কথা তো তখন বুঝিনি যে, অনাবিল সরলতার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান পৃথিবীর যা-কিছু দৈন্য ও মলিনতা—সকলকে করেছেন অতিক্রম, চির-আনন্দ-সত্তায় তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাই মায়িক সংসারের এটিকেট্ আদবকায়দার তিনি অনেক উচ্চে, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ও ঘৃণা-লজ্জা তাঁর কাছে সকলই সমান।

দু'দিন পরে সেই বন্ধুটি এনে দিলেন 'বুটিষ্ট ইণ্ডিয়া' বইখানি। স্বামিজী মহারাজ সে'টি হাতে তুলে নিলেন আনন্দে ও একান্ত আগ্রহভরে। আগন্তুক দু'চারজন ভদ্র-লোকও ছিলেন সে'দিন সেই অফিস-ঘরে। স্বামিজী মহারাজ বইখানি পেয়ে খুব আনন্দিত। তখন সকাল হবে প্রায় সাড়ে দশটা—কি এগারটা। চেয়ারটি ছেড়ে তিনি দাঁড়ালেন উঠে ও সকলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'আজ আপনারা সব আসুন, আমি এবার ঘরে যাব'। ভদ্রলোকরা উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও সকলে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। স্বামিজী মহারাজ বইখানি ও দু'চারটি চিঠি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন ও ঘরের মধ্যে চেয়ারখানি টেনে নিয়ে তামাক খেতে লাগলেন আর 'বুটিষ্ট ইণ্ডিয়া' বইখানি পড়তে শুরু করলেন। তখন দুনিয়ার কোন খবরই আর তাঁর কাছে রইল না!

বইখানি তিনি কাছে রেখেছিলেন কতদিন মনে নেই, কিন্তু পার্থিব শরীর তাঁর যখন চলে গেছে, হতাশ মন নিয়ে আফিস-ঘরের আলমারি দু'টি একদিন পরিষ্কার করছি, দেখেছিলাম চামড়ায় বাঁধানো সে নোটবুকখানি—কয়েকটি পাতায় নোট করা আছে 'বুটিষ্ট ইণ্ডিয়া' থেকে।

সত্য বলতে কি চোখের জল সে'দিন রাখতে পারিনি! আজও সেই নোটবইখানা সর্ববিধ্বংসী কালের গ্রাসে পড়ে নষ্ট হ'তে আমরা দিইনি, যত্নের সংগে তুলে রেখেছি তাঁর স্বর্ণস্মৃতিকে স্মরণ ক'রে!

এ'রকম আর একটা ঘটনার কথা আমাদের মনে আছে। স্বামিজী মহারাজের শরীর যাবার ঠিক পাঁচ দিন—কি ছ'দিন আগে হবে। আর একখানি বই তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের ওপর। সেটিও পড়া হয়েছিল কতটুকু তা' জানি না, কিন্তু শরীর তাঁর চলে গেলে দেখেছিলাম—বইখানা পড়ে আছে শোবার ঘরে উঁচু টুলটার ওপর। সেটাও তুলে নিয়েছিলাম আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে।

সব-কিছু নোট ক'রে রাখা ছিল স্বামিজী মহারাজের চিরকালের অভ্যাস। যে কোন বই তিনি পড়তেন, বরাবরই নোট ক'রে রাখতেন তার দরকারী অংশগুলো। পরিচয়ও তার পাই বেশী ক'রে—নাড়াচাড়া করি যখন তাঁর ইংরাজী বক্তৃতার ম্যান্স্‌ক্রিপ্টগুলো (পাণ্ডুলিপি)। ছোট ছোট কাগজে অসংখ্য নোট করা আছে পেন্সিলে বা কালিতে বক্তৃতার ধারে ধারে। নূতন নূতন বিষয়ের ওপরও আছে অসংখ্য নোট করা—যা এদেশে (ভারতে) ফেরার পর তিনি লিখে রেখেছিলেন পড়ার সংগে সংগে।

আরও একটি কথা মনে হচ্ছে তাঁর পড়ার প্রসঙ্গ থেকে। নিজে বই পড়েছেন যার অন্ত নেই, নূতন বই পড়ারও আর শেষ ছিল না, কিন্তু আমাদের পড়ার বেলায়ই ছিলেন কি জানি কেন একটু খড়্গহস্ত। তাই সত্য বলতে কি মনে হ'ত তখন, স্বামিজী মহারাজ ছিলেন বোধহয়

একটু একদেশদর্শী, অথবা চাইতেন মঠের কাজেই আমাদের কেবল ডুবিয়ে রাখতে, তাই পড়ার বেলায় ছিল তাঁর বিরাগ, আর কাজের বেলায় খুব অনুরাগ। আমাদের চোখে তো আমরা বড় কম বুদ্ধিমান ছিলাম না! বই বগলে ক'রে বেড়িয়ে পড়্তাম যে যার সব পড়তে। গায়ে থাকত একটা জামা আর চাদর, চাদরের নীচে থাকত বই, কাজেই টের পাওয়া ছিল বড় কঠিন। স্বামিজী মহারাজ যতক্ষণ থাকতেন সামনে, ততক্ষণই থাকতাম আমরা ভারি কাজের ছেলে হ'য়ে, কিন্তু তারপরই ছুটতাম সব পড়ার তাগিদে পণ্ডিত মশাইদের টোলে।

বেদান্ত মঠে পড়াশুনা করি তখন অনেকেই পণ্ডিত মশাইদের টোলে। অধ্যয়ন করি কেউ পাণিনি, কেউ পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কেউ উপনিষৎ, যোগদর্শন বা বেদান্ত-দর্শন! কিন্তু মনে আছে একদিনের এক ঘটনাচক্রের কথা। সকাল তখন হবে ন'টা—কি সাড়ে ন'টা। পাব্লিকেশন-ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চে বসে দু'তিনজন আমরা খবরের কাগজ পড়্ছি। খবর দিলেন এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী মহারাজঃ 'ব্যাপার বড়ই গুরুতর, স্বামিজী মহারাজ ভীষণ রাগ করেছেন'। আমরা তো গেলাম একেবারে হতভম্ব হ'য়ে। হাতের কাগজ গেল মাটিতে পড়ে। ব্রহ্মচারিজীকে ভয়ে অথচ উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কেন ভাই, হয়েছে কি?' ব্রহ্মচারিজীর মেজাজ দেখলাম তখন একটু চড়া, কথার সুরও বেশ সপ্তমে বাঁধা! তিনি বল্লেন: 'হবে আর কি? ঐ একটা কি ন্যায়ের নোটবুক পাওয়া গেছে তাঁর সেল্‌ফ সাফ করার সময়ে'। শুনে আমাদের অন্তরাত্মা গেল শুকিয়ে। ব্রহ্মচারিজী

বিরক্তস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন : 'কই যাবেন না? মহারাজ যে ডাকছেন?' আমরা বল্লাম : 'ভাই বলগে, স্কুলের এখন জীষণ কাজ। যাব একটু পরে'। ব্রহ্মচারিজী ব্যাপার-স্যাপার দেখে গজ্ গজ্ করতে করতে অন্তর্ধান হলেন। আমরাও বাঁচলাম একটু হাঁফ ছেড়ে। তবে সে জায়গায় আর অপেক্ষা করা সমীচীন বোধ করলাম না, কি জানি কেন আবার যদি স্বামিজী মহারাজ পাঠান ব্রহ্মচারীকে জরুরী তলব দিয়ে! সরে পাড়ার সকলে উদ্যোগ করতে লাগলাম, কিন্তু এমন সময় শুনলাম স্বামিজী মহারাজের এক বেজায় ধমকের শব্দ। গলার আওয়াজ কিছু-কিছু শোনাই যাচ্ছিল নীচে থেকে। সুতরাং কৌতুহল হ'ল আরো কিছু শোনার আড়াল থেকে, অথচ ভয়ও হচ্ছিল পাছে এসে পড়ে আবার ব্রহ্মচারী ধমকের চোটে। তাহলেও শোনার আগ্রহটাই ছিল বেশী। দাঁড়ালাম তাই সিঁড়ির নীচে গিয়ে। অবশ্য সকল কথা শোনা যাচ্ছিল না সেই বাতাসহীন ছোট্ট জায়গাটি থেকে। কেবল এইটুকুই মনে আছে যা শুন্‌তে পেয়েছিলাম : 'ছেলেগুলোর সব মাথা গেল! কেবল নব্যন্যায়ের কচকচি আর রাজ্যের সব উদ্‌ভুট্টি উদ্‌ভুট্টি বই পড়া। আরে বলি যা তা শোন্ না কেন। শুধু পড়ে কি আর ভগবান লাভ হয়? জ্ঞান, ভক্তি, বিচার ও ভগবানে অনুরাগ এ'সব লাভ কর্ আগে, তা নয় দিনরাত্তির কেবল আজে-বাজে ক'রে সময় কাটানো, গল্প আর আড্ডা'। সে'দিন তো গেলো কোন রকমে কেটে। আর একদিনের এক কথা। সে'দিন আমাদের অবস্থা হয়েছিল আরো শোচনীয়। স্বামিজী মহারাজের শরীর যখন ভাল ছিল তখন প্রত্যহই বেড়াতে বেরুতেন তিনি বিকালে। একদিন

বেরিয়েছেন বেড়াতে, সংগে কেউ নেই। আমরাও ফিরছি তখন পণ্ডিত মশাইয়ের টোল থেকে মুক্ত বিহংগের মতো। বগলে রয়েছে একখানা বই আর খাতা। স্বামিজী মহারাজ যে যাচ্ছেন সে' রাস্তা দিয়ে—খেয়ালই নেই সে'দিকে। অবশেষে পড়্‌লাম একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি। স্বামিজী মহারাজ কিন্তু বল্লেন না কোন কথা? তাকালেন মাত্র একবার, তারপর চলে গেলেন নিজের গন্তব্য পথে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের চিরকালের অভ্যাস। রাস্তা দিয়ে যখন তিনি চলতেন, কথা কইতেন না তিনি কারু সংগে কখনো। সকল সময়ই প্রকাশ পেত তাঁর জীবনে ধ্যানঘন একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার ভাব।

স্বামিজী মহারাজ বেড়িয়ে ফিরলেন সন্ধ্যার কিছু পরে। সে'দিন ছিল প্রতিপদ-তিথি। সরু কাস্তের মতো চাঁদখানি ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশের কোলে। কালো অন্ধকারের নিবিড়তা হয়েছে আরো গভীর। আমরাও ধরে নিলাম আমাদের ভাগ্য-গগণ সে'দিন দুর্যোগপূর্ণ। স্বামিজী মহারাজ ফিরে জামা-কাপড় ছাড়লেন শোবার ঘরে গিয়ে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর এসে বসলেন আফিস-ঘরের চেয়ারে। তামাক দিয়ে গেলেন তাঁর সেবক। আগন্তুক ভদ্রলোক ছিলেন দশ বার জন হবে। রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করলেন তিনি তাঁদের সঙ্গে। তারপর ফিরে এলেন আবার শোবার ঘরে ও ডুবে গেলেন বই পড়ার আনন্দে!

প্রতিদিন সকালে স্বামিজী মহারাজের কিছুক্ষণ বেড়ানো অভ্যাস ছিল। মঠের পেছনের দিকে আছে খানিকটা খালি জায়গা। তারি পূর্বদিকে ছিল বিরাট একটা টিনের

দোতলা চালা।[১] একতালার সমস্তটাতে ছিল মঠের লাইব্রেরী ও ফ্রি-রিডিং রুম। প্রতিদিন সকাল সাতটা কি—সাড়ে সাতটার সময় তিনি নেমে আসতেন একটি ছড়ি হাতে সিঁড়ি দিয়ে। গ্রীষ্মকালে গায়ে থাকত একটা গেঞ্জি ও চাদর, আর শীতকালে গায়ে দিতেন তিনি গরম একটি পশমী জামা ও আলোয়ান। সিঁড়ি দিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে বলতেন: 'কই, বৃন্দাবনের সখিরা সব গেল কোথা?' প্রভাতে নব-জাগরণের বাণী নিয়েই যেন আহ্বান জানাতেন তিনি আমাদের সকলকে! আমরাও অনুভব করতাম তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, আর প্রাণের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ত এক নব প্রেরণাময়ী পবিত্র ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা!

সেই দিনকার সকালের কথাই বলি স্মরণ ক'রে। তিনি নেমে এলেন দোতলা থেকে ধীরে ধীরে। আমরা ছিলাম সবাই লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ পড়ায় ব্যস্ত। সোজাসুজি মাঠে গিয়ে আপন মনে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। আমরা পড়লাম একটু মুস্কিলে। মহারাজ পায়চারী করলেন দশ—কি বার মিনিট হবে। তারপর ফিরে তাকালেন একবার আমাদের দিকে। আমরাও প্রণাম ক'রে দাঁড়ালাম স্বামিজী মহারাজের পাশে গিয়ে। আমাদের দিকে চেয়ে তখন তিনি বল্লেন: 'কিগো, কাল

১। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামিজী মহারাজের পার্থিব শরীর অন্তর্হিত হয়। তার ঠিক এক বছর পরে সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪০ খৃষ্টাব্দ) দোতালা টিনের চালাটি পুড়ে যায় ইলেকট্রিক্ ফিউজ হ'য়ে। এখন সেখানে তৈরী করা হয়েছে একটি একতালা টাইল-সেড। সেখানে আছে লাইব্রেরী ও লেকচার হল।

আসছিলে কোথা থেকে?' আমরা একটু ইতস্তত: ক'রে বল্লাম: 'আজ্ঞে, গিছ্লাম ঐদিকে'। স্বামিজী মহারাজের মুখে ফুটে উঠ্ল গাম্ভীর্যের মধ্যেও একটু চাপা হাসি। তিনি পায়চারী করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'হ্যাঁ তাতো বুঝেছি, কিন্তু হাতে একটা কি ছিল দেখলাম?' আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে, বই।'

—'ওঃ, কেন, কোথাও পড় নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কি পড়?'

—'ঐ পণ্ডিত মশায়ের কাছে একটু যাই মাত্র, কিন্তু পড়া আর তেমন হয় কই'।

স্বামিজী মহারাজ শুনে বল্লেন: 'তা' তো বটেই, সত্যিকার পড়া আর হয় কৈ? তা' বেশতো তোমরা পড়ছ তাতে আর আমার আপত্তি কি। তবে পড়ার সংগে সংগেও চাই সাধন-ভজন। কেবল বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, নাম-যশ পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবদ্-সাধক হওয়া যায় না। শুক্‌নো পাণ্ডিত্যকে রামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন আলুনি। পড়া তো কেবল বিচারের জন্যে, চিত্তশুদ্ধির জন্যে, ভগবানকে ক্যামন ক'রে লাভ করবে তারই উপায় জানার জন্যে। নইলে বিচারহীন, বিবেক-বৈরাগ্যহীন পড়া ও পাণ্ডিত্য অবিদ্যার সামিল। ভগবান লাভ করাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাই পড়ার সংগে সংগে চাই বিচার-বুদ্ধি ও সত্যিকারের অনুভূতি। এখনই হ'ল তোমাদের পরিশ্রম করার সময়। এর পর তো কেবল পেন্‌শান ভোগ গো। এখন যতটুকু পরিশ্রম করবে তার ফল ভোগ করবে পরে।

আসলে বিচারবিহীন পড়া ও পাণ্ডিত্যের ওপরই স্বামিজী মহারাজের বিরাগ ছিল, কিন্তু শুদ্ধবিচার ও চিত্তশুদ্ধির জন্য পড়ার ওপর ছিল তাঁর একান্ত অনুরাগ। বলতেনও তিনিঃ 'বই পড়লে বুদ্ধির বিকাশ হয়, বুদ্ধিরই শুধু খেলা, কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে গেলে বুদ্ধির এলাকা পার হ'তে হবে। ভগবান কখনো কারু বিদ্যার ঐশ্বর্য দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের মন বা হৃদয়কে। ধর্ম-জীবনে উন্নতি করতে গেলে মনকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে হয়। প্রথম প্রথম তাই সাধন-ভজনে মন দিতে হয়। মন তৈরী হ'লে তখন আর কোন-কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তখন পড়তে ইচ্ছে হয় পড়, কিন্তু পড়া হবে তখন আত্মবিচারের জন্যে, জগতের কল্যাণের জন্যে—স্বার্থসিদ্ধি বা পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্যে নয়'।

স্বামিজী মহারাজের মনের বহির্বিকাশটা ছিল সাংসারিক ভাল-মন্দ বা আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বরূপের সংগে মেশানো। তাই যেমন পছন্দ করতেন না তিনি বিবেক-বৈরাগ্যহীন শুষ্ক জ্ঞান-বিচারকে, তেমনি ভালবাসতেন না বিদ্যা-বুদ্ধিহীনতার গাঢ় অন্ধকার ও পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার। তাঁর ক্ষমাসুন্দর চক্ষে চির-উদ্ভাসিত ছিল প্রসারতার মহিমোজ্জ্বল মূর্তি, আর উৎসারিত ছিল দিব্যজীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের অপ্রতিদ্বন্দ্বহীন গতি। পূর্ণতাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ। বাইরের আড়ম্বর ও পল্লবগ্রাহীতাকে তিনি কোনদিনই প্রশংসা করতেন না। তাই কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যবিলাসী পড়ার তিনি ছিলেন যেমন বিরোধী, তেমনি বিচার-নিষ্ঠাযুক্ত পড়ার ছিলেন আবার পরম-অনুরাগী। কতবারই না তিনি বলেছেনঃ 'ত্যাখো, মূর্খের

কখনো ধর্ম হয় না—ভগবান লাভ তো পরের কথা। জানার আগ্রহ যার যত বেশী সে ততই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। আত্মানুভূতিই আসলে পূর্ণতার রূপ। শিখব না কিছু, জান্‌ব না বা করব না কিছু—এতো মহা-তমোগুণের লক্ষণ। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) গিয়ে ছ্যাখো না—জ্ঞানের মর্যাদা ওরা ক্যামন ক'রে দেয়। ওদেশে লিখতে পড়তে জানে একশো জনের ভেতর আশী নব্বই জন লোক। খবরের কাগজ পড়ে, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিতভাবে বই দেওয়া-নেওয়া ক'রে দেশ-বিদেশের কত-কিছু বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু এদেশে (ভারতবর্ষে) তার তুলনায় কত কম। এদেশে সবাই সাজতে চায় পণ্ডিত, অথচ শেখার বা জানার আগ্রহ অধিকাংশেরই নেই।

॥ স্মৃতি ঃ দুই ॥

একদিন রাত্রিবেলার কথা। স্বামিজী মহারাজ তামাক খাচ্ছেন তার অফিস-ঘরটিতে বসে। রাত্রি তখন আটটা হবে। ঘরে আছি মাত্র আমরা তিন চার জন। একজন ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন স্বামিজী মহারাজকে। লোকটিকে দেখে মনে হ'ল তিনি আসছেন নূতন, আমরাও তাঁকে দেখিনি এর আগে। স্বামিজী মহারাজ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন স্বাভাবিক শিষ্টাচার ও বিনয়ের সঙ্গেঃ 'মশায়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?' স্বামিজী মহারাজের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই ছিল তাই। কাকেও তিনি 'তুমি' বা 'তুই' ব'লে সম্বোধন করতেন না একান্ত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আগে থেকে না থাকলে। সম্বোধনের এ' শিষ্টতা যে কেবল অপরের বেলায়ই ছিল তা' নয়, আমাদেরও তিনি সম্বোধন করতেন ঠিক ঐ একই রকমভাবে। যেমন কাকেও তিনি বলতেন 'তুমি', আবার কাকেও বলতেন 'তুই'। তা' ছাড়া বাইরের লোকদের সাম্‌নে আমাদের সকলকেই তিনি সম্বোধন করতেন 'ইনি' বা 'তিনি' বলে। যেমন আমাদেরি একজনকে কোন ভদ্রলোকের সংগে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বল্লেনঃ 'দেখুন, ইনি ভারী পণ্ডিত লোক। আসবেন, এঁদের সংগে মিশবেন, আলাপ-আলোচনা করবেন, মনে আনন্দ পাবেন' ইত্যাদি।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি যে ছিল অপরিচিত তা' আগেই বলেছি। স্বামিজী মহারাজও কোন আবশ্যকতা বোধ করলেন না তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করার জন্য। দেখে মনে হ'ল লোকটি একটু উদ্‌গ্রীব কোন-কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য।

স্বামিজী মহারাজ তাঁর আগেই জিজ্ঞাসা করলেন : 'তা মশায়ের জিজ্ঞাসার কোন কিছু আছে না কি ?' ভদ্রলোকটি উত্তর করলেন : 'আজ্ঞে হ্যাঁ—মনে যদি কিছু না করেন'।

স্বামিজী মহারাজ ভদ্রলোকটির সংগে দু'এক কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার বেশ একটু আন্‌মোনা হ'য়েও পড়ছিলেন। মনে যতটুকু আছে—তখন চৈত্রমাস। গরম বেশ পড়েছে। আফিস-ঘরের পশ্চিম দিকের দুটো জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল ধীরে ধীরে দখিন বাতাসের ঢেউ। মাথার ওপর ঘুরছিল ইলেক্‌ট্রিক পাখা। অম্বুরি ও বিষ্ণুপুরীতে মেশানো তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ঘরটিও বেশ মস্‌গুল হয়েছিল। ভদ্রলোকটির কথা শুনে স্বামিজী মহারাজ হাসিমুখে বল্লেন : 'না না, সে কি কথা। জিজ্ঞাসা করবেন বৈকি ?

ভদ্রলোকটি কি যেন কেন একটু ঢোক গিলে তখন বল্লেন : 'আ—জ্ঞে দেখুন, আপনাদের এই চে—য়া—র টে—বি—ল আমাদের চো—খে—।' স্বামিজী মহারাজ সহাস্যে ভদ্রলোকটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন : 'হ্যাঁ বুঝেছি, আপনার বক্তব্য হ'ল আমরা সাধু-সন্ন্যিসী মানুষ। কোথায় থাকবে গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা, হাতে চিম্‌টে বা ত্রিশূল, গলায় মোটামোটা দানাদার রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বিভূতি বা সিন্দুরের ফোটা, চারপাশে ধুনিজ্বালা আর শিষ্য-সামন্তে ঘেরা, তা' নয় সাহেবী চাল-চলন ও আদবকায়দা নিয়ে চেয়ার-টেবিলে বসা, ফিট্‌ফাট পোষাক পরা, বাবুর মতো বসে গড়্‌গড়ায় তামাক খাওয়া সত্যিই বড় অশোভনীয়, আর অসহনীয়ও বটে। এ' তো ন্যায্য কথাই আপনি বলেছেন, বলাও উচিত। কিন্তু আমরাই বা কি করি বলুন দেখি ? ভিক্ষে-

সিক্ষে ক'রে এই চেয়ার-টেবিলগুলো কিনেছি, আপনারা তো আর নিজেদের ইচ্ছায় দেবেন না কোন-কিছু! সুতরাং শুধু বলায়ই বা কি ফল হবে বলুন? তা' ছাড়া দেখুন একটা কথা, বাদশাহী আমলের টাকা এ' যুগে চলে না নিশ্চয়ই জানেন। সমাজটা বদলাচ্ছে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিকে নিয়ে অনবরত। মানুষ চায় এখন বিচার ক'রে সব বাজিয়ে নিতে। তাই মডার্ন আদবকায়দা এখন দরকার বৈকি একটু'।

তারপর সামনের দিকে টাঙানো 'কালী-তপস্বী' ছবিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বল্লেন: 'ঐ দেখুন দেখি, ওটা কার ছবি। চিনতে পারেন?' ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ অথচ উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে ছবিটির দিকে চেয়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে না, ঠিক চিনতে পারছি না'। স্বামিজী মহারাজের মুখ বেশ প্রশান্ত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তর্জনী আঙুলটি নিজের দিকে দেখিয়ে বল্লেন: 'ওটি হচ্ছেন ইনি—যিনি এই চেয়ারে এখন বসে আছেন। রামকৃষ্ণদেবের শরীর যখন গেল, অনেকেই তখন যেদিকে খুসী বেরিয়ে পড়ল। আমিও তাই করলাম। ওটা আমারই পরিব্রাজক অবস্থার ছবি। তখন একখানি মাত্র কাপড় ছিল আমার সম্বল। পয়সা-কড়ি ছুঁতাম না। এক বাড়ী বা তিন বাড়ী মাধুকরী ক'রে যা জুটত তাই খেতাম। এই ক'রে আসমুদ্রহিমাচল সারা ভারতবর্ষটা খালি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। এখনই না হয় দু'একটা চেয়ার টেবিল হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের আমি কি বলি জানেন? বলি—তোমাদের আদর্শ হবে ঐ কপর্দকহীন একটি বস্ত্রমাত্রসম্বল পরিব্রাজক কালী-তপস্বী, চেয়ার-টেবিলে বসা এ' বয়সের অভেদানন্দ নয়'।

ভদ্রলোকটি একেবারে নির্বাক। ঘরটির পরিবেশ জমাট

গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। স্বামিজী মহারাজ যেন একটু আন্‌মনা; প্রদীপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল। এক মিনিট—কি দু'মিনিট চুপ ক'রে থেকে আবার তিনি বলতে লাগলেন: 'ত্যাগ, তপস্যা, ভগবানে অনুরাগ এ'গুলোই আসলে সাধুর লক্ষণ। বাইরের ভড়ঙ্ তো লোকদেখানো মাত্র। ভেতরের ত্যাগই ত্যাগ। যথার্থভাবে যারা ভগবানের জন্যে ত্যাগ করেছে তারাই ধন্য, তারাই জানবেন ঠিক ঠিক ভোগ করতে জানে। তারা ভোগ করে, কিন্তু ত্যাগের প্রোজ্জল আলোকে তাদের স্বার্থের অন্ধকার একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়। নিরাসক্ত তাদের ভোগ তখন জগতের কল্যাণের জন্যেই হয়, বিলাসিতার জন্যে নয়'।

ভদ্রলোকটি তখন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়েছেন ব'লে মনে হ'ল। তাঁর মুখে অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য ক'রে স্বামিজী মহারাজের হৃদয়ে যেন করুণার ভাব ফুটে উঠেছে। সত্যকার সমবেদনার সুরে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন ক'রে তিনি বল্লেন: 'তা আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আপনি তো ঠিকই বলেছেন—সাধু-সন্ন্যিসীর জীবনে সাংসারিক ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার ভাব পোষণ করা মোটেই সমীচীন নয়'।

তারপর স্বামিজী মহারাজ ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে গান করতে লাগলেন,

আপনাতে আপনি থেকো, যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

* * * *

পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।
(ও-মন) কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥

ভগবানের কাছে যে যা চাইবে—তাই পাবে। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ত্যাগ, বৈরাগ্য আর মুক্তি চেয়েছিলাম, তিনি আমাদের সে চাওয়া পূর্ণ করেছেন। তিনি পরশমণি, স্পর্শ ক'রে আমাদের সোনা ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বোলে আমরা যা করব, অন্যের পক্ষে তা' হুবহু অনুকরণের জিনিস নয়। ভগবানের ওপর আত্মসমর্পণের ভাব না এলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় কখনো কিছু করতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা সবই সঁপে দিয়েছিলাম —তনু, মন, বুদ্ধি সবই। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাই আমাদের ভার নিয়েছেন, বেতালে আর পা ফেলতে দেন না'।

ভদ্রলোকটি তারপর স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। স্বামিজী মহারাজও স্বস্নেহে তাঁকে বল্লেন: 'আবার আসবেন'।

স্বামিজী মহারাজের সে'দিনকার ভাব দেখে আমরা সকলে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম! স্পষ্টবাদীতার সংগে সংগে ভালবাসা ও করুণাপূর্ণ হৃদয়-বিনিময়ের ভাব সংসারে যথার্থই বিরল। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর প্রতিভা, বিরাট বিপুল ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে বিচারে কথায় গল্পে হাসি-ঠাট্টা-তামাসায় সকল-কিছুতেই তিনি ছিলেন কত মহান্! কোন-কিছু বিষয়ে দৈন্য তাঁর জীবনে আমরা কখনো দেখিনি। রক্ত-মাংসে গড়া আমাদেরি মতো ছিলেন মরণশীল মানুষ, আমাদেরি মতো করতেন আহার-বিহার, বলতেন কথাবার্তা, অথচ জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় ছিলেন আমাদের চেয়ে কত বড়। তারপর এতগুলি গুণ ও শক্তির সমাবেশ একটিমাত্র মানুষেই বা সম্ভব হ'তে পারে কিভাবে এটাই হয়েছিল তখন যেন আমাদের একটা

গবেষণার জিনিস। বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল পরিপূর্ণ। গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সূক্ষ্মচিন্তা ও বিচারশীলতা, বিরাট অনুভূতি ও আধ্যাত্মিকতার সংগে সংগে সাংসারিক খুঁটিনাটির জ্ঞানও ছিল তাঁর জীবনে অপরিসীম। মোটকথা সকল অভিজ্ঞতার তিনি ছিলেন যেন প্রশান্ত মহাসাগর। ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি শাখা, গ্রীক ও য়ুরোপীয় দর্শনের খুঁটীনাটি, তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান, ধর্ম ও বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, কাব্য, নাটক ও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্প, উভয় দেশের তুলনামূলক সাঙ্গিতীক বিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও জানতেন তিনি কৃষিবিজ্ঞান ও হাতেনাতে কৃষিকাজ, দর্জীর ও কাঠের কাজ, বাড়ীঘর তৈরী করার নিয়মনীতি ও কাজ, রান্নার কাজ প্রভৃতি। পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে গিয়ে তিনি ওদেশের ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস প্রভৃতি যেমন পড়েছিলেন, তেমনি পড়েছিলেন খৃষ্টধর্ম বিষয়ক বই, যেমন বাইবেল, বাইবেলের যতরকম ভাষ্য টীকা টিপ্পনী হায়ার-ক্রিটিসিজম্। তাছাড়া পড়েছিলেন চার্চের ইতিহাস (এক্লেসিয়েসটিক্যাল্ হিষ্ট্রি) ও ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাসনের বাইবেল ও তার ইতিহাস। এত সব পড়ার সুযোগ-সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন তদানীন্তন আমেরিকার সুবিখ্যাত মনিষী হিবার নিউটনের সুবিশাল লাইব্রেরীতে। হিবার নিউটনের ছিলেন তিনি একজন পরমবন্ধু।

খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল স্বামী অভেদানন্দের কত গভীর লিখে বোঝানো কঠিন। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার পরিপূর্ণ আদর্শ নিয়ে তিনি পদার্পণ করেছিলেন খৃষ্টধর্মপ্লাবিত পাশ্চাত্য ভূমিতে সুমহান্ প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার ও

প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সার্থক হয়েছিল তাঁর প্রচেষ্টা। অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশের সংগে সংগ্রাম করতে হয়েছেও তাঁকে কম নয়। বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া খৃষ্টান পাদরী ও পণ্ডিতদের অপপ্রচার ও অযথা সমালোচনার বিপক্ষে অভিযান চালাতে হয়েছে তাঁকে অজস্রভাবে। কিন্তু অতিক্রম করেছিলেন তিনি সকল বাধা-বিপত্তির ঝঞ্ঝাকে নিজের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়, প্রদীপ্ত ত্যাগ-তপস্যা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও প্রত্যক্ষ আত্মানুভূতির প্রজ্ঞানঘন আলোকে।

শুধুই খৃষ্টধর্ম কেন—সকল ধর্মের ছিলেন তিনি সমান পূজারী। এই নির্বিকার মনোভাবের আদর্শ ও উদারতা লাভ করেছিলেন তিনি তাঁর বিশ্ববরেণ্য আচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। অন্যায় ও অত্যাচার, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা-ধারণা, অযথা ভাবপ্রবণতা ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর মতো। বিজয়লাভও করেছিলেন জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ও প্রচেষ্টায়।

খৃষ্টধর্মের আদর্শের ওপর ছিল স্বামিজী মহারাজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। যীশুখৃষ্টকে তিনি বলতেন একজন পরমযোগী, ঈশ্বরলাভ করেছিলেন যীশুখৃষ্ট মানুষেরি মতো ঐকান্তিক অধ্যাত্ম সাধনার ভেতর দিয়ে। "হাউ টু বি এ যোগী" বা 'যোগশিক্ষা' বইয়ে তিনি 'যীশুখৃষ্ট যোগী ছিলেন কি না' আলোচনায় দেখিয়েছেন: যীশুখৃষ্ট এসেছিলেন তিব্বতের দিক দিয়ে ভারতবর্ষে ও শিক্ষা করেছিলেন ভারতীয় সাধনার পদ্ধতি। খৃষ্টধর্মের ভেতর গোঁড়ামীর ভাবকে স্বামিজী মহারাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) তাই

সোজাসুজি খৃষ্টধর্মসেবীদের তিনি বলতেন: 'আপনারা গোঁড়ামী ছাড়ুন ও সত্যিকারের খৃষ্টান হোন'। তিনি আবার বলতেন: 'খৃষ্টান পাদ্রীরা ও পরবর্তীকালে চার্চের সাম্প্রাদায়িক ও সংকীর্ণ ভাবসম্পন্ন নিয়ম-কানুনই খৃষ্টধর্মকে অনুদার ও বিকৃত করেছে, অথচ খৃষ্টধর্মই শিক্ষা দেয় সার্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেম ও ভালবাসা (universal brotherhood and love)। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ দৃষ্টি থাকবে কেন খৃষ্টধর্মের ভেতর! যীশুখৃষ্ট ছিলেন মহামানব, মানবতার ছিলেন পরিপূর্ণ প্রতীক'।

স্বামিজী মহারাজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন: 'যীশুখৃষ্ট যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গ্যালিলি তখন ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, আর পারসিক, গ্রীসীয়, পীথাগোরিয়ান্, এসেনি, থেরাপুত্ত ও বৌদ্ধ ধর্মের আলোক ছিল সেখানে চির-সমুজ্জ্বল! বৌদ্ধশ্রমণরা ভারতের সকল সংস্কৃতির বীজ ছড়িয়েছিল উত্তর-প্যালেস্তাইনের চারদিকে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দুশো বছর আগে। সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রচার করেছিল মৈত্রী, করুণা ও বিশ্বপ্রেমের ভাব শুধু প্যালেস্তাইন ও সিরিয়াতে নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে। ইহুদী-সম্প্রদায়ের এসেনী ও থেরাপুত্ত সম্প্রদায়ই তার চাক্ষুষ প্রমাণ। যীশুখৃষ্ট আসলে ছিলেন এসেনী-সম্প্রদায়ের লোক! তান্ত্রিক চক্রের অনুষ্ঠান করতেন তিনি পর্বতগুহার ভেতর নিশীথে ও নিরালায় বসে। ঐতিহাসিক নজিরও এর পাওয়া যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের লেখায়। এসেনী 'ঈশানী'-শব্দেরই নাকি অপভ্রংশ। 'ঈশানী' মহাদেবী গৌরী বা দুর্গার এক নাম। দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তিরূপিণী, সুতরাং ঈশানীর উপাসকরা যে ছিলেন

পুরোদস্তুর তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের মতে তন্ত্রবাদ তথা তন্ত্রাচার বেদাচারের সমসাময়িক। এসেনী-সম্প্রদায় যে তান্ত্রিক সাধনার অনুষ্ঠান করতো, চক্রানুষ্ঠান ও নিভৃত-সাধনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসেনীকে অনেকে আবার 'ঈশাহী'-সম্পদায়ভুক্ত বল্‌তে চান।

এসেনী ও বৌদ্ধশ্রমণদের আচার-ব্যবহার ও সাধনার ভেতর বেশ কিছুটা মিল পাওয়া যায়। থেরাপুত্তবাদ বৌদ্ধধর্মেরি নাম ও রূপান্তর। ('থেরাপুত্ত' নাম পালিশব্দ থেকে এসেছে। সংস্কৃতে এর নাম 'স্থিরপুত্র')। 'স্থির' বা 'থের' বুদ্ধদেবের একটি নাম। বুদ্ধদেব ছিলেন শান্তি ও সাম্যের অবতার। যীশুখৃষ্টের আদর্শও তাই। যীশুখৃষ্ট চেয়েছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদীধর্মের অস্থি-মজ্জায় নবপ্রাণ ও নবচেতনার সঞ্চার করতে। স্বর্গরাজ্য ও পৃথিবীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন যীশুখৃষ্ট। কিন্তু পরে স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবী থেকে আলাদা করেছিলেন সেন্ট্‌পল। যীশুখৃষ্টের বাণী ছিল: 'স্বর্গরাজ্য আমাদেরি (মানুষেরি) হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত' ('Kingdom of Heaven is within us')। আদম ও ইভের কথাও তাই। ইভ্‌ তথা সমগ্র নারীজাতির ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়েছিলেন সেন্ট্‌পল ও পরবর্তী খৃষ্টান-চার্চের অধিনায়করা। আবার এ'কথাও ঠিক যে, খৃষ্টধর্ম একরকম লোপ পেতে বসেছিল যীশুখৃষ্টের মহাপ্রয়াণের পর, সেন্ট্‌পল করেছিলেন তার মৃতপ্রায় শরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার। বর্তমান খৃষ্টধর্ম তাই ঋণী সেন্ট্‌পলের কাছে। কিন্তু এ'কথাও আবার মিথ্যা নয় যে, সেন্ট্‌পল অনুসরণ করেছিলেন যদিও যীশুখৃষ্টের উজ্জ্বল আদর্শ,

কিন্তু অটুট রাখতে পারেন নি তাকে তাঁর পরবর্তী জীবনে। পাপ-পুণ্যের ব্যবধানই বরং কলঙ্কিত করেছিল খৃষ্টধর্মের পবিত্রতাকে, আর পৃথিবীকে বলেছিলেন তিনি পঙ্কিল স্বর্গরাজ্যের তুলনায়।

স্বামিজী মহারাজের মতে স্বর্গরাজ্য সুদূর আকাশে মেঘের কোলে অথবা পরীদের দেশে নয়, মানুষের হৃদয়েই তা' সর্বদা অধিষ্ঠিত। মানুষই তার ধারণা দিয়ে স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছে। যেটা অত্যন্ত ভাল, যার চাইতে উৎকৃষ্ট ও কল্যাণদায়ী আর কিছু নেই, হিন্দুরা তাকেই 'স্বর্গ' আখ্যা দিয়েছে। পুরাণে এই স্বর্গের বর্ণনা নানান রকমভাবে আছে। স্বর্গেরই বিপরীত ধারণা হিসাবে নরকের উৎপত্তি। আসলে স্বর্গ ও নরক দু'টি মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের মনের কল্পনাই দুটোকে সৃষ্টি ক'রে করেছে একেকে অন্য থেকে পৃথক।

যীশুখৃষ্ট বলেছেন: 'Love thy neighbour as thyself'—'আমাদের নিজেদের ওপর যেরকম মমতা ও ভালবাসা, প্রতিবেশী তথা সমগ্র মানবজাতি ও প্রাণীদের ওপর সেরকম ভালবাসা থাকা উচিত'। যীশুখৃষ্টের বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভালবাসা দিয়েই স্বর্গরাজ্য অধিকার করা যায়। 'ভালবাসা দিয়ে অধিকার করা' বল্‌তে নিজের প্রেমস্বরূপ আত্মার অনুভূতি লাভ করা। পবিত্রতা মানুষের জন্মগত সংস্কার। নরকের ধারণাই খৃষ্টানধর্মে অভিশাপ এনে দিয়েছে। যীশুখৃষ্ট তাই বলেছেন: 'The Kingdom of Heaven is within us; seek and it shall be given unto you,'—তীব্র আকুলতা ও মুক্তির আকাঙ্খাই আমাদের শাশ্বতী শান্তির সন্ধান দিতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিক

গ্রীন বলেছেন: আকুলতা কিনা হাংগার (hunger)। Hunger বা অন্তরের যথার্থ ক্ষুধার নাম 'মুমুক্ষুত্ব' বা মুক্তির ইচ্ছা। মুক্তির ইচ্ছাকেই যীশুখৃষ্টের কথায় বলা হয়েছে 'knock করা' বা আঘাত দেওয়া। যীশুখৃষ্ট বলেছেন: 'Knock and the door shall be opened unto you,'—ভগবানকে জানার একান্ত আগ্রহ ও আকাঙ্খাই হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে। 'রুদ্ধদ্বার' বল্‌তে জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সংস্কার বা সূক্ষ্ম বাসনা। মানুষের মনে ঐকান্তিকী ইচ্ছা ও তীব্র আকুলতা থাকলে মায়ার অন্ধকার এ'জন্মেই জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ভাল হবার অথবা মুক্তি লাভের ইচ্ছা থাকা চাই। কেবল পাপ-চিন্তা বা নিজেকে হীন ও অপবিত্র ব'লে চিন্তা করলে মায়ার অন্ধকার দূর করা যায় না।

খৃষ্টানধর্মের ওপর বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা স্বামী অভেদানন্দ তাঁর মণীষাময় আলোকের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে করেছেন, তার সাক্ষ্য তাঁর 'ডিভাইন্ হেরিটেজ অব্ ম্যান্', 'হোয়াই এ হিন্দু এক্‌সেপ্টস্ খ্রাইষ্ট্ এ্যাণ্ড্ রিজেক্টস্ চার্চিয়ানিটি', 'ওয়াজ খ্রাইষ্ট্ এ যোগী', 'ডিড্ খ্রাইষ্ট্ টিচ এ নিউ রিলিজিয়ান' প্রভৃতি লেখামালা। ইংরাজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার আমেরিকার 'দি সান্' পত্রিকায় তাঁর 'খ্রাইষ্ট্ ওয়াজ এ গ্রেট্ যোগী' সম্বন্ধে বক্তৃতার যে সারাংশ ছাপা হয়েছিল তা' সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের সাম্‌নে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক খৃষ্টান ও পণ্ডিত সমাজ স্বামী অভেদানন্দকে কী ধরণের শ্রদ্ধা ও সমাদরের অর্ঘ্য দান করেছিলেন তা' তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত হায়রাম্ কর্সনের (Hiram

Corson) প্রশংসা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হায়রাম কর্সন ছিলেন আমেরিকার কর্ণওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Cornwell University, U. S. A) ইংরাজী সাহিত্যের এমেরিটাস্ অধ্যাপক। তিনি সারল্য ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মনীষী কর্সন স্বামিজী মহারাজের দেওয়া ছু'চারখানি বই পড়ে আনন্দে একবার লিখে পাঠিয়েছিলেন : 'I have read carefully well of your publications, some of them several times, and I do not remember that I come upon anything which I conld not endorse intellectually or spiritually'—'স্বামিজী', আপনার সমস্ত বই আমি বেশ যত্নের সংগে পড়েছি ; তাছাড়া তাদের ভেতর কয়েকখানি বরং অনেকবারই পড়েছি এবং আমার মনে হয়না যে আমি এমন কিছু পেয়েছি যা বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সমর্থন করতে পারিনি'। 'ওয়াজ খ্রাইষ্ট্ এ যোগী' বক্তৃতা পড়ে মনীষী কর্সন উচ্ছসিত প্রশংসা ক'রে আর একবার লিখেছিলেন : '* * which clears up so much in regard Jesus,'—'আপনার বক্তৃতা পড়ে যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে আমার ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে'। 'It is a conclusion to which Christian *orthodoxy* must finally come'—'যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে এমনি চূড়ান্ত মীমাংসা করেছেন যাতে গোঁড়ামী ভাবাপন্ন খৃষ্টানমতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে'।

স্বামী অভেদানন্দের 'ডিভাইন্ হেরিটেজ অব ম্যান' বইখানি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'This book is

throughout a golden treasury of religious thought', অর্থাৎ বইখানি ধর্ম-চিন্তার স্বর্ণখনি বিশেষ বা 'refined gold'—খাঁটি সোনা। তিনি আরও লিখেছিলেন: 'The spread of the Vedanta philosophy will do much to bring about a return to essential Christianity as distinguished from Churchianity. Your lecture on *Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity*, I value very much. It is an exposition, as are all your writings, of true Christianity, without its theological worths or tumours'.—'বেদান্তদর্শনের প্রচার তথা কথিত গির্জার আওতা থেকে পৃথক করে খৃষ্টধর্মের সত্যিকার চেতনা আনতে যথেষ্ট সাহায্য করবে'। 'কেন হিন্দু খৃষ্টকে মানে এবং গির্জাকে বর্জন করে' শীর্ষক আপনার বক্তৃতাটির আমি অত্যন্ত মূল্য দিই। আপনার অন্যান্য অভিব্যক্তির মতো এটিও ধর্মের চাক্যচিক্য ও অপাঙ্গের বাইরে প্রকৃত খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যা'।

এই ধরণের অজস্র প্রশংসাবাদ ও মন্তব্যের নজির দেখিয়ে আলোচনার বিষয়কে আমরা অযথা ভারাক্রান্ত করতে চাই নে, তবে খৃষ্টধর্মপ্লাবিত সুদূর পাশ্চাত্য দেশে নগণ্য অজ্ঞাতকুলশীল একজন ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সমালোচনা তখনকার বিখ্যাত চিন্তাশীল অধ্যাপক হায়রাম্ কর্সন, অধ্যাপক রয়েস্, অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস, অধ্যাপক জ্যাকসন, অধ্যাপক পার্কার, মনীষী হিবার নিউটন, মাননীয় কার্টার প্রমুখ মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। সেই পরাধীনতার যুগে একজন ভারতবাসীর পক্ষে এটা বড় কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নয়।

॥ স্মৃতি ঃ তিন ॥

স্বামী অভেদানন্দের জীবন ছিল সকল রকম অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিপূর্ণ। সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান, যেমন জমি ক্যামন ক'রে চাষ করতে হয়, কখন ও কি রকমভাবে জমিতে সার দেওয়া দরকার এ'সব খবরও তাঁর জানা ছিল। হাতে-নাতে আমেরিকায় থাকতে এ'সব কাজ তিনি করেছিলেন। আপেল, আলু, ধান, গম, ভুট্টা ও নানান রকমের শাক-সবজীর চাষ তিনি রীতিমতভাবে করেছিলেন বই কিনে পড়ে ও জেনে। পশুপালন করার অভিজ্ঞতা অর্জনও তাঁর জীবনে বাদ পড়েনি। দুধের তৈরী জিনিস, ভিন্ন ভিন্ন রকমের মিষ্টি তৈরী, হরেক রকমের রান্নার প্রণালী, ছুঁতোরের কাজ, দর্জীর কাজ যেমন, জামা প্যাণ্ট কোর্ট সার্ট টুপি প্রভৃতির ছাঁট, সেলাই, ডিজাইন সব তিনি শিখেছিলেন। সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়া, মটর চালানো এ'সবও শিখেছিলেন তিনি আমেরিকায় থাকতে প্রচারের কাজের সুবিধার জন্য।

আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার পর যখন তিনি থাকতেন ক'লকাতায়, তখন নিজের হাতে তৈরী করতেন জামা, কাপড়, টুপী থেকে আরম্ভ ক'রে পোষাক-পরিচ্ছদ সবই। আমাদেরও তিনি বলতেন অনেক সময়ঃ 'সাধু হয়েছিস ব'লে অভিমান ও কুঁড়েমি করবি কেন? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব জিনিষ শিখতে হয় ও করতে হয়। ভাগবান লাভ কি আর সহজে হয় রে? এতে ফাঁকি নেই। এতটুকু কুঁড়েমি

বা দীর্ঘসূত্রতা থাকলে হবে না। পরিপূর্ণতার নামই তো মুক্তি। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কি আর আসমান থেকে পড়ে—না গাছে ফলে। সকল-কিছুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হয়। নইলে হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম: 'কিরে, এটা জানিস্?' বল্লি—'আজ্ঞে না'। 'ওটা জানিস?' 'আজ্ঞে না'। সবটাতেই কেবল —না না, আর না। এ'রকম হ'লে আর কি হবে বল্? ভগবান লাভ? সে বড় শক্ত জিনিস। সবার চাইতে সে হ'ল বড় কথা। এটা পারব না, ওটা পারব না, কিন্তু ভগবান লাভ করব, এ' ক্যামন ক'রে হয়? কিছু পার্ব না—এ'তো কুঁড়েমি! কোন কাজ করব না বা কোন কাজ শিখব না, কিন্তু ধ্যান করব—এতো চালাকি, কাজে ফাঁকি দেওয়ার এও একটা মতলব মাত্র। সকল বিষয়ে ফাঁকি দিলে নিজেকে শেষে ফাঁকিতে পড়তে হয়। তাই কোন বিষয়ে কুঁড়েমি করা ঠিক নয়। তোমরা বীর্যবানের সন্তান। জগতে সবটার ভেতরই সাক্সেস্ (success—কৃতকার্যতা) চাইবে। তবেই জীবনে সিদ্ধি'।

স্বামিজী মহারাজের ছিল দিব্য ও পরিপূর্ণ জীবন। তেজোদীপ্ত ছিল তাঁর মুখ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল দৃষ্টি, কথা ও কাজের মধ্যে ছিল সামঞ্জস্য। সকল কাজেই ছিল তাঁর একান্ত উৎসাহ, আশা ও কৃতকার্যতার ভাব। গভীর আধ্যাত্মিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলেও তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি শিরায় সঞ্চারিত ছিল অফুরন্তভাবে কর্মের প্রচণ্ড প্রেরণা। সারাটি জীবন কর্মস্রোতের ভেতর ছুটতেও হয়েছে তাঁকে অবিশ্রান্তভাবে! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্রাম তাঁর জীবনে ছিল না। কোন বিপদকে তিনি

গ্রাহ্য করতেন না কোনদিন। সাহস ছিল তাঁর অদম্য, মনোবল ও বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। এ'রকম ছিলেন বলে কৃতকার্যতার জয়মাল্যকে তিনি বরণ করেছিলেন জীবনে।

আমেরিকায় থাকতে এমন কতদিন গেছে—হোটেলের ভাড়া পর্যন্ত তিনি দিতে পারেন নি, সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন সর্বহারার মতো! মালপত্র গাড়ীতে বোঝাই দিয়ে চলতে হয়েছে কতদিন নিরুদ্দিষ্ট পথে, মাথা রাখার স্থানও এতটুকু ছিল না। তার ওপর সকলেই ছিল অপরিচিত। একদিন হয়তো উঠলেন একটা হোটেল থেকে আর একটা হোটেলে গিয়ে, ভাড়াও ঠিক হ'ল, কিন্তু একটি পয়সা নেই হাতে। জিনিষপত্র রেখে গেলেন হয়তো একটা পাবলিক (সাধারণ) হলে বা লাইব্রেরীতে, শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বন্দোবস্ত করলেন লেক্‌চার বা ক্লাসের। যৎসামান্য যা-কিছু পেলেন তা' থেকে চালালেন তিনি সেদিনকার খাওয়া-পরা ও হোটেলের ভাড়া কোন রকমে। এই রকম করেই কেটেছে তাঁর কতদিন তার ইয়ত্তা নেই। তারপর হয়তো ক্লাস করতে করতে লোকের সংগে হ'ল পরিচয়, শিক্ষিত লোকেরা বুঝ্‌লেন স্বামিজী মহারাজের পাণ্ডিত্য, সুতরাং সহানুভূতি পেতে লাগলেন ক্রমে বিদ্বন্মণ্ডলীর কাছ থেকে, মাথা গোঁজার স্থানও হ'ল কোন রকমে।

এ'ধরণের কত কথাই না শুনেছি তাঁর মুখ থেকে আমরা কতদিন। *Leaves from My Diary*-তে তিনি এ'সম্বন্ধে কিছু উল্লেখও করেছেন। তিনি বলেছেন:

'I was determined to find ways and means for making a success of the Vedanta work in

New York, which was started by Swami Vivekananda. There were neither funds nor donations to carry on my work. I had to earn my living, pay the room rent as well as for my meals in resturants, the rent of the hall and meet my personal expenses and the expenses of weekly advertisements in various newspapers. I had no other source of income than the voluntary contributions, taken in a basket after my classes and public lectures which were not enough to meet all these expenses. Therefore I tried to economise and sacrifice my personal comforts, by accepting the invitations for my meals from the students of my classes. This was like the *bhikshavritti* of the Hindu Sanyayins in India'.

অর্থাৎ 'স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তাকে সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালাবার জন্যে আমার কাছে তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না বা কোন রকম দানও ছিল না। কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই থাকবার ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচপত্র, লেকচার হলের ভাড়া, নিজের পকেট খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা বাক্সে দিত তা' ছাড়া টাকা-পয়সা পাবার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু

আমার যা খরচ, তার তুলনায় আয় খুব সামান্য ছিল। কাজেই নিজের সকল-কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তখন ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে অনেকদিন খরচ সংকুলান কর্‌তে হয়েছে। এটা ছিল এক রকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো'। তিনি আরও বলেছেন :

'All the expenses in connection with my lectures, the rent of the hall, etc., including my lodging and boarding expenses were paid from subscriptions and collections in public meetings. As there was no permanent place for me to stay in New York and no fund to meet my expenses when I was not holding classes and delivering lectures, I was obliged to give up my room in boarding houses and to stay as a guest of my acquaintances who invited me in their homes in other cities'.

অর্থাৎ 'আমার বক্তৃতা আর খাওয়া-পরা ও হলের ভাড়া বাবদ সমস্ত খরচ চাঁদা ও সাধারণ বক্তৃতায় যে যা স্বেচ্ছায় দান করত তা থেকেই চলতো। কিন্তু দিনকতক ক্লাস করা বা লেকচার দেওয়া যখন বন্ধ রেখেছিলাম তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে আবার বোর্ডিং ত্যাগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য সহরে থাকার সময় পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা আমায় এক একদিন নিমন্ত্রণ করতেন, তাদের সেখানে গিয়ে কোন রকমে খাওয়া-থাকা চালাতাম। তখনও কিন্তু আমি নিউ-ইয়র্কে স্থায়ীভাবে থাকার কোন স্থান করতে পারিনি, টাকা-পয়সাও আমার

সংগে কিছু ছিল না'। 'All the belonging of the Vedanta Society, which I had packed in my trunk travelled with me wherever I went'; —'কাজেই আমেরিকায় বেদান্ত সমিতির যা-কিছু জিনিসপত্র ছিল সবই ট্রাঙ্কে ভর্তি ক'রে যেখানে আমি যেতাম সেখানেই সংগে সংগে সেগুলিকে নিয়ে যেতে হ'ত'।

এ'সকল অসুবিধা ও কষ্ট বেশীর ভাগ তিনি পেয়েছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গোড়াকার দিকে। একদিন স্বামিজী মহারাজ স্বীকারও করেছিলেনঃ 'একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া ও স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) অফুরন্ত ভালবাসাই আমার সকল কষ্টকে তখন ভুলিয়ে দিত'।

আমেরিকায় থাকতে তিনি সকল জিনিস নিজের প্রচার-কার্য ও কার্যের সুবিধার জন্য শিখেছিলেন। তিনি চিরদিনই ছিলেন অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ও সাবলম্বী তা আগেই বলেছি। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোকে তিনি গৌরব ব'লে মনে করতেন। এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাক্‌তে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতেন না। নিজের হাতেই সকল কাজ তিনি করতে চাইতেন ও তার জ্বলন্ত নিদর্শন পেয়েছি আমরা তাঁর জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে। আমেরিকায় থাকা-কালে তিনি নিজের মাথা-গোঁজার মতো একটা স্থায়ী আশ্রয় ক্রমশঃ তৈরী করতে পেরেছিলেন। কালে সে আশ্রম বিরাট হয়েছিল। জমি-জমা, বাগান, শাক-সবজীর তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করতেন।

মোটকথা স্বামিজী মহারাজের জীবনে ছিল বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতার সমাবেশ। সকল রকম সামাজিক পরিবেশ, চিন্তা ও কর্মপ্রবাহের সংগে তিনি নির্বিচারে নিজেকে খাপ খাইয়ে

নিতে পারতেন। Adaptabilty (খাপ খাইয়ে নেওয়া) ছিল তাঁর জীবনে একটি বড় গুণ। পাশ্চাত্যে যখন ধর্মপ্রচারক-রূপে ছিলেন, তখন সামাজিক আচার-ব্যবহার, মেলামেশা, আদান-প্রদান সব-কিছুই করতেন তিনি একেবারে ওদেশের মতো। সেখানকার লোকেরাও মনে করতেন তাঁকে তাঁদের নিজেদের সমাজের বা পরিবারের মধ্যে একজন—একান্ত আপনার জন। এই নিজের ক'রে নেওয়া স্বভাবের জন্য পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচার ও কর্মপ্রচেষ্টা কৃতকার্যতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। 'হিন্দুইজ্‌ম্‌ ইনভেড্‌স্‌ আমেরিকা'-র (*Hinduism Invades America*) লেখক ওয়েলডন টমাস একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করেছেন। টমাস লিখেছেন: 'In Abhedananda * * we notice considerable adaptation, * * who was willing to adjust himself to American institutions in both message and method'.—অর্থাৎ 'স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেবার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বাণীতে ও জীবনধারাতে নিজেকে মিলাতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন'।

আমেরিকার সকল রকম প্রতিষ্ঠান ও সমাজ তাঁকে নির্বিচারে আপন ব'লে গ্রহণ করতে ও ভালবাসতে পেরেছিল। শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ হৃদয়ে পাশ্চাত্যে কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় টমাস আবার উল্লেখ করেছেন: 'Paying more attention to history and his field of operation, Swami Abhedananda did more than his leader to adjust Vedanta to Western culture. Rather than overpower by

flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasonableness and a vast array of new and picturesque facts'.—'ঐতিহাসিক ঘটনা ও কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি—স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতার চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্তকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সংগে বরং অধিকতরভাবে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষানিঃসারী বাগ্মীতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে সত্যিকার যুক্তিপূর্ণতা ও নূতন নূতন ঘটনাবৈচিত্র্যের সমাবেশে পাশ্চাত্যবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করার দিকে স্বামী অভেদানন্দ বেশী নজর দিয়েছিলেন'। স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে টমাসের নিজের ধারণা, শ্রদ্ধা ও নির্বাচনী বুদ্ধি প্রবল থাকলেও তাঁর 'Swami Abhedananda did more than his leader' এই স্বীকৃতির ভেতর স্বামী অভেদানন্দের মনীষামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারে সাফল্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মনোভাবই সুপরিস্ফুট।

আমেরিকার বিদ্বদ্‌সমাজ ও জনসাধারণের ভেতর স্বামী অভেদানন্দ এমনই নিবিড়ভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে, শুধু পাশ্চাত্যে কেবল ধর্মগুরু ও প্রচারক হিসাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন না—ছিলেন একাধারে সকলের ভাই, বন্ধু, গুরু, পিতা, মাতা ও সকল রকম সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিপদে সম্পদে তিনি ছিলেন সবার উপদেষ্টা ও সান্ত্বনাদাতা। ছোট ছেলে-মেয়েদেরও তিনি ছিলেন অভিভাবক ও শিক্ষক। সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ে ছিল তাঁর অবাধগতি ও প্রভাব। এক কথায় তিনি ছিলেন সকলেরই একান্ত আপনার জন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমেরিকার নাগরিক অধিকারের

(citizenship) আমন্ত্রণ তাই পেয়েছিলেন তিনি অনেকবার, কিন্তু প্রত্যাখান করেছিলেন প্রাচ্যের পবিত্রতম আদর্শকে স্মরণ ও আমরণ ভারতবাসী ব'লে নিজেকে গৌরবের পরিচয় দান ক'রে। আমেরিকার নাগরিক অধিকার প্রত্যাখানের পেছনে তাঁর অলৌকিক আচার্যের অশরীরী আদেশ এবং ইংগিতও ছিল আমরা শুনেছি।

স্বামিজী মহারাজ এ'প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন: 'একবার-মাত্রই নয়, তিন চারবারের ঘটনা যা ঘটেছিল আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়ে, সত্যই তা' অপূর্ব ও আশ্চর্য রকমের!' প্রথমবারের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন: 'সিটিজেনশিপের ফর্ম দেওয়া হ'ল আমাকে সই করার জন্যে। কলমও তুলে নিলাম সই করব ব'লে। কিন্তু কে যেন তখন ব'লে উঠল পেছন থেকে: 'কালী, তুই কি শুধু আমেরিকার? তুই যে সমগ্র জগতের'। আমি সচকিত হলাম, কণ্টকিত হ'য়ে উঠল আমার সর্বশরীর। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না, কাজেই সে'দিন আর সই করা হ'ল না, বিস্ময়ে ও পুলকে মন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ঠিক এ'রকমটি হয়েছিল আরো দু'বার। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তারপর—মনে আর কখনো ধারণাও আনব না আমেরিকার সিটিজেন হবার জন্যে। মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরই (শ্রীরামকৃষ্ণদেবই) আমায় ইঙ্গিত করেছিলেন এ'ভাবে যে, আমেরিকার আবেষ্টনী-মাত্র কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থান হ'তে পারে না, সমগ্র বিশ্বই যে তার কর্মক্ষেত্র'।

স্বামী অভেদানন্দ সারা পঁচিশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির রূপ ও আদর্শ

পাশ্চাত্য জগতের সামনে প্রচার ক'রে কৃতকার্যতার জয়মাল্য বরণ করেছিলেন—তার কারণ হ'ল পাশ্চাত্য সমাজের প্রত্যেকটি পরিবেশ এবং মানব-মন ও প্রকৃতির সংগে তিনি নিজেকে সংপূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে তিনি ছিলেন যেন পাশ্চাত্যবাসী, কিন্তু তাঁর হৃদয়-বেদীতে অহরহঃ প্রজ্বলিত ছিল প্রাচ্যের মহিমোজ্জ্বল আদর্শ ও প্রেরণার প্রদীপ্ত দীপশিখা। সন্দেহলিপ্ত আমাদের মন তাই তাঁর উদার প্রকৃতি ও আচরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে কখনো কখনো পশ্চাদ্‌পদ হ'ত না। তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের আচার-বিচার ও রীতিনীতির সংগে সংপূর্ণ খাপ-খাওয়ানোর ভাবকে সময়ে সময়ে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতেও আমরা তাই পশ্চাদ্‌পদ হতাম না, প্রকাশ ক'রে ফেলতাম কখনো কখনো আমাদের সন্দেহ-আন্দোলিত মনোভাব তাঁর সামনে। একদিনের কথা, স্বামিজী মহারাজ তাঁর অফিসঘরটিতে বসে আছেন। আন্‌মনা ও উদার তাঁর দৃষ্টি। কাছেও বিশেষ কেউ ছিল না। আমরা দু'তিনজন প্রণাম ক'রে বস্‌লাম তাঁর সামনে। তখন রাত্রি হবে সাড়ে আটটা—কি ন'টা। আমাদের দেখে তাঁর একটু হু'স্‌ ফিরে এলো। তিনি বল্লেন: 'ও, এই যে, কখন সব আসা হলো?' আমরা বল্লাম: 'এই মাত্র'।

'কেন হঠাৎ এ' সময়?'

'আজ্ঞে, এলাম অম্‌নি'।

'ও, কারণ তাহ'লে কিছু নেই? সম্ভবতঃ সময় আছে ব'লে এলে? আমেরিকায় থাকতে আমার কিন্তু বাবু সময়-টময় বড় কখনো হ'ত না। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর

বিশ্রাম করার সময় পেতাম মাত্র তিন—কি চার ঘণ্টা। তাও সব দিন নয়। যদিও লোকজন থাকত সাহায্য করার জন্যে, তাহলেও নিজের হাতেই কাজ করতে হ'ত আমায় বেশীর ভাগ সময়'।

আমাদের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো: 'মহারাজ, ওদেশের লোক আপনাকে গ্রহণ করেছিল কি ভাবে ?'

স্বামিজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'কেন—ওদেশেরই মতো। সাধারণ লোক ভারতবর্ষের লোকদের মনে করে কালা আদমী ও অসভ্য ব'লে। ওদের বেশীর ভাগেরই ধারণা যে, ভারতবর্ষের লোকগুলো বুনো—একেবারে এবোরিজিন্‌স্; শিক্ষা দীক্ষা নেই, সভ্যতাহীন ও হাফ্‌ নেকেড্‌ (অর্ধনগ্ন) মানুষ। অবশ্য শিক্ষিত লোকদের কথা আলাদা। তাঁরা কিন্তু আমাকে দেখতেন ওদেরি একজন ব'লে'।

'কিন্তু আপনাকেই বা ওরা অতো আপনার ব'লে নিয়েছিল কেন ? ইণ্ডিয়ানদের তো ওরা ঘৃণা করে—তা তিনি পণ্ডিতই হোন আর মূর্খই হোন্; ধর্ম-প্রচারকই হোন্ আর ভ্রমণকারীই হোন্'।

'হাঁ, কথাটা অবশ্য সত্যি। তবে আগেই বলেছি যে, ওদের সমাজে আমি মিশেছিলাম সংপূর্ণ ওদেরি মতো। এক মুহূর্তের জন্যে ওরা ভাবতে পারত না যে আমি বিদেশী। কথাবার্তায়, জীবনযাপনে ও ভাবের আদানপ্রদানে ওরা ধরে নিয়েছিল আমি ওদেরি দেশের লোক। ওদের সমবেদনা ও সহানুভূতিও পেয়েছিলাম তাই পরিপূর্ণভাবে'।

'কিন্তু তাহলেও ইষ্ট ইজ্‌ ইষ্ট, ওয়েষ্ট ইজ্‌ ওয়েষ্ট (প্রাচ্য

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যের ভাব নিয়ে থাকবে) এটাই সাধারণ নীতি। পাশ্চাত্যে থাকলেও প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শকে প্রাচ্যবাসীর বাঁচিয়ে রাখা উচিত। ওয়েষ্টারনাইজড্ (পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন) হওয়া মানেই ইষ্টার্ণ আইডিয়ালকে (প্রাচ্য আদর্শকে) বিসর্জন দেওয়া। এটা কিন্তু আমরা সমর্থন করতে পারি না। প্রাচ্যদেশ থেকে যখন আপনারা গেছেন, তখন প্রাচ্য ভাবধারাকে আক্‌ড়ে ধরে রাখা আপনাদের কর্তব্য হবে। তাতে ওদেশের লোকেরাও আমাদের আদর্শ কিছু শিখ্‌তে পারবে। তা নইলে ওদেশে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হ'লে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য আর থাকে কেমন ক'রে' ?

আমাদের অকাট্যযুক্তি শুনে বালকের মতো হেসে উঠে স্বামিজী মহারাজ বল্লেনঃ 'তা ঠিক কথাই বলেছ। শৃংখলতাপূর্ণ সচল জীবনের আদর্শ তো তোমরা অনেক দিন থেকেই ভুলে গেছ, কাজেই যুক্তি তোমাদের অকাট্যই হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ইষ্টার্ণাইজড্ (প্রাচ্য ভাবাপন্ন) বা ইণ্ডিয়ানাইজড্ (ভারতীয়) আদর্শটার স্বরূপ আসলে কি ? কেবল খাওয়া-দাওয়ার রেস্‌ট্রিক্‌সন (বাঁধন-কসন) আর ধপ্‌ধপে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে থাকলেই বুঝি ইষ্টার্ণ আইডিয়াল (প্রাচ্য আদর্শ) বজায় রাখা হ'ল। ওগুলো তো দেশাচার ও লোকাচার, —ধর্ম, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও আন্তর শুচীতার সংগে ওসবের কোন সংপর্ক নেই। ভারতের ত্যাগ, তপস্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা পাশ্চাত্য দেশে গেছি ধর্ম প্রচার করতে। ভারতের যা-কিছু ভাল, পবিত্র ও কল্যাণতম সেগুলিকে পাশ্চাত্যবাসীর সামনে

ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই মিশতে হয়েছে নির্বিচারে ওদেশের সঙ্গে, ওদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে, কলেজে, ইউনিভারসিটিতে, চার্চে, আমোদ-আহ্লাদের জায়গায়—সর্বত্র। ওদের মতোটি না হ'লে তো আর ওদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না! ওরাই বা তোমাদের মতবাদ নেবে কেন বলো? জোর ক'রে কোন মতবাদ কারু ঘাড়ে চাপানো যায় না। তারপর তোমরা বোধহয় জান না যে, গেরুয়া পোষাক পরে সাধু-সন্ন্যিসীরা আমেরিকার মতো দেশে গেলে ওখানকার লোকে তাদের শ্লেভ (দাস) বা কয়েদী ব'লে মনে করে। পুলিশেও তাদের ধরে গারদে পুরে রাখে। মাথা নেড়া করা ওদেশে ভারী লজ্জাস্কর ব্যাপার। ওটা ওদেশে বরং শ্লেভারিরই (দাসত্বেরই) চিহ্ন-বিশেষ'।

স্বামিজী মহারাজের মুখ ক্রমশ রক্তিম হ'য়ে উঠলো। তেজোব্যঞ্জক ও সুদৃঢ় তাঁর কণ্ঠস্বর। একদৃষ্টে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে ডান হাতের তর্জনী-অঙ্গুলি আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে তিনি বল্লেন: 'জানতো—স্বামিজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) তাঁর গেরুয়া পোষাকের জন্যে কম লাঞ্ছনা প্রথমে ভোগ করতে হয়নি। তিনি নিউ-ইয়র্কে গিয়ে হাজির হলেন, মাথায় গেরুয়া পাগ্‌ড়ী, গায়ে আলখাল্লা, পরণে গৈরিক কাপড় ও গৈরিক চাদর, লোকে তাঁকে দেখে ভাবলো পৃথিবীর কোন একটা অদ্ভুত জীব-বিশেষ হবে। কেউ টানে কাপড় ধরে, কেউ টানে আলখাল্লা ধরে, ছেলেমেয়েরা ঢিল ছুড়তে লাগলো রাস্তায় যাবার সময়। কি ভয়ানক বিপদের ভেতর তাঁকে পড়তে হয়েছিল বলো দেখি? তোমরা বাপু থাক এদেশে,

বই পড়েই কেবল ইষ্টার্ণ আইডিয়াল (প্রাচ্য আদর্শ) রক্ষা করতে চাও। কাজেই তোমাদের কাছে হবে ওদেশের সমস্ত জিনিসই অন্যায় ও দোষদুষ্ট, সবটাই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া। কিন্তু নিজেরা যদি কোনদিন ঘুরে দেখার সুযোগ-সুবিধে পাও তবে দেখবে সব ভিন্ন রকমের। আমি কিন্তু ওদের আচার-বিচার বা ব্যবহারের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি। ভাব নিয়েই হ'ল কথা। ধর—তুমি গেছ ওদেশে ধর্ম প্রচার করতে, ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ওদেশের চোখের সামনে ধ'রে তাদের মনের ভুল ভাঙ্‌তে। তাতে তুমি যে-রকম পোষাকই পরো না কেন, যে-রকম ভাষাতেই কথা বলো না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি নিজের আদর্শে ঠিক থাকলেই হ'ল, তখন দুনিয়ার কেউ আর তোমায় টলাতে পারবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিজের হাতে গড়েছিলেন। তাঁর নাম নিয়েই তো আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে বিদেশে গেছি। ভাল-মন্দ সব-কিছুই যখন তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি তখন ভাল হ'লেও তিনি দেখবেন—আর মন্দ হ'লেও তিনি দেখবেন'।

আমরা সকলে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হ'য়ে বসে শুনছি। শেষের কথাগুলি বলার সংগে সংগে ভাবের আবেগে তাঁর মুখ রক্তিম ও জ্যোতির্ময় হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে আবার বলতে লাগলেন: 'এই দেখনা, তোমরা মুখে ইণ্ডিয়ান আইডিয়াল—ইণ্ডিয়ান আইডিয়াল (প্রাচ্য আদর্শ, প্রাচ্য আদর্শ) ব'লে চিৎকার কর, কিন্তু আসল কাজের বেলায় তার এ্যাপ্লিকেশন্ (যথার্থ প্রয়োগ) কোথাও দেখা যায় না? মুখ

ও কাজের মধ্যে মিল রাখ্‌তে হয়। আসলে তোমরা কিন্তু ইণ্ডিয়ানাইজড্‌ বা ইষ্টার্ণাইজড্‌ (ভারতীয় ও প্রাচ্য ভাবাপন্ন) অথবা ওয়েষ্টার্ণাইজড্‌ (পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন) কোনটাই নও, বরং একটা তাল পাকানো জগাখিচুড়ি-বিশেষ। ভারতীয় আদর্শ অটুট রাখ্‌তে হ'লে বৈদিক যুগের আদর্শকেও আমাদের ভুল্লে চলবে না। সংগে সংগে বর্তমান ক্রমবিবর্তনের ধারাকেও অনুসরণ করতে হবে। বৈদিককে না ভোলা বল্‌তে আমি বৈদিক যুগের সমস্ত-কিছুকেই নির্দোষ ও অন্ধভাবে অনুকরণ করতে বলছি না। বৈদিক সমাজের রীতিনীতিকে এখন সমাজে হুবহু চালাতে গেলে ভুল করা হবে, তাতে সমাজ সচল না থেকে বরং অচল হ'য়েই উঠবে। কিন্তু বৈদিক যুগের পবিত্র আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা, অধ্যাত্মভাব, প্রেম, ভালবাসা—এ'সবকে অনুসরণ করতে হবে। ভারতের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যই হ'ল মৈত্রী, করুণা, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, তপস্যা, প্রভৃতি। সবার চেয়ে একত্বানুভূতি ও সমদর্শনই ভারতের নিজস্ব সম্পদ। এই সদ্‌গুণগুলিকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার নাম ইণ্ডিয়ান আইডিয়ালকে (ভারতীয় আদর্শকে) অটুট রাখা। সকল জাতির আচার-ব্যবহারকে হুবহু অনুকরণ ক'রে তোমরা এখন তোতাপাখীর দলে নাম লেখাতে যাচ্ছ, তাতে ক'রে নিজের আদর্শেও জলাঞ্জলি দিতে বসেছ। এটা কি তোমাদের পক্ষে খুব গৌরবের জিনিস ?'

জিজ্ঞাসা করলাম: 'আচ্ছা মহারাজ, ওদেশের লোকদের ভেতর আমাদের ভারতীয় ভাবধারা নেবার আগ্রহ কি রকম দেখ্‌লেন' ?

তিনি আমাদের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে একটু হেসে বল্লেন: 'খুব আগ্রহ। তোমাদেরও বরং ছাড়িয়ে যায়। তবে ওদেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আগ্রহ ও ধর্মের দিকে টেনডেন্সিই (প্রবৃত্তি) বেশী। ভারতীয় আচার-বিচার পালন করা, পূজো-অর্চনা করা ও সাধন-ভজন যোগ ইত্যাদি শিক্ষা করার দিকে তাদের অত্যন্ত আগ্রহ। তবে একথা বলছি না যে, আমেরিকার দেশশুদ্ধ লোকই আমাদের সকল বিষয় জানতে বা শুনতে আগ্রহশীল। আমাদের দেশের সব লোকই কি আর বিদ্যা, জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা লাভ করবার জন্যে পাগল? ভাল মন্দ লোক সব দেশেই আছে। তবে ওদেশে ভারতীয় আদর্শের প্রচার হওয়া আরো দরকার। আমরা তো গোড়াপত্তন ক'রে গেলাম, এরপর আরো কত কিছু হবে'।

'ওদেশের আগ্রহশীল অনেকে আমার কাছে নিয়মিতভাবে আসতো। জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, আসন প্রভৃতির উপদেশ যেমন যেমন দিতাম, ঠিক তেমনিভাবে ওরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ করত। আসন ক'রে বোসে যোগ অভ্যাস করতো। ওদের তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও উদ্যম আমাদের চেয়ে বরং বেশী বই কম নয়'।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বল্লেন: 'একথা তো ঠিক যে, মানুষের সংগে সমানভাবে না মিশলে তাদের সহানুভূতি পাওয়া যায় না। সর্বদা দূরে দূরে থাকলে মানুষকে আপন করা যায় না। অন্তর জয় করতে হ'লে অন্তরের বিনিময় থাকা উচিত। প্রাণখুলে সকল বিষয়ে ওদের (পাশ্চাত্যবাসীর) সংগে মিশেছিলাম বলেই তো ওদের সমস্ত খুটিনাটি জানার আমার সুযোগ-সুবিধা

হয়েছিল। ওদের কাছে আমার কিছুই গোপন ছিল না। ওদের কাছ থেকে নিজের শেখাও হয়েছে অনেক। তা' না হ'লে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর ওদের সংগে কাটালাম কেমন ক'রে বলো। জানবে—সবার মূলে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও অফুরন্ত করুণা'।

* * *

স্বামী অভেদানন্দের কথা ও কাজ ছিল সমান্তরাল সরলরেখার মতো। আমরা আগেই অনেকবার বলেছি যে, বিদেশে গিয়ে বিদেশের সমাজ, রীতিনীতি ও সকলের হৃদয়ের সংগে নিজেকে সংপূর্ণভাবে মিশিয়ে দিলেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে তিনি অন্তরে সর্বদা বিকশিত ও জাগরুক রেখেছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বিদেশে ধর্মপ্রচার ক'রে ফিরে এলেন তিনি ইংরাজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রায় শেষের দিকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেও ভারতে এসেছিলেন একবার প্রচারের উদ্দেশ্যে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নব্যভারতের পুণ্যতীর্থ বেলুড়মঠে পদার্পণ ক'রেই তিনি নাপিতকে ডেকে পাঠালেন মাথার চুল ফেলে দেবার জন্য। মাথার চুল ছিল তাঁর কৃষ্ণনীলাভ সুন্দর ও কোঁকড়ানো। মাথা কামিয়ে ফেলে তিনি নূতন কাপড়-জামা পরলেন সব খদ্দরের। তখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। স্বামিজী মহারাজের স্বদেশী জিনিসের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পাশ্চাত্য বেশভূষা ত্যাগ ক'রে তিনি মুহূর্তের মধ্যে আবার ভারতীয় ভাব ও পরিবেশের ভেতর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন।

তিনি আমাদের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে একটু হেসে বল্লেন: 'খুব আগ্রহ। তোমাদেরও বরং ছাড়িয়ে যায়। তবে ওদেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আগ্রহ ও ধর্মের দিকে টেনডেন্সিই (প্রবৃত্তি) বেশী। ভারতীয় আচার-বিচার পালন করা, পূজো-অর্চনা করা ও সাধন-ভজন যোগ ইত্যাদি শিক্ষা করার দিকে তাদের অত্যন্ত আগ্রহ। তবে একথা বলছি না যে, আমেরিকার দেশশুদ্ধ লোকই আমাদের সকল বিষয় জানতে বা শুনতে আগ্রহশীল। আমাদের দেশের সব লোকই কি আর বিদ্যা, জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা লাভ করবার জন্যে পাগল? ভাল মন্দ লোক সব দেশেই আছে। তবে ওদেশে ভারতীয় আদর্শের প্রচার হওয়া আরো দরকার। আমরা তো গোড়াপত্তন ক'রে গেলাম, এরপর আরো কত কিছু হবে'।

'ওদেশের আগ্রহশীল অনেকে আমার কাছে নিয়মিতভাবে আসতো। জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, আসন প্রভৃতির উপদেশ যেমন যেমন দিতাম, ঠিক তেমনিভাবে ওরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ করত। আসন ক'রে বোসে যোগ অভ্যাস করতো। ওদের তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও উদ্যম আমাদের চেয়ে বরং বেশী বই কম নয়'।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বল্লেন: 'একথা তো ঠিক যে, মানুষের সংগে সমানভাবে না মিশলে তাদের সহানুভূতি পাওয়া যায় না। সর্বদা দূরে দূরে থাকলে মানুষকে আপন করা যায় না। অন্তর জয় করতে হ'লে অন্তরের বিনিময় থাকা উচিত। প্রাণখুলে সকল বিষয়ে ওদের (পাশ্চাত্যবাসীর) সংগে মিশেছিলাম বলেই তো ওদের সমস্ত খুটিনাটি জানার আমার সুযোগ-সুবিধা

হয়েছিল। ওদের কাছে আমার কিছুই গোপন ছিল না। ওদের কাছ থেকে নিজের শেখাও হয়েছে অনেক। তা' না হ'লে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর ওদের সংগে কাটালাম কেমন ক'রে বলো। জানবে—সবার মূলে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও অফুরন্ত করুণা'।

* * *

স্বামী অভেদানন্দের কথা ও কাজ ছিল সমান্তরাল সরলরেখার মতো। আমরা আগেই অনেকবার বলেছি যে, বিদেশে গিয়ে বিদেশের সমাজ, রীতিনীতি ও সকলের হৃদয়ের সংগে নিজেকে সংপূর্ণভাবে মিশিয়ে দিলেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে তিনি অন্তরে সর্বদা বিকশিত ও জাগরুক রেখেছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বিদেশে ধর্মপ্রচার ক'রে ফিরে এলেন তিনি ইংরাজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রায় শেষের দিকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেও ভারতে এসেছিলেন একবার প্রচারের উদ্দেশ্যে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নব্যভারতের পুণ্যতীর্থ বেলুড়মঠে পদার্পণ ক'রেই তিনি নাপিতকে ডেকে পাঠালেন মাথার চুল ফেলে দেবার জন্য। মাথার চুল ছিল তাঁর কৃষ্ণনীলাভ সুন্দর ও কোঁকড়ানো। মাথা কামিয়ে ফেলে তিনি নূতন কাপড়-জামা পরলেন সব খদ্দরের। তখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। স্বামিজী মহারাজের স্বদেশী জিনিসের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পাশ্চাত্য বেশভূষা ত্যাগ ক'রে তিনি মুহূর্তের মধ্যে আবার ভারতীয় ভাব ও পরিবেশের ভেতর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন।

স্মৃতি : চার

স্বামী অভেদানন্দ কি রকম সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন—তা আগে উল্লেখ করেছি। তাঁকে একটি মত থেকে অন্য মতে নিয়ে যাওয়া যে কত সহজ কাজ ছিল তা ব'লে বোঝানো যায় না। তুচ্ছ ছোটখাটো কত ঘটনা যে ঘটে গেছে তাঁর জীবনে, সে সকলের কথা না হয় নাই বল্লাম এখানে।

একবারের ঘটনা। আমরা চার পাঁচ জন দুর্গাপূজার আগে দার্জিলিঙ আশ্রমে যাচ্ছি। সেটা হ'ল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৬ই আশ্বিন ১৩৪৪)। তখন লিবঙে ঘোড়দোড়ের মাঠে তখনকার বাংলার গভর্ণর স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য পাশপোর্ট (ছাড়পত্র) পাওয়া ছিল ভারি হাঙ্গামার কথা। শিলিগুড়িতে নেমে দার্জিলিঙ হিমালয়ান রেলে বা মোটরে চড়ার আগে যাত্রীদের রীতিমত সার্চ করা হ'ত ও পাশপোর্টের ব্যবস্থা ছিল। স্বামিজী মহারাজ তাই পাঁচজনের নামে টাইপ করা একখানি সর্টিফিকেট-পত্র সঙ্গে দিলেন। শিলিগুড়ি-ষ্টেশনে নেমে পুলিশকে সেটা দেখাতেই আমাদের সাতখুন মাপ হ'য়ে গেল। আমরা দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান রেলের কামরায় গিয়ে বসলাম এবং নানান দৃশ্য দেখতে দেখতে বেলা প্রায় ৩টার সময় দার্জিলিংয়ে গিয়ে পৌঁছালাম। দার্জিলিঙে সেদিন বৃষ্টি ছিল না, আকাশ পরিস্কার দেখে মনে ভারি আনন্দ হ'ল। দার্জ্জিলিঙে গিয়ে থাকবো দিনকতক এটাই ছিল আগে থেকে ঠিক করা। কিন্তু দু'চারদিন থাকার পর হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির—'You five must come by the first train',

অর্থাৎ তোমরা পাঁচজনে অতি-অবশ্য প্রথম গাড়ীতে ফিরে আসবে। পড়ে তো হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, ভাবলাম সকল ফন্দিই আমাদের নিষ্ফল হ'ল।

এখন ফন্দিটা যে কি ছিল সেটাই এখানে কিছু বলা দরকার। স্বামিজী মহারাজের কাছে অনুমতি নিয়ে কোথাও যাওয়া কারু ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটত। কাকেও বাইরে (দেশান্তরে) যেতে দিতে তিনি চিরদিনই গররাজী ছিলেন। বলতেন: 'কি হবে গো? এখানেই (মঠেই) ভাল। মঠ, মিশন, আশ্রম—এ'সব হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) well-protected fortress (সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ)'। কিন্তু আমরা বাইরে যাবার দল এ'সব কথায় বিশেষ সায় দিতাম না। অথচ স্বামিজী মহারাজের কাছে গিয়ে বাইরে যাবার অনুমতি নেবার সাহসও আমাদের সব সময় ঘটে উঠত না। যদি বা কেউ গিয়ে বলত যে দিনকতকের জন্য কাশী, হরিদ্বার বা উত্তরকাশী যাবে, তবে স্বামিজী মহারাজ বলতেন: 'কিসে ক'রে যাবে? গাড়ীতে চেপে দেশভ্রমণ তো? পায়ে হেঁটে যাও দিখিনি কাশী—কি হরিদ্বার, দেখি কি রকম বৈরাগ্য? এই তো আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে বেড়িয়েছি। আর তোমাদের গাড়ী না হ'লে চলে না'। এ'পর্যন্ত বলেই চুপ ক'রে থাকতেন বা অন্য কথা কইতেন। এ'সবের পর যদি কেউ আরো একবার অনুরোধ জানাত অনুমতি পাবার জন্য, তবে তিনি স্বভাবতই একটু গম্ভীরভাবে বলতেন: 'তপস্যা মানে তো ছত্রের রুটি খাওয়া নয়। সে এখানেও পাবে। বেশ তো, এখানেই দিনকতক কাজ-টাজ থেকে ছুটি নিয়ে দিনরাত্তির ধ্যান-জপ করনা কেন? খাবার যোগাবার

ভার রইল আমার, সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। কিন্তু তা কি আর করবে? হরিদ্বার, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী এই সব জায়গায় না গেলে তো তোমাদের ধ্যান-জপ জম্‌বেই না। কিন্তু জেনো রেখো বাবা, ফাঁকি দিয়ে ধর্মলাভ হয় না। যার আছে এখানে, তার আছে সেখানে। মনই হ'ল আসল তা' আগেও বলেছি। কাশী হরিদ্বার গেলেই তো আর ভগবান লাভ হয় না। মনটাকে স্থির করো, তা হলেই হবে। এখানে বসেই তা' হয়। বাইরে গেলে থাকা-খাওয়ার ভাবনা ভাবতে হবে, কতরকম অসুবিধে ও বাধা-বিপত্তি। এখানে সে' সবের বালাই নেই। তৈরী রান্না-ভাত, থাকা-খাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই। নিরিবিলি (নির্জনতা) তো আর বনে-জঙ্গলে নেই, মনটাকে স্থির করলেই হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মন-প্রাণ দিয়ে দিনকতক কাজ কর দিথিনি। নিষ্কামভাবে কাজ করবে। 'আমি করছি', 'আমি না হলে মঠ আশ্রমের কাজ হবে না' এ'সব ভাব মনে আনবে না। এ'সব ভাব অহংকারের নামান্তর। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বদা স্মরণ করবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তিনি তোমাদের বাড়ীর পাশে এসে এবার জন্মেছেন কিনা—তাই কদর তাঁর কিছু বুঝলে না। কাশী যাব, হরিদ্বার যাব, উত্তরকাশী যা'ব—এই সব'। এ'সকল কথা বলতে বলতে স্বামিজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত ও রক্তিম হ'য়ে উঠত। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতেন: 'নিষ্কাম কর্মই আসল। মনে সর্বদা ভক্তি, বিশ্বাস ও বিচার আনবে। সব এখানে (মঠে, আশ্রমে) বসেই হবে। ভগবানের রাজত্ব সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে। তিনি এক জায়গায় না থাকেন তো অন্য জায়গায়ও থাকবেন না।'[১] তাই বনেই

১। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ইংরেজী 'ওয়ে টু দি ব্লেসড লাইফ'

যাও আর হিমালয়েই যাও, এই মন নিয়েই তো যাবে? মন তো আর ছুটো নয়। অস্থির চঞ্চল মন নিয়ে তুনিয়া ঘুরে বেড়ালে প্রাণে শান্তি পাবে না। যার মন শান্ত হয়েছে, সে তো সব-কিছুরই পারে চলে গেছে। গীতার সেই 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠম্'[২] ও 'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ'[৩] শ্লোক-তুটি স্মরণ করবে, তাদের অর্থ ধ্যান করবে,

---

বইয়েও (পৃঃ ১২) ঠিক এ'ধরনের কথা বলেছেন। যেমন: 'Where shall we find that true life? Shall we have to go into a cave, or a forest, or a desert to find it! No. It is dwelling within the cave of each individual heart and we must search within.'—অর্থাৎ যথার্থ আদর্শ জীবন বা আত্মস্বরূপের সন্ধান আমরা কোথা গেলে পাব? গিরিগহ্বর, অরণ্য বা মরুভূমির মধ্যে কি তাঁর সন্ধানে যেতে হবে? কখনই না। আত্মা—'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং', 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'; প্রত্যেক প্রাণীর সত্যিকার স্বরূপ হৃদয়-গুহার ভিতরেই জ্যোতির্ময় রূপে আছে, তারজন্য বাইরে কোথাও তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে না, নিজের নিজের অন্তরের মধ্যেই আত্মার কল্যাণতম রূপ দর্শন করতে হয়।

২। 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥'

—গীতা ২।৭০

যেমন নদ-নদী তরঙ্গবিহীন প্রশান্ত সাগরে প্রবেশ করে, তেমনি সমস্ত কামনার অবসান যাঁদের হয়েছে, যাঁরা পরম-নির্বিকার, তাঁরাই যথার্থ শান্তির অধিকারী হন। কামনাসক্ত চঞ্চল মনযুক্ত লোকেরা শান্তির সন্ধান কোনদিনই পায় না।

৩। 'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥'

—গীতা ২।৭১

যার বাসনা শান্ত হয়েছে, একমাত্র সেই ভাগ্যবানই যথাযথভাবে অযথা মমতা, অহংভাব ও স্পৃহাশূন্য হ'য়ে সংসারে বিচরণ করতে পারেন; তিনি পরমশান্তি লাভ করেন।

তা' হলেই ধারণা জন্মাবে ও ধারণা দৃঢ় হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হবে'।

স্বামিজী মহারাজের এই সব কথার পর আমাদের কারুরই আর কোন কথা বলার সাহস থাকত না। তাই কোন রকমে ছাড়পত্র পেয়ে যখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো দার্জিলিঙ আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়েছি তখন সহজে না-ফেরার ফন্দিই ছিল আমাদের প্রায় সকলের ভেতর পাকাপাকি। তা' ছাড়া আরো এক কথা যে, প্রতি বছর আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজার সময় কলকাতার মঠে ঘটে-পটে মহামায়ার পূজা হ'ত। সুতরাং পূজার আগে যখন আমরা দার্জিলিঙ রওনা হচ্ছি তখন পূজার কিছু আগেই আমাদের মঠে ফেরা উচিত। কিন্তু আমরা ভাবলাম একটু ভিন্নভাবে যে, স্বামিজী মহারাজ নিজে কলকাতার মঠে আছেন তখন আমরা না ফিরলেও দুর্গাপূজা তিনি চালিয়ে নেবেন কাকেও-না-কাকে দিয়ে, সুতরাং কলকাতায় পূজার আগে না ফিরলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু সুচতুরম্মন্য আমাদের চেয়ে স্বামিজী মহারাজের বুদ্ধি যে অনেক ক্ষুরধার ও সুদূরপ্রসারী ছিল তা' আমরা তখন খতিয়ে দেখিনি। ভেবেছিলাম আমাদের মতলবই পাবে জয়টীকা। কিন্তু স্বামিজী মহারাজের টেলিগ্রামের তাড়া খেয়ে আমাদের সকল ফন্দীই ফাঁস হ'য়ে গেল, থাকার প্রশ্ন আর বিন্দুমাত্রও থাকল না। তাড়াতাড়ি বাসের (Bus) টিকিট কাটতে দেওয়া হ'ল ও পোটলা-পুঁটলি বেঁধে 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে ঠিক দুপুরবেলাই দার্জিলিঙ থেকে ক'লকাতার দিকে রওনা হওয়া গেল—৯ই অক্টোবর (১৯৩৭, ২৩শে আশ্বিন ১৩৪৪) শনিবার।

সন্ধ্যার কিছু পরে এসে পৌঁছিলাম শিলিগুড়ি ষ্টেশনে। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস তখন প্ল্যাটফর্মে প্রায় তৈরী হয়ে আছে। কলকাতার টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। সারারাত্রি কাটল কতক বসে, কতক বা গোলমালের ভেতর দিয়ে বিপর্যস্ত হ'য়ে। সেদিন গাড়ীর বিলম্ব হয়েছিল ছাড়তে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল অনেক দেরীতে, অর্থাৎ বেলা তখন হবে প্রায় ন'টা (১০ই অক্টোবর রবিবার)। একটা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে পৌঁছানো গেল মঠে। এসে শুন্‌লাম আমাদের পৌঁছানোর দেরী দেখে স্বামিজী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে পাঠিয়েছেন ষ্টেশনে, চিন্তিতও হয়েছেন খুব বেশী রকম। শুধু তাই নয়, আরো একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছেন দার্জিলিঙ আশ্রমে—তাড়াতাড়ি যাতে রওয়ানা হই আমরা ক'ল্‌কাতার দিকে।

বেদান্ত মঠে পৌঁছে অফিস ঘরে গিয়ে স্বামিজী মহারাজকে আমরা প্রণাম করলাম। তখন অন্যমনস্কভাবে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। দেখলাম—বেশ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। আমাদের দেখে তিনি যেন আশ্বস্ত হ'য়ে বল্লেন: 'এই ত্যাখো দিখিনি—মহাচিন্তায় পড়েছিলাম। সকাল আটটায় কোথা আসার কথা, আর বাজতে চল্লো এখন প্রায় এগারটা। আটটা, ন'টা, দশটা পরপর বেজে গেল, ভেবেই অস্থির। যাইহোক, তোমরা যে নিরাপদে পৌঁছেছ, ভালই হয়েছে। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা।'

আমরা পাঁচজনে প্রণাম ক'রে নীচে নামবার উপক্রম করছি, এমন সময় স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'ত্যাখো, একটা কথা শুনে যাও। আমি একরকম ঠিক করেই ফেলেছি যে, এ'বছর প্রতিমা এনে মঠে মা দুর্গার পূজা হবে'। ২৫শে

আশ্বিন (১৩৪৪ সাল, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৭) সোমবার শ্রীদুর্গাপূজা। আমরা এসে পৌঁছেছি কলকাতায় রবিবার (২৪শে আশ্বিন), সুতরাং পূজার বাকী ছিল মাত্র একদিন। স্বামিজী মহারাজের কথা শুনে আমরা তো অবাক্। বল্লাম—'সে কি মহারাজ, টাকা কোথা ?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন : 'টাকা-পয়সার ভাবনা নেই, তোমরা লেগে পড়ো দিখিনি'।

'টাকা-পয়সার ভাবনা নেই, লেগে পড়ো দিখিনি—' স্বামিজী মহারাজের এই সহজ সরল কথাগুলি শুনে আমরা আরো আশ্চর্যান্বিত হলাম ও বুঝতে পারলাম 'You five must come by the first train' টেলিগ্রামের নিগূঢ় তাৎপর্যটা কি।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, কত টাকা আপনি পেয়েছেন ?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন : 'আরে হবে—হবে। পঞ্চাশ টাকা ক—বাবু দেবেন বলেছেন। ওতেই সামান্য ক'রে হবে' পঞ্চাশ টাকার কথা শুনে আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আমাদের হাসি দেখে স্বামিজী মহারাজ গেলেন একটু চটে। তিনি গম্ভীরভাবে বল্লেন : 'ঐ তো সব তোমাদের ছেলেমানুষী। যাও, এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবে না। হাত-মুখ ধোও গে। প্রতিমা এনে দুর্গাপূজা এবার মঠে করতেই হবে, কারু কথাই আমি শুনবো না।'

ব্যাপার দেখলাম বেশ গুরুতর। বুঝলাম সরল বিশ্বাসী স্বামিজী মহারাজকে নিশ্চয়ই কেউ বুঝিয়েছে সামান্যভাবে দুর্গাপূজা পঞ্চাশ টাকাতেই হবে। দেখলাম ঐ বিশ্বাসে তিনি একেবারে অচল-অটল। শুনলাম যে, আমাদেরই মধ্যে থেকে একজন বিশেষজ্ঞ নাকি তাঁর

বিজ্ঞ মন্তব্য দিয়েছেন স্বামিজী মহারাজকে সমর্থন ক'রে সুতরাং দুর্গাপূজা না হবার কারণ বা ওজর-আপত্তি কিছু থাকতে পারে না। দেখলাম এত শীঘ্র ব্যাপারটাকে নড়চড় করাও সহজ হবে না, কাজেই কোন রকম বোঝানোর ব্যাপার থেকে তখনকার মতো নিরস্ত হওয়াই ভাল।

অবশ্য আসল ব্যাপারটা এখানে গোপন করায় কোন লাভ নাই। স্বামিজী মহারাজের কাছে থেকে তাঁর নিছক সারল্যের সুযোগ গ্রহণ করার ফন্দি-ফিকিরও আমরা কিছু কিছু শিখে ফেলেছিলাম। একান্ত সরল বিশ্বাসী স্বামিজী মহারাজকে পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজা সহজসাধ্য—একথা অবশ্যই কেহ বুঝিয়েছেন তা টেরও পেয়েছিলাম তা বলেছি। কাজেই তখন দরকার মাত্র তাঁকে বুঝানো যে, পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজা কোনদিনই সম্ভব নয়।

হ'লও তাই। কিছুক্ষণ পরে আমাদেরি মধ্যে একজন স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করার জন্য হাজির হ'ল। স্বামিজী মহারাজ তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিগো, ফর্দ তৈরী করেছ?' সে বল্লে: 'আজ্ঞে ফর্দ তৈরী তো করেছি, কিন্তু কথা হ'ল—যে টাকা আপনি পেয়েছেন তাতে প্রতিমার দামই তো হবে না—তা পূজো'?

স্বামিজী মহারাজ বালকের মতো অবাক হ'য়ে বল্লেন: 'সে কি! প্রতিমাই হবে না?' আমাদের বন্ধু উত্তর করলেন: 'আজ্ঞে না, এক প্রতিমার দামই খুব কম ক'রে পড়বে দেড়শো দু'শো টাকা'। স্বামিজী মহারাজ বিস্ময়ে বন্ধুটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'বলো কি?' তারপর কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত হ'য়ে বল্লেন: 'তা হো-লে যেমন বরাবর হয় তেমনি ঘটে-পটে এবারেও হবে, তাতে আর কি'।

আমাদের বন্ধু দেখলো—হলো আরো মুস্কিল। বিপদ এড়াতে গিয়ে সেই বিপদই আবার অন্যভাবে এসে হাজির হ'ল। বন্ধুকে চিন্তা করতে দেখে স্বামিজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কি বলো?' বন্ধু বল্লেঃ 'আজ্ঞে মহারাজ, কিন্তু তাই বা ক্যামন ক'রে হবে?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেনঃ 'কেন?' বন্ধু বল্লেঃ 'আজ্ঞে ঘটে-পটে হলেও পূজো তো নিখুঁতভাবে করতে হবে? তাও আবার মঠের পূজা, সকলেই আসবে— নিমন্ত্রণ করুন আর নাই করুন। সামান্য ভাবে হলেও প্রসাদ সকলকেই দিতে হবে। টাকা কম বল্লে আমরা না হয় বুঝবো, কিন্তু লোকে কেন বুঝবে বলুন? তারপর ঘটেপটে পূজা করলেও সকল উপকরণ কাপড়-চোপড় ভোগ-রাগ ইত্যাদিতে অন্ততপক্ষে দু'শো-আড়াইশো টাকা তো লাগবেই তিন দিনের পূজোয়।'

স্বামিজী মহারাজ আমাদের বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেনঃ 'তা তো বটেই! মঠের পূজো, সকলেরই সমান অধিকার। সবার আনন্দের জন্যেই তো মহামায়ার পূজো, তা' অত দীনভাবে করলেই বা চলবে কেন? দেখ দেখিনি, ওটা কি মুখ্যু। আমাকে ক্যামন বুঝিয়ে দিলে যে, পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজো হবে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম অত কম টাকায় দুর্গাপূজো হয় ক্যামন ক'রে। কিন্তু অ—বল্লে— 'আজ্ঞে হয়'। সুতরাং আমিও তাই বুঝলাম। এখন দেখছি— ঠিকই বলেছে, পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজোর মতো পূজো ক্যামন ক'রে হয়? ওটা কিচ্ছু জানে না, তোমার কথাই ঠিক। অন্ততপক্ষে চারশ' পাঁচশ' টাকা তো চাইই—কি বলো?'[৪]

৪। গভীর বেদনা-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আজ স্বীকার করতে হচ্ছে যে, মহাপূজার অনুষ্ঠান স্বামী অভেদানন্দের জীবদ্দশায় নানান কারণে না হ'য়ে

বন্ধু বল্লে : 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন : 'তাহলে পটেই হোক মা-র পূজো। শ্রীমা-র প্রকৃতিতেই পূজো করবে, শ্রীমাকেই কল্পনা করবে মা দশভূজা ব'লে'।

কাজ সহজেই সফল হয়েছে দেখে আমরা অত্যন্ত খুসী হলাম। স্বামিজী মহারাজ তো চিরদিনই ভোলানাথ। বালকের মতো পঞ্চাশ টাকার সম্ভাবনাকে এক কথায় যেমন বিশ্বাস করেছিলেন, তেমনি একটি মাত্র কথায় আবার বিশ্বাসও করলেন তার অসম্ভাবনাকে। একেই বলে শিশুর সারল্য। পাকা সংসারীর মতো কড়ায়-গণ্ডায় হিসাবের বালাই তাঁর মধ্যে ছিল না, অথচ সামান্য কথা বোঝবার শক্তি যে ছিল না তাই বা ক্যামন ক'রে বলি? পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনসমাজে দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাগ্মিতা, মনীষা, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বিচক্ষণ অনুভূতির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন; ভারতীয় সমাজেও তাঁর যে পাণ্ডিত্য ও অন্তদৃষ্টির নিদর্শন হয়েছে তা' থেকে তাঁর বুদ্ধি, হৃদয়ের বিশালতা ও প্রসারতার কথাই প্রমাণিত হয়। একথাই সত্য যে, জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ ক'রে আমাদের মতো মানুষ হলেও তিনি ছিলেন অতিমানুষ। তাই পার্থিব সকল দৈন্য ও কারসাজীর তিনি অনেক উর্ধে ছিলেন। সরল বিশ্বাস নিয়েই তিনি দেখতেন সকল মানুষকে, তাই পার্থিব হিসাব-নিকাসের মায়াজাল কোনদিন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, অথচ পরিপূর্ণ অনুভূতি লাভ ক'রেও সচেতন ছিল তাঁর মন ও দৃষ্টি সংসারের সকল বিষয়ের প্রতি।

উঠলেও সেই শুদ্ধ ও শুভ বাসনা সফল হয়েছিল তাঁর মহাসমাধির ঠিক ছ'বছর পরে ও সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবৎসর মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে মহাসমারোহে কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে।

আর একদিনের এক ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে আছে। তার মধ্যেও পাই আমরা স্বামী অভেদানন্দের অকপট ভালবাসা, নিঃসংকোচ ভাব, অমায়িকতা ও শিশুসুলভ সারল্য।

একদিন এক আগন্তুক ভদ্রলোক স্বামিজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহারাজ, বিশ্বাস ক্যামন ক'রে হয়?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'গুরু ও শাস্ত্র বাক্যকে মেনে নিলে হয়। গুরু বলেছেন ঈশ্বর আছেন, শাস্ত্র বলেছে ভগবান আছেন, সুতরাং মন সেটাকে সত্যি বলে মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়ার নামই বিশ্বাস। গুরু কিনা ঈশ্বরকে যিনি দেখেছেন, নিজের শাশ্বত স্বরূপকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছেন তিনি। শাস্ত্রেও তাই আছে: 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'। শাস্ত্র বলতে দিব্যদ্রষ্টা ঋষি বা তত্ত্বজ্ঞানীরা অনুভূতি দিয়ে যেসব তত্ত্বকথা জেনে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন'। এ পর্যন্ত বলেই স্বামিজী মহারাজ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে আবার বল্লেন: 'কি জানেন, ঠিক ঠিক বিশ্বাস আসে ঈশ্বর দর্শন হলে, তার আগে পর্যন্ত থাকে assuming belief (ধরে নেওয়া বিশ্বাস)। Assuming belief (ধরে নেওয়া বিশ্বাস) আবার বিচারযুক্ত না হ'লে টেকে না, তার ব্যতিক্রম হয়। বিশ্বাস বিচারযুক্ত হ'লে তবেই তা থেকে নিষ্ঠা ও অনুরাগ জন্মায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: কলিতে নারদীয়া ভক্তি কিনা বিচারযুক্ত ভক্তি। একেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে'।

তারপর এলো জীবন্মুক্তের প্রসঙ্গ। সেই ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি?' স্বামিজী মহারাজ বললেন: 'দেখবেন, অহরহঃ যিনি ভগবানের নামে

আত্মহারা, যিনি নিরভিমানী, নিরহংকার, সর্বজীবে সমদর্শী, মায়ানির্মুক্ত ও পরোপকারী তিনিই জীবন্মুক্ত। গীতার সে' শ্লোকটির কথা মনে আছে তো: 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী'? মনে মান-অপমান, বিষ্ঠা-চন্দন সব তখন এক জ্ঞান হয়। লোক-কল্যাণের জন্যে জ্ঞানীর কেবল স্থূল-শরীরটা থাকে। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। সাক্ষী ও দ্রষ্টার মতো মায়িক দুঃখ-কষ্টের সংসারে থেকেই তিনি খেলা করেন, কিন্তু নিরাসক্তভাবে, এতটুকু মায়া বা আসক্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন লুকোচুরি-খেলায় বুড়ি ছুঁলে আর চোর হয় না, তখন সাতখুন মাপ। জীবন্মুক্তের অবস্থাও তাই। এই পার্থিব শরীর থাকতে থাকতেই জীবন্মুক্তের জীবন-রহস্যের চিরসমাধান হয়। তখন মায়ার সংসারে তিনি মায়াতীত হ'য়ে বাস করেন'।

আফিস-ঘরে সমাগত ভক্তরা তখন স্বামিজী মহারাজের কথা শুনছিলেন। কারুরই বাইরের জগতের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক ছিল না, স্থির ধীর গম্ভীর ভাব যেন সমস্ত ঘরটার ভেতর জমাট বেঁধে ছিল। স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন: 'যেমন ত্যাখনা আমরা, বুড়ি ছুঁয়ে বসে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ শেষ হলেই আমাদের ছুটি'। কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে স্বামিজী মহারাজ ক্যামন একটু আন্‌মনা হলেন। ঘরটিতে তখনও জমাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ চুপ করার পর তিনি সকলের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন: 'কি জানেন জীবন্মুক্ত হ'লে বা ঈশ্বর লাভ করলে কি আর চারটে হাত বেরোয়, না মাথায় শিঙ গজায়? তিনি যেমনটি আগে ছিলেন; জ্ঞানলাভের পরেও তেমনটিই থাকেন, ভেতরটাই কেবল তাঁর পাল্‌টে

যায়, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। তখন সব-কিছু ব্রহ্মময় বলে তিনি উপলব্ধি করেন, এতটুকু সন্দেহ আর মনের মধ্যে থাকে না। জগতের সঙ্গে ব্যবহারও তাঁর আগেকার মতো থাকে, খাওয়া-পরা, কথা কওয়া হাসি ঠাট্টা-তামাসা, লোকের সঙ্গে মেলামেশা—এসবের কোন-কিছুরই ব্যতিক্রম হয় না। তবে ব্যতিক্রম হয় সাধারণ মানুষের ব্যবহারের সঙ্গে। সাধারণ মানুষ মায়া-মমতায় আবদ্ধ হ'য়ে দেহটাকে ইহসর্বস্ব জ্ঞান করে, কিন্তু জীবন্মুক্ত তা করেন না, তিনি তখন দেখেন: ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্, সমগ্র—বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্মেরই রূপ বা বিকাশ। তাই ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই তিনি ভাব্‌তে পারেন না। তিনি অনুভব করেন ব্রহ্মই সকলের আধার; সর্বত্র ব্রহ্মেরই বিকাশ। মিথ্যা মানেই অনিত্য'। আমরা তখনো বসে অনিমেষনেত্রে স্বামিজী মহারাজের তেজোব্যঞ্জক অথচ আপনভোলা-ভাব লক্ষ্য করছিলাম।

* * * *

আর একদিনের কথা। আমাদেরি একজনের সঙ্গে নিরামিষ খাওয়া নিয়ে প্রসঙ্গ উঠ্‌ল। প্রথমে হ'ল নরম আলোচনা, তারপর তা' গরমে হ'তে-হ'তে চরমে উঠল। আলোচনা যাঁর সঙ্গে হচ্ছিল তিনি ছিলেন নিরামিষ খাওয়ার একান্ত অনুরাগী এবং সেই অনুরাগের একমুখী নিষ্ঠা পরিশেষে তাঁর মধ্যে গোঁড়ামীর ভাবকেই বরং পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিল। বিতর্কের মধ্যে আমরা বল্‌ছিলাম: 'কিছু খাওয়া, না-খাওয়া বা আমিষ-নিরামিষ যে যার রুচির ওপর নির্ভর করে, কিন্তু তাই ব'লে গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। আচার-বিচার দিয়ে ভগবান লাভ হয় না। ভগবান পার্থিব সকল কিছুরই বাইরে। ভগবান মানুষের মন দেখেন,

তিনি বিচার-আচার দেখেন না' ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সে'সব কথা আর তখন শোনে কে? বন্ধুটি গেলেন সপ্তমে চড়ে। শাস্ত্রের নজির তুলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন: 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, খাওয়া-দাওয়ায় শুদ্ধ বা সাত্ত্বিকভাবে হলে তবেই মন পরিশুদ্ধ হয়। আমিষ খেলে মন চঞ্চল হয়, মনকে স্থির ও শুদ্ধ করতে হলে তাই নিরামিষ খাওয়া দরকার'।

আমরা বল্লাম: 'কথাটা সত্যি। কিন্তু আহার বল্‌তে ওখানে খাওয়া-দাওয়া বোঝাচ্ছে না। শংকরাচার্য আহার বল্‌তে ইন্দ্রিয়সংযম অর্থ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: শূকর মাংস খেয়ে যদি ভগবানে নিষ্ঠা হয়, তবে তাই শুদ্ধ আহার, আর নিরামিষ আহার ক'রে যদি ঈশ্বরে মতি না আসে তবে তাকে অশুদ্ধ আহারই বল্‌তে হবে। শ্রীমা (শ্রীশ্রীসারদাদেবী) তো তাঁর ছেলেদের (ভক্ত শিষ্যদের) ঢালা হুকুম দিয়েছেন: 'বংলাদেশে মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে সাধন-ভজন কর্‌বি। তাতে যদি কোন পাপ হয় তো আমার'। মা করুণাময়ী, বাংলাদেশের হাওয়া-বাতাস তিনি বুঝতেন, তাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও ক'রে গেছেন। স্বামিজীরাও যে যার রুচির ওপরই জোর দিয়েছেন, জোর-জবরদস্তি ক'রে কিছু খাওয়া বা না খাওয়ার কথা বলেন নি। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর তো স্পষ্ট বলেছেন: 'যার পেটে যা সয়'। সুতরাং আমিষই বলুন আর নিরামিষই বলুন যে রকম আহার করলে সহজে হজম হয়, শরীর সুস্থ থাকে, সে আহারই শ্রেয়। কাজেই বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও গোঁড়ামীর কোন প্রশ্নই এখানে উঠ্‌তে পারে না'। কিন্তু বন্ধু আমাদের ঐ সব কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না।

তারপর সোজাসুজি প্রসঙ্গ উঠ্‌লো গোঁড়ামীর কথা নিয়ে। আমরা বন্ধুকে বল্লাম: 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কী উদার ভাব ছিল! খাদ্যাখাদ্যের বিচার নিয়েই যদি সারা জীবন কেটে যায় তবে ভগবান লাভের চেষ্টাই বা মানুষ করবে কখন বলুন? শ্রীশ্রীঠাকুরও তো বলেছেন: 'বাগানে ঢুকে জো-সো ক'রে আম খাওয়াই দরকার, পাতা গুণে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি। স্বামিজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) তো গোড়াকার দিকে আমেরিকায় নিরামিষ আহার করতেন, 'হোয়াই এ হিন্দু ইজ্‌ এ ভেজিটেরিয়ান্‌'[৫] বই তার প্রমাণ। আমেরিকার লেখক ওয়েনডেল টমাস 'হিন্দুইজম্‌ ইন্‌ভেড্‌স্‌ এ্যামেরিকা" (পৃঃ ১১১) বইয়ে তাঁর (স্বামী অভেদানন্দের) শতমুখে প্রশংসা ক'রে লিখেছেন: 'His case of vegetarianism, for example, makes a strong appeal on its own merits'। কিন্তু এই রকম খাওয়াতে তাঁর শরীর যখন খারাপ হ'তে থাকল তখন আবার তিনি আমিষ আহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখেছেন তো—'লিভ্‌স ফ্রম্‌ মাই ডায়েরী-তে' (পৃঃ ৩৯) স্বামিজী মহারাজ নিজেই এ' সম্বন্ধে কি লিখেছেন? তিনি বলেছেন: 'Here I was a strict vegetarian, living on boiled potatoes and beans white bread and butter. After a few days I suffered from idigestion and Dyspepsia. Dr. Janes came to see me and when I told that I did not eat any kind of meat, fish or eggs, the good doctor replied: 'That would not do for you

---

৫। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ নিউ-ইয়র্কের ভেজিটেরিয়ান্‌ সোসাইটী'-তে স্বামী অভেদানন্দ এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন।

here. When you go to Rome, do as the Romans do. You have a mission in your life, you must take proper nourishing food, otherwise you will fall sick.' অর্থাৎ 'আমেরিকায় আমি পুরোদস্তুর নিরামিষভোজী ছিলাম। আলুসিদ্ধ, শিম, সাদারুটি ও কিছু মাখন খেতাম মাত্র। কিছুদিন পরে আমার বদহজম হ'তে লাগ্‌ল ও তা থেকে পেটের অসুখ হ'ল। ডাঃ জেনস্‌ আমায় দেখ্‌তে এলেন। আমি মাছ, মাংস, ডিম—এ'রকম কোন জিনিসই খেতাম না এ'কথা বল্লাম। নেহাৎ ভালমানুষ ডাক্তার আমার কথা শুনে বল্লেন, ওসব করা এদেশে চল্‌বে না। আপনি যখন রোমনগরীতে যাবেন তখন আপনার রোমবাসীদের মতোই থাকা-খাওয়া উচিত নয় কি? আপনার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কাজেই পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া আপনার দরকার, তা না হ'লে আপনি ভীষণ অসুখে পড়ে যাবেন'।[৬]

এই পর্যন্ত বলেই যে আমরা নিরস্ত হলাম তা নয়, বন্ধুকে

৬। স্বামী অভেদানন্দ যে আমেরিকায় গোড়ার দিকে নিরামিষ আহার করতেন তাও স্বামী সারদানন্দের অনুপ্রেরণায়। কারণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭।২৮ সেপ্টেম্বরের ডায়েরীতে তিনি উল্লেখ করেছেন: 'At that time I was a strict vegetarian living on boiled vegetables, bread and milk. Swami Saradananda told me that he was a strict vegetarian and that I should also set an example of the same, if I wanted to have success in my mission and works. I respected his advice and lived up to the ideas of a strict vegetarian and a teetotaller';—অর্থাৎ 'সে সময়ে আমি একেবারে খাঁটি একজন নিরামিষভোজী ছিলাম। খেতাম মাত্র শাক্‌সবজী, রুটি আর দুধ।

আরো বল্লাম: দেখেছেন তো, স্বামিজী মহারাজ নিজেই স্বীকার করেছেন: 'This friendly advice of Dr. Janes made a great impression on my mind,'—'ডাঃ জেন্‌সের কথা সত্যিই আমার মনের ওপর একটি গভীর রেখাপাত করেছিল'। এ'টি হ'ল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ ১৭ই আগষ্টের ঘটনা। তারপর স্বামিজী মহারাজ আমিষ আহার করার জন্য কলকাতা বাগবাজার মঠে শ্রীমার (শ্রীসারদাদেবীর) কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেছিলেন,[৭] শ্রীমাও তাঁকে আমিষ আহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন শুনেছেন তো? শ্রীমার

স্বামী সারদানন্দ নিজেও একজন নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী ছিলেন। তিনি আমায় বল্লেন: 'তুমি এদেশে যদি তোমার উদ্দেশ্যে ও কাজে কৃতকার্য হ'তে চাও তবে তোমার উচিত হবে নিরামিষ খাওয়া। এতে তোমার কাজের প্রসার হবে'। আমিও তাঁর উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম ও সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ আহার করতাম। চা-প্রভৃতিও আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলাম'।

৭। শ্রীমার পত্র:

"৮।১, বাগবাজার ষ্টীট,
কলিকাতা
মার্চ, ১৮৯৯

"কল্যাণবরেষু,

"গতকল্য তোমার এক কুশলসহ পত্র পাইয়া * * আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোরাদি করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ ভোজন না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। * * *। ইতি—
তোমাদের মা।"

সমগ্র পত্রটি 'পত্র-সংকলন', পৃঃ ১-২ দ্রষ্টব্য

আদেশ পাওয়ার পর থেকে স্বামিজী মহারাজ নিরামিষ আহার ত্যাগ করেছিলেন ও আজ পর্যন্ত সেই আমিষ আহারই করেন। গোড়ামীর বশে তিনি তো কই নিরামিষ খাওয়াকেই ইহসর্বস্ব বলে ধ'রে থাকেন নি'।

কিন্তু আমাদের কথা তখন শোনে কে? বন্ধু নিরুপায় ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে একেবারে স্বামিজী মহারাজের কাছে গিয়ে হাজির। স্বামিজী মহারাজ তখন তাঁর আফিস-ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে বন্ধু কিভাবে নালিশ করেছিলেন তা' জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একজন ভগ্নদূত এসে আমাদের সংবাদ দিলেনঃ 'স্বামিজী মহারাজ আপনাদের ডাক্‌ছেন'। ডাকার নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝার তখন আর আমাদের বাকী থাকল না। একান্ত অপরাধীর মতো স্বামিজী মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে আমরা দাঁড়ালাম সাম্‌নের টেবিলটির ধারে। দেখলাম সেই বন্ধুও স্বামিজী মহারাজের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ফরিয়াদীর মতো আসামী আমাদের বিরুদ্ধে বিচারের রায় পাবার অপেক্ষায়। স্বামিজী মহারাজের হাত থেকে বাঁচবার সকল কৌশলই অবশ্য আমাদের জানা ছিল আগেকার অনেকগুলি ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে। আমরা ভালভাবেই জান্‌তাম যে, স্বামিজী মহারাজ সাক্ষাৎ ভোলানাথ, সত্য যা—সঠিকভাবে তা' বুঝিয়ে দিতে পারলে সকল গোলমালের অবসান হবে। শিবের মাথায় একটু গঙ্গাজল আর একটি বেলপাতা নিষ্ঠার সঙ্গে দিতে পারলেই হ'ল, আশুতোষ ঐ সামান্যতেই পরিতুষ্ট।

স্বামিজী মহারাজ আমাদের দেখে বেশ একটু রাগ রাগ স্বরে বল্লেনঃ 'কিগো, তর্ক-বিতর্কের পালা পরিশেষে

হাতাহাতিতে দাঁড়াবার উপক্রম। ব্যাপারটা কি বলো দেখি? জোর ক'রে কারুর ভাব নষ্ট করতে নেই। তোমরা নাকি নিরপরাধী আমাকেও তোমাদের বাগ্‌যুদ্ধের ভেতর টেনে আনতে ছাড়নি?' আমরা শুনে তো অবাক। বল্লাম: 'সে কি মহারাজ, আপনাকে কি বলেছি?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'তোমরা নাকি বলেছ যে, আমি 'হোয়াই এ হিন্দু ইজ এ ভেজিটেরিয়ান্' বইখানি লিখে মোটেই ভাল কাজ করিনি, কেননা কাজে ও কথায় আমার মিল নেই?' আমরা সমস্ত কথা শুনে একদিকে যেমন বন্ধুর তারিফ না ক'রে থাকতে পারলাম না, অপর দিকে তেমনি হাসি চেপে রাখা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের চাপা হাসি দেখে সামিজী মহারাজ আরো একটু চটে গেলেন। তিনি বল্লেন: 'কি, হাস্‌ছ যে? বই লেখায় আমার কি অপরাধ হয়েছে বলো দেখি?' আমরা বল্লাম: 'মহারাজ, ঘটনা কিন্তু মোটেই তা' নয়, কথাগুলি ঘুরিয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আসলে আমরা যা বলেছি তা' শুনুন'। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'বলো'। আমরা বল্লাম: 'আমিষ-নিরামিষ খাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েই কথাগুলি অবশ্য উঠেছে। আমরা গোঁড়ামির নিন্দা করেই আগাগোড়া সকল কথা বলেছি। বন্ধু নিরামিষ খাওয়ার একান্ত পক্ষপাতী। নিরামিষ না খেলে চিত্তশুদ্ধি ও ধর্মলাভ হয় না—এ'কথাই চেঁচামেচি ক'রে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও আপনাদের উদার ভাবের উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে, ধর্ম-সাধনায় গোঁড়ামির ভাব মোটেই ভাল নয়। তা' ছাড়া কেবল আমিষ-নিরামিষ খাওয়ার বাচবিচার দিয়ে ভগবান লাভ হয় না। এই দেখুন না, আমাদের স্বামিজী মহারাজই তো গোড়ার

দিকে নিরামিষভোজী ছিলেন, আমেরিকায় 'হোয়াই এ হিন্দু ইজ্ এ ভেজিটেরিয়ান্' বইও লিখ্লেন, তারপর শ্রীমা অনুমতি দিতে অতদিনের অভ্যাস ও সংস্কার তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, আবার আমিষ-আহারই করতে লাগলেন। কই, কিছুমাত্র গোঁড়ামী কি তাঁকে স্পর্শ করেছিল? এই উদার আদর্শই তো আমাদের অনুসরণ করা উচিত, না নিজের মনগড়া সংস্কারকে নিয়ে আমরা পড়ে থাক্বো?'

স্বামিজী মহারাজ ছোট শিশুর মতো উচ্চহাস্য ক'রে বল্লেন: 'আরে ঠিক তো, তোমরা ঠিকই তো বলেছ, গোঁড়ামী করবে কেন? গোঁড়ামী তো সংকীর্ণতার নামান্তর। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকল গোঁড়ামীর পারে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। আমিষ নিরামিষ নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ কি বলো? ভক্তি, নিষ্ঠা, ঈশ্বরে অনুরাগই আসল। সেই সব যাতে হয় তাই করবে, তাই সাধনা। ভগবান খাওয়া খাওয়ি-বিচারের বাইরে। তিনি চান তোমাদের মন—তোমাদের ঐকান্তিকী ভক্তি, নিষ্ঠা ও ত্যাগ। এটা খাওয়া উচিত, ওটা উচিত নয়—এই বাদবিচার তো যুগ-যুগান্তর ধ'রে চ'লে আসছে। আমাদের সমাজ ওই ক'রে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। দ্যাখো দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর কত উদার ছিলেন! তিনি বল্লেন: 'তোমাদের খাওয়া-খাওয়ির ভেতর ভগবান নেই। মন-মুখ এক ক'রে ঈশ্বরের ভজনা করো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) চাও, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপা করবেন'। তারপর হাসতে হাসতে আমাদের বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্লেন: 'কিরে? তুই ভুল বুঝেছিস। ওরা তো ঠিকই বলেছে। গোঁড়ামী কি ভাল? এই গোঁড়ামী, সংকীর্ণ সংস্কার ও

অন্ধবিশ্বাস দূর করতেই তো এবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব এলেন। তিনি ছিলেন সমন্বয়ের অবতার! এত বড় সমদর্শী অবতার আর কোন যুগে আসে'নি। তোর মন অতো ছোট কেন? মাছ খাবি কিম্বা খাবি না—এই নিয়ে কি দুর্লভ মনুষ্য-জন্মটা কাটাবি? যা, ওসবের পারে চলে যা। ওসব কুসংস্কার। ওসবই মায়া। মায়া কি আর গাছে ফলে—না বই-কেতাবে লুকিয়ে থাকে? কুসংস্কারই মায়া জান্‌বি। তোরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিয়েছিস, ওই সব কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিবি কেন? তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কাছে প্রার্থনা কর্‌বি, তিনি সমস্ত সংস্কার দূর ক'রে দেবেন। কি বলিস?'

বন্ধু লজ্জায় মুখটি হেট ক'রে 'হ্যাঁ' সম্মতি জানালেন। আমরা আশ্বস্ত হলাম ও প্রফুল্ল মনে স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে নীচে এলাম। এ'রকম পাগলের মেলার তখন অন্ত ছিল না। আত্মভোলা স্বামিজী মহারাজকে নিয়ে তাঁর দৈত্য-দানবের এই ধরণের খেলা অনেকদিন অনেক রকম ভাবেই হয়েছে। আজ সে' সব কথাই মনের মধ্যে ওঠে, আর ভেসে ওঠে স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরলতা-মাখা অথচ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রসন্ন মূর্তি। আজকের দিনে ধ্যানের মতো সেই অতীত স্মৃতির রত্নগুলিকে বুকে নিয়ে মনে সান্ত্বনা পাই!

স্মৃতি : পাঁচ

স্বামী অভেদানন্দের সব-কিছু ছিল নিয়মানুবর্তিতার ভেতর গাঁথা, সকল কাজই তিনি করতেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো। দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ঐ নিয়মের ধারা মেনে তিনি চলতেন, এতটুকু ব্যতিক্রম হ'তে কোনদিন দেননি। অনিয়মের পূজক আমরা কিন্তু কত জল্পনা-কল্পনাই না করেছি যে, নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকার অর্থ ই আত্মস্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া। আমাদের এ'সিদ্ধান্ত জানিয়েছি কত সময় কতভাবে স্বামিজী মহারাজকে, তাদের উত্তরও পেয়েছি শিক্ষার কশাঘাতে।

একদিনের কথা, স্বামিজী মহারাজের জীবন-যাপনপ্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আমরা তুলনা ক'রে বস্‌লাম জড়যন্ত্রের সঙ্গে। কোন-কিছুকে দিবারাত্র ঘড়ির কাঁটার মতো মেনে চলা মানেই নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে নিয়মতান্ত্রিকতার হাতে বলি দেওয়া। আমাদের এই বিজ্ঞ মন্তব্য শুনে স্বামিজী মহারাজ একদিন হেসে বলেছিলেন : তোমাদের মতো পরাধীন জাতির পক্ষেই কেবল এ'কথা বলা সম্ভব। স্বাধীনতার গন্ধ অনেক দিন তোমরা ভুলে গেছ, তাই সময় ও নিয়ম মেনে চলাটা হ'ল তোমাদের কাছে পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল। বলিহারি যাই তোমাদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের'। তারপর বেদনার ভাব নিয়ে তিনি আবার বলেছিলেন : 'শুধু্‌ ব্যক্তিবিশেষ কেন, সমগ্র জাতির পক্ষে নিয়মানুবর্তিতাই বেঁচে থাকার লক্ষণ। মেরুদণ্ডহীন মৃতপ্রায় জাতিরাই কেবল নিয়ম ও শৃঙ্খলতাকে না মেনে যথেচ্ছচারিতা ও কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেয়। যে জাতি পৃথিবীতে বড়, সে চিরদিন

নিয়মানুবর্তিতারই সম্মান দিয়েছে। তোমরা আদর্শই হারিয়ে ফেলেছ, তাই এলোমেলো জীবনযাপন তোমাদের কাছে মনে হয় সাবলীল ও স্বচ্ছ। আসলে এটাই যে পরাধীনতা ও দাসত্বের মস্ত বড় একটা চিহ্ন তা' তোমরা এখনো বুঝতে পারনি। জীবনে নিষ্ঠা ও সংযম নিয়মানুবর্তিতা থেকেই আসে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে গেলে তার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়, তবেই গড়ে ওঠে সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবন; সংসারে চলার পথও হয় সুষ্ঠু, সচল ও অপ্রতিহত'।

তারপর আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন: 'তোমাদের ভেতর অনেকের নাকি ধারণা—সাধু-সন্ন্যাসী যখন, কোন-কিছুর অধীন হওয়ার অর্থই তখন মায়াতে আবদ্ধ হওয়া, সুতরাং মায়া ও বাধ্যবাধকতা যত বেশী এড়ানো যায় জীবনে—ততই ভাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত হয়। অনেকে কোন-কিছুর দাস হ'তে চায় না বটে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কুঁড়েমির কাছে আত্মসমর্পনের দাসখৎ লিখে দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এটা মনে রাখবে যে, নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে জীবনের গঠন কোনদিনই হয় না'।

'অনেকের আরো একটা ধারণা আছে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি যত বেশী হবে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অন্যমনস্কতা ততই বেড়ে যাবে। কিন্তু এ'ধারণা একেবারে ভুল। দৈনন্দিন জীবনে কোন-কিছু ভুলে যাওয়ার অর্থ হ'ল মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া। কাজে ও কর্মে ভুল হওয়া কোনদিনই উন্নতির লক্ষণ নয়, বরং তাতে অবনতির পথই সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও নিস্পৃহ ভাব জীবনে আদরণীয়, কিন্তু ভুলে যাওয়া বা অন্যমনস্কতা

স্নায়বিক বা মানসিক দুর্বলতার নামান্তর। অধ্যাত্মপথের যারা সত্যিকারের পথিক, তাঁদের বৈষয়িক সকল বিষয়ের ওপর যেমন আঁট থাকে, তেমনি ভগবানেও অটুট বিশ্বাস থাকে। মন থেকে অহংভাব মুছে ফেলা দরকার। অহংভাব, অহংজ্ঞান, অহংকার, স্বার্থপরতা সব একই কথা। স্বার্থপরতা মন থেকে গেলে তো সব আপদই দূর হ'য়ে গেল। জ্ঞানীরা স্বার্থগন্ধহীন পুরুষ।

আরো দু'জন নবাগত ভদ্রলোক তখন এসে বসলেন। স্বামিজী মহারাজের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, অন্যমনস্ক ভাবে তিনি আগেকার মতো বলতে লাগলেন: 'কিন্তু ওদেশে (পাশ্চাত্যে) কি পুরুষ, কি মেয়ে, কি ছেলে সকলেই যেন কর্মকুশলতা ও সংযমের এক একটি পরিপূর্ণ মূর্তি। নিয়মানুবর্তিতার ওপর তাদের কী নিষ্ঠা! দেখে জীবনে আনন্দ ও উৎসাহ হয়। আর তোমরা, তোমরা কেবল বসে বসে মাথায় বড় বড় মতলব আঁটছ, মুখে বড় বড় কথা, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। না আছে কিছুতে নিষ্ঠা, না আছে আত্মসংযম ও বিশ্বাস, আর না আছে জীবনে স্ফূর্তি ও উন্মাদনা। সারা দেশটা যেন তাই paralysed (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে। এখন থেকে সময়ের পূজো করতে শেখ। সময়ের পূজো করার অর্থ তোমাদের জীবনের মূল্য ও আদর্শের প্রতি সচেতন হওয়া। এক সেকেণ্ডের জন্যেও কখনো সময়ের অপব্যয় করবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহা-অনন্তের গর্ভে মিশে যাচ্ছে, একবার গেলে আর কখনো ফেরে না। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করো, কুঁড়েমির প্রশ্রয় দিও না। ক্ষণস্থায়ী জীবন, আজ আছে কাল নেই। জীবনের

প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাও, আনন্দ পাবে, শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে'। স্বামিজী মহারাজের তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলি শুধু সেদিনই যে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রেখাপাত করেছিল তা নয়, আজও জাগ্রত হ'য়ে আছে ও চিরদিনই তা' থাকবে।

স্বামী অভেদানন্দের নিজের জীবনও যে কত নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল ছিল তার কিছুটা পরিচয় দেবো এখন সংক্ষেপে। এক প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ ক'রে পরদিন প্রাতঃকাল এই চব্বিশ ঘণ্টা তিনি কি রকমভাবে সময় অতিবাহিত করতেন, তারই চাক্ষুষ চিত্র একটি অঙ্কিত করব ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জীর জন্য।

অতি প্রত্যূষে উঠে স্বামিজী মহারাজ তাঁর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতেন। প্রায় সকাল সাতটায় গড়গড়ায় তামাক দেওয়া হ'ত। তামাক খেতে খেতে তিনি বিচিত্র বিষয়ের বই পড়তেন বেলা প্রায় আটটা পর্যন্ত। তারপর হ'ত চা খাবার সময়। আগে থাকতে সাজিয়ে রাখা হ'ত তাঁর অফিস-ঘরের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি ঝেড়ে-মুছে। শোবার ঘরের পূর্বদিকের জানালার সামনে থাকত একটা চেয়ার ও টেবিল, সেই টেবিলের ওপর সাজানো থাকতো চায়ের সাজসরঞ্জাম: চায়ের কাপ, দুধ, চিনি, চামচ, তোয়ালে। তিনি নিজে ঢেলে নিয়ে চায়ে নিজের পছন্দ মতো দুধ ও চিনি মেশাতেন। কাফি বা কোকোও তিনি খেতেন কখনো কখনো চায়ের পরিবর্তে। টেবিল চেয়ারে খাওয়ার অভ্যাস করেছিলেন তিনি ওদেশে (পাশ্চাত্যে) থাকার সময়। তিনি বলতেন: এ'নিয়মটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। ধূলো-বালি উড়ে এসে পড়ার

ভয় থাকে কম। মুসলমানরা মেজেতে বসলেও মাদুরের ওপর পরিষ্কার কাপড় পেতে তারপর থালা রেখে খাওয়া দাওয়া করে। খৃষ্টানদের তো কথাই নেই। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই নিয়ম খুবই ভাল। তাছাড়া চেয়ার টেবিলে খাবার সময় শরীর সোজা থাকে, হজমের পক্ষে তা' অনুকূল।

সকালে ও সন্ধ্যায় চা-খাওয়ার রীতি ছিল একটু ভিন্ন রকমের। সকালে থাকত সামান্য ফল, দু'স্লাইস রুটি ও একটু মাখন। চা-খাবার সময়ে হ'ত নানা বিষয়ের আলোচনা, গল্প-গুজব ও হাসি-তামাসা। এই অভ্যাস কেবল স্বামিজী মহারাজের একারই ছিল না, তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সকলেরই ছিল। চা-খাবার সময় আলোচনা চলতো কোনদিন সামাজিক বিবর্তন ও আচার-বিচার নিয়ে, কোনদিন দর্শন, ইতিহাস, চারুশিল্প সম্বন্ধে, কোনদিন শুধু বিভিন্ন দেশের ধর্মের, কোনদিন নানান বিষয়ের প্রশ্নোত্তর নিয়ে, আবার কোনদিন বা কেবল হাসি-ঠাট্টা-তামাসাতেই সমস্ত সময়টা কেটে যেত। স্বামিজী মহারাজ সকল সময়ে ছিলেন যেন সদানন্দময় পুরুষ, তবে মাঝে মাঝে তাঁর ভেতর গাম্ভীর্যের বিকাশও দেখা যেত। বেলা পৌনে ন'টা বা ন'টার সময় অফিস-ঘরটিতে এসে তিনি বসতেন। তখনই দর্শনার্থীদের দেখা করবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। অফিস-ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র আগে থেকে নিখুঁতভাবে সাজানো থাকতো, এলোমেলো ভাব কোনদিনই তিনি পছন্দ করতেন না। সাজানো-গুছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলতার তিনি ছিলেন চিরদিন পক্ষপাতী।

অফিস-ঘরের মেঝেতে একটি সতরঞ্চি পাতা থাকতো, তার সামনে থাকতো স্বামিজী মহারাজের টেবিল ও চেয়ার। তিনি বসতেন দক্ষিণদিকে মুখ ক'রে ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের ঠিক মাঝামাঝি। উত্তর দিকে ছিল একটি দরজা, শোবার ঘর ও অফিস-ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রতো সেই দরজাটি। সেই দরজার ওপর টাঙানো ছিল একদিকে ধর্মসমন্বয়ের ছবি ও অপরদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা-পর্বতচূড়ার একটি রঙিন তৈলচিত্র। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল একটি বইয়ের ঘোরানো সেল্‌ফ, সাজানো থাকত তাতে বেশীর ভাগ ইংরাজী, বংলা, হিন্দী মাসিক পত্রিকা, কিছু বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত ও অন্যান্য বিষয়ের বই। স্বামিজী মহারাজের বসার জায়গার দু'দিকে ঠিক মাথার ওপরে ডানদিকে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বামদিকে শ্রীমার মাঝারি সাইজের বাঁধানো দু'টি ফটো। ঘরের দক্ষিণদিকে একটি দরজা, যেখান দিয়ে দর্শনার্থী ভক্তরা প্রবেশ করতেন। তার পাশে ও পূর্বদিকে ঠিক জানালার ধারে ছিল দু'টি আলমারী: দক্ষিণদিকের আলমারীতে ছিল সংস্কৃত ও ইংরাজী বই সাজানো, পূর্বদিকের আলমারীতে ছিল চন্দন কাঠের ও রূপার অনেকগুলি কাস্কেট্—যাদের ভেতর রাখা হয়েছিল কতকগুলি মানপত্র। আমেরিকা থেকে তিনি যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল ঐ মানপত্রগুলি দিয়ে। বইও ছিল কিছু সাজানো ঐ আলমারীর ভেতর। স্বামিজী মহারাজের শরীর যাবার দু'বছর আগে অসুখের সময় পাতা থাকতো বেতের হেলান দেওয়া একটি ইজি-চেয়ার পূর্বদিকে জানালার কাছে—যার ওপর তিনি অভ্যাগত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে দেখাশোনা করার জন্য বসতেন।

বেলা ন'টার সময় অফিস-ঘরে প্রবেশ করেই স্বামিজী মহারাজ তাঁর ঘোরানো চেয়ারটির ওপর বসতেন। সে' সময়ই পড়তেন চিঠিপত্রাদি—যা সাজানো থাকত তাঁর টেবিলের ওপর ও উত্তরাদি দিতেন সে'গুলির এক এক ক'রে। তারপর পড়তেন ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে। তারই মধ্যে আবার কথাবার্তা বলতেন ও আলাপ-আলোচনাদি করতেন লোকজন যাঁরা আসতেন তাঁদের সঙ্গে।

সে' সময়েই ছিল আবার আমাদের স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করার সময়। প্রণাম করার মধ্যে এতটুকুও গতানুগতিক ভাবের কিন্তু নিদর্শন ছিল না, ছিল প্রাণের আবেগ ও মনের একান্ত আকর্ষণ। তাঁর কাছ থেকে ফেরার পর হৃদয় ভরে উঠতো যেন এক নূতন উৎসাহে ও অপূর্ব শক্তির প্রেরণায়।

প্রণাম করার জন্য যখন উপস্থিত হতাম আমরা স্বামিজী মহারাজের অফিস-ঘরের সামনে, তখন তিনি বলতেন: 'এই যে এসো, ক্যামন আছ?' ইত্যাদি। কিম্বা হয়ত কাউকে বলতেন: 'কি গো, একেবারে ডুমুর ফুল হ'য়ে গেছ যে?' ডুমুর ফুল বলার অর্থ দু'একদিন কাজের গতিকে কেউ হয়তো স্বামিজী মহারাজের কাছে যেতে পারে নি—তাই। তাঁর জিজ্ঞাসা করার কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গী ছিল এতই স্নেহপূর্ণ ও আপন-করা যে, মনে হ'ত যেন তিনিই আমাদের পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব একাধারে! জিজ্ঞাসা করতেন মঠ ও সমিতির সকল রকম সংবাদ ও কাজের কথা: কোন্‌টা কতদূর হ'ল, কোন্ কাজ করতে হবে কিম্বা হবে না, কার পক্ষে কোন্‌টা করা ভাল বা ভাল নয়। সকল কথাই তিনি

জিজ্ঞাসা করতেন আমাদের তন্ন তন্ন ক'রে ও পরামর্শ দিতেন দরকার হ'লে। বইপত্রের ও ধর্ম সম্বন্ধে ছোটখাট আলোচনাও যে হ'ত না তা' নয়।

এ' রকম ক'রে সাড়ে এগারটা, কখনো কখনো বা বারটাও বেজে যেত। তারপরই তিনি উঠ্‌তেন নিজের বিশ্রাম-ঘরে যাবার জন্য। সেখানেও আবার কাজ আরম্ভ হ'ত: কোন জামা, গেঞ্জি বা কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, সূঁচ-সুতা নিয়ে সেলাই করতে বসে যেতেন। কিম্বা কাপড় কিনে এনে টুপি বা জামার ছাঁট নিজের হাতে কেটে সেলাই করতেন। কখনো কখনো বইও পড়তেন। এ'ভাবে কাজের আর তাঁর অন্ত ছিল না। অবিশ্রান্তভাবে অজস্র কাজ তিনি করতেন, ক্লান্তি বা বিরক্তি এতটুকু কোনদিন তাঁর মধ্যে আমরা দেখিনি। কাজ করার প্রসঙ্গ নিয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন: 'অনেকে বলে নাকি সময়ই পাইনি তা' কাজ করব কখন্‌। কিন্তু সময়ের তুমি দাস—না সময় তোমার দাস? নিয়মিত কাজ যে করে তার কাছে সময়ের কোনদিন অভাব হয় না। কুঁড়েমী করলে কেমন ক'রে আর সময় পাবে বলো? সংসারের কাজও করতে হবে, অফিসও যেতে হবে, ধর্মের আলোচনা ও অনুষ্ঠান যেখানে হবে সেখানে যোগ দিতে হবে, কোনটাই বাদ দিলে চলবে না। তবে ভাবের ঘরে চুরি করলে হবে না। কাজের সময় নিশ্চয়ই হবে—যদি তোমার ইচ্ছা থাকে কাজ করার। কোন-কিছুর জন্যে সময় পাওনি মানে তোমার ইচ্ছা নেই কাজ করার। Self-analysis (আত্মবিশ্লেষণ) করলে এটাই কিন্তু ধরা পড়ে।

তাঁর জন্য রান্না বরাবরই আলাদা ক'রে হ'ত। আমেরিকা

থেকে ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম দিনকতক তিনি সবার সঙ্গে একত্রে বসে খেতেন। কিন্তু সে খাওয়া তাঁর সহ্য হ'ল না বেশীদিন। অগত্যা আলাদা ক'রে রান্নার ব্যবস্থাই করা হয়েছিল তখন থেকে।

ছোটখাট কাজঃ চিঠিপত্র লেখা, খবরের কাগজ বা বই পড়া প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বেজে যেত প্রায় দেড়টা। তারপর তিনি দাড়ি কামাতে ও স্নান করতে উঠতেন। স্নান প্রভৃতি সারতে বাজত আড়াইটা। তারপর তিনি বসতেন খেতে। খেতে লাগত এক ঘণ্টারও বেশী। খাবার সময়ে চল্‌তো যত রকমের কথা ও আলোচনা তা' আগেই বলেছি। খাবার সামগ্রী থাকত খুব সামান্য। দিনের বেলা খেতেন তিনি ভাত আর রাত্রে রুটি। ভাত খেতেন ছোট একটি বাটির এক বাটি। দিনের বেলায় তরকারীর ভেতর ছিল যে কোন একটা সিদ্ধঃ আলু, পেঁপে বা বেগুন, বিন্, কোন একটা তিতো, কোনদিন বা মাছের ঝোল অথবা সামান্য একটু ডাল। আমরা আবার ছিলাম সব প্রসাদ পাবার দল। স্বামিজী মহারাজ সেটা ভাল ক'রেই জানতেন, তাই ছোট এক বাটি ভাতের ভেতর থেকেই প্রসাদ রাখতেন তিনি আমাদের জন্য। অবশ্য বেশী খাওয়ার পক্ষপাতী কোনদিনই তিনি ছিলেন না। ভাতের সঙ্গে দিনের বেলায় ফলও তিনি খেতেন কোন কোন দিন সামান্য ক'রে।

দিনের খাওয়া শেষ হ'তে বাজত প্রায় তিনটা। তারপর আধ ঘণ্টা—কি বড় জোর একঘণ্টা বিশ্রাম করতেন। তারপর উঠে তিনি মুখ ধুতেন। তখন আবার তামাক দেওয়া হ'ত। তিনি বসে হয়তো খবরের কাগজ—না হয় কোন একটা বই পড়তেন। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের

নূতন কোন বই বাজারে বার হ'লে তা' জোগাড় ক'রে পড়ার আগ্রহের তাঁর অন্ত ছিল না। সন্ধ্যা আটটার সময় আবার চা দেওয়া হ'ত, আর তার সঙ্গে থাকত দু তিনখানা বিস্কুট।

তারপর যেতেন আবার অফিস-ঘরে। তখনই যত নবাগত ও পরিচিত ভক্তরা স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা বা আলোচনা কর্তে আসতেন। একবার তিনি কথা কইতে আরম্ভ করলে জমাট হ'য়ে উঠত সারা ঘরের পরিবেশ। যেদিন যেমন প্রসঙ্গ উঠ্‌ত তাতেই তিনি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতেন। কখনো কখনো যে পরিশ্রান্ত হতেন না নানান কথায় বা আলোচনায় তাই বা কেমন ক'রে বলি। আমাদেরও মাঝে মাঝে তিনি বলতেন : 'লোকে কি আর সত্যিকার কিছু জানতে চায়? কর্ম-কোলাহলের মধ্যে থেকে মঠে এসেছে, দু'দণ্ড কোথা ভগবানের প্রসঙ্গ করবে তা' নয়, এখানে এসেও শুরু ক'রে দিলে সেই সংসারের কথা : চাকরীটা হয়েও হ'ল না, ছেলেটা এবারে পরীক্ষা দিয়েছে—আশীর্বাদ করুন যেন পাশ করে ; মেয়ের বিয়েটা কোনরকমে হ'য়ে গেছে, জামায়ের অসুখ করেছে বাবা, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে, তাই মনটা বড় খারাপ, অ-বাবুর সঙ্গে চেষ্টা করলাম আপোষে, কিন্তু শুনলেন না, শেষে হাইকোর্টে মামলা রুজু ক'রে দিলেন—ইত্যাদি নানান রকমের কথা। স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙা-স্বভাব আর ঢেঁকির ঘোচে না। সংসারের মানুষগুলোর অবস্থাও তাই। 'ধম্ম ধম্ম' মুখে করে বটে, কিন্তু ধর্মের কথা কি আর সত্যি সত্যি তারা শুন্‌তে চায়—না জান্‌তে চায়? কেবল আজে-বাজে কথা, আর তার মাঝখানে পড়ে আমার যে কি অসহায় অবস্থা হয়

তা' একবার ভেবে ছাখো দিখিনি ? মঠ-মন্দিরে লোক আসে ক্ষণিকের জন্মও শান্তি পাবে বলে, কিন্তু তা' কি আর হয় ? মঠে মন্দিরে এলেও সাংসারিক প্রসঙ্গের মধ্যেই তারা ডুবে থাকে, সুতরাং শান্তি আর পাবে কি ক'রে বলো।

রাত্রি প্রায় দশটা—কি সাড়ে দশটার সময় আবার উঠে যেতেন তিনি নিজের বিশ্রাম-ঘরে। তারপর হয় বই বা খবরের কাগজ—নয় দরকারী কোন চিঠিপত্র নিয়ে পড়তেন। এ'রকম ক'রে বেজে যেত প্রায় রাত্রি একটা—কি দেড়টা। সেবক হয়তো বলত: 'মহারাজ, রান্না হয়েছে'। স্বামিজী মহারাজের তখন চমক ভাঙ্‌ত। শশব্যস্তে তিনি বলতেন: 'ও, তাই নাকি? আচ্ছা আমি আস্‌ছি'।

হাত-মুখ ধোয়ার জন্ম তিনি কলঘরে যেতেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান গাইতেন হাত-মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঘড়িতে হয়তো বাজতো তখন তুটো, আবার কখনো কখনো আড়াইটাও। তারপর এসে বস্‌তেন চেয়ারে খাবার জন্ম। রাত্রে তিনি খেতেন রুটি। মাত্র আধপোয়া ময়দায় রুটি তৈরী করা হ'ত খুব ছোট ও পাতলা করে। রুটির সঙ্গে থাকত একটা তরকারী, কোন শাক-শব্‌জীর ষ্টু, একটু ডাল, সামান্ম ফল ও একটু স্যালাড। মিষ্টির কোন জ়িনিস তিনি খেতে পারতেন না কোনদিনই।

রাত্রে খাওয়া শেষ হ'ত প্রায় তিনটার সময়। কখনো কখনো তার আগেও তিনি রাত্রের খাওয়া শেষ করতেন। তারপর বসতেন তামাক খেতে। খাবার সময় নানান রকম বিষয়ের হ'ত আলাপ ও আলোচনা। তামাক খেতে বসেও তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প-গুজব ও আলাপ-আলোচনা

করতেন। কখনো কখনো গান করতেন গুরুগম্ভীর সুরে বসার চেয়ারের হাতলটার ওপর তাল দিতে দিতে। বেজে যেত প্রায় রাত্রি সাড়ে তিনটা। তারপর তিনি সকলকে বিদায় দিয়ে যেতেন শোবার জন্য।

আমরা ঘুম থেকে উঠতাম সকাল পাঁচটা—কি সাড়ে পাঁচটার সময়। এর আগেও যে উঠতেন না অনেকে তা নয়। কিন্তু প্রতিদিন উঠে শুনতে পেতাম স্বামিজী মহারাজের সেই উদাত্ত কণ্ঠের গান। একদিন বেশ মনে আছে তিনি গাইছেন: 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী। প্রসুপ্তা ভুজাগাকারা আধারপদ্মবাসিনী'—ইত্যাদি। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। তাল সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অসাধারণ। স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজানোর স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। স্বামিজী মহারাজের ঘুম-ভাঙ্গানো গুরুগম্ভীর সুর প্রতিদিনই ভেসে আসতো ভোরের বাতাসের সঙ্গে আমাদের কাণে; হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি করত এক অব্যক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা। স্মৃতি তাঁর উজ্জ্বল হ'য়ে আছে আজও পর্যন্ত আমাদের মানসপটে!

এই রকমই ছিল স্বামী অভেদানন্দের দিন-রাত্রির বুকে সমানভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রবাহ। এর ব্যতিক্রম হয়েছিল কেবল শেষের তু'বছর—শরীর তাঁর যখন অসুস্থ হয়। যখন তিনি দার্জিলিং আশ্রমেও (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিঙ) থাকতেন, তখনকার জীবনযাপন-প্রণালীও ছিল ঠিক এই একই রকমের। তবে স্থান ও জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য কিছু অদলবদল হ'ত তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মধারার ভেতর। শেষ-জীবনের তু'বছর

সকাল সাতটায় বেড়াতেন তিনি মঠের পেছনের মাঠটায়। তবে সে' বেড়ানোও ছিল বল্‌তে গেলে নামে মাত্র, কেননা যাকেই পেতেন তাঁর বেড়ানোর সময় সাম্‌নে—তাঁকে নিয়েই চলত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা : কোথায় কি নূতন বিষয়ের বই ছাপা হয়েছে তার কথা, নয় শ্রীঠাকুরের বা শ্রীমার জীবনের প্রসঙ্গ, নয়তো গতরাত্রের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত কোন জটিল দার্শনিক আলোচনার বিষয়। আধ ঘণ্টা—কি বড় জোর এক ঘণ্টা তিনি বেড়াতেন ধীরে ধীরে আলোচনার ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে। তারপরই উঠে যেতেন চা খাবার জন্য নিজের ঘরে। তারপর লোকজনের সঙ্গে করতেন আলাপ-আলোচনা। সকল সময়েই থাকত তাঁর হাসিভরা মুখ। বেলা এগারটা—কি সাড়ে এগারটায় খাবার পর আবার এসে বস্‌তেন তিনি অফিস-ঘরটিতে তাঁর আমেরিকায় দেওয়া বক্তৃতাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আলোচনা চলতো বেলা দেড়টা—কি হুটো পর্যন্ত। রাত্রেও চলত ঠিক এই ধরণের ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট পড়া বা আলোচনার কাজ। এইভাবেই কেটে গেছে তাঁর শেষের পুরো ছু'টি বছর। সে' সব দিনের স্মৃতিকথা এখনো আছে আমাদের মনে জাগরুক হ'য়ে!

প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় স্বামিজী মহারাজ যখন তাঁর অফিস-ঘরে বসতেন, তখনই কি নবাগত—কি মঠবাসী সকলের পক্ষেই ছিল দেখা করার সময় তা' আগেই বলেছি। প্রসঙ্গ চলতো যিনি যেমনটি চাইতেন, অথবা স্বামিজী মহারাজই আলোচনা করতেন যার যে'রকমটি দরকার সে'রকম। বিরাট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি স্বামিজী মহারাজের কোন নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না, তিনি

আলোচনা করতেন বিচিত্র রকমের বিষয় নিয়েই। যেমন, কেউ হয়তো বল্লেন : 'মহারাজ সংসারে বড়ই কষ্ট, শান্তি এতটুকুও নেই !' স্বামিজী মহারাজ অমনি আন্তরিকতা ও সমবেদনার সুরে বলতেন : 'হ্যাঁ সত্যিই বলেছ, সংসারে বড়ই কষ্ট। টাকা-পয়সার চিন্তা, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব, আজ এর জ্বর—কাল ওর সর্দি, অমুকের চাকুরী নেই—দারিদ্র্যের তাড়না ও অনটন, অমুকের বিয়ে দিতে হবে—এই নানান রকমের হাঙ্গামা। শান্তি ও সুরাহা যেন কোনদিকেই নেই, অশান্তির আগুনই চারদিকে জ্বলছে। ঠিকই বলেছ—সংসারে যেন দুঃখ আর কষ্ট, শান্তি ও আনন্দের লেশমাত্র নাই'। তখন ম্লান হ'য়ে গেছে যেন সংসারের অসারতার প্রশ্ন বিচারমূর্তি স্বামিজী মহারাজের কাছে, অফুরন্ত করুণায় ভরে উঠেছে তাঁর অন্তর, যুক্তি-তর্কের সকল প্রশ্ন হয়েছে নীরব, প্রেম, ভালবাসা ও বেদনার ভাবই ফুটে উঠেছে হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে।

শুধু তাই নয়, হয়তো সন্তানহারা হয়েছেন কোন বিধবা, স্বামিজী মহারাজকে লিখে জানালে সান্ত্বনা পাবার জন্য, স্বামিজী মহারাজও ব্যাকুল হৃদয়ে লিখে পাঠালেন তাকে : 'স্নেহের—, বড়ই কষ্ট পেয়েছি তোমার পত্রখানি পেয়ে। শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণেই কেবল প্রার্থনা জানাতে পারি তোমার জন্য, শান্তি ও সান্ত্বনা দেবার মালিক একমাত্র তিনিই। তুমি নিজেও তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে'। বৈদান্তিক জ্ঞানবাদী স্বামিজী মহারাজের নিরাসক্ত প্রাণ তখন কোমলতা ও স্নেহ-তরঙ্গে হ'ত উৎসারিত,

জ্ঞানের জমাট বরফ গলে প্রেমের স্বচ্ছ সলিলে হয়েছে পরিণত।

সাংসারিক লোকের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামিজী মহারাজ সময়ে সময়ে অধীর হ'য়ে পড়তেন, বেদনার ভাব ফুটে উঠত তাঁর মুখে, চক্ষুও ভরে উঠত জলে। যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করতেন তিনি মানুষের দুঃখ-যন্ত্রনার কথা, সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে।

বিপরীতভাবের বিকাশও আবার দেখেছি তার মধ্যে। যেমন, একজন হয়তো বল্লেন: 'মহারাজ জীবনটা বিড়ম্বনাময়, সংসারের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি, আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পাই'। স্বামিজী মহারাজ শুনে বলতেন: 'এখন আশীর্বাদ ক'রে আর কি ফল হবে বলো? দুঃখ তো সংসারে আছেই, কিন্তু বিচলিত হলে চলবে কেন? সংসার-সমুদ্রে যখন নৌকা ভাসিয়েছ তখন যেতেই হবে এগিয়ে, তবে কাপুরুষের মতো নয়, যুদ্ধবিজয়ী বীরের মতো। সেক্সপীয়ার বলেছেন: 'Cowards die many times before their death', কাপুরুষ মৃত্যুর আগেও অনেকবার মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়। ভয় মানেই মৃত্যু। উত্তাল সাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় পেলে চলবে কেন। সংসারের ভার যখন স্বেচ্ছায় বরণ ক'রেছ তখন কাজ ক'রে যেতে হবে—শুধুই কর্তব্য ভেবে নয়, প্রেম ও ভালবাসার ভাব নিয়ে, তবেই দুঃখ-কষ্টের সংসারে থেকেও শান্তি ও আনন্দ পাবে, দুর্বলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনে শক্তি ও সাহস পাবে। তারি জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা কর ভগবানের কাছে, তিনি প্রসন্ন হলে তবেই সংসারে ও জীবনে মুক্তি'।

আবার কখনো কখনো বা বলতেন: 'দুর্বলতাই মহাপাপ। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেমে আত্মীয়-স্বজনকে দেখে মোহগ্রস্ত হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দুর্বলতা এসে উপস্থিত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার ক'রে বল্লেন: 'যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে ভীত হয় কাপুরুষরা। অর্জুন, তুমি ভয় ও মোহ ত্যাগ ক'রে ক্ষত্রিয়ের যা কর্তব্য তাই কর, তাতে তোমার পুণ্য হবে'। তেমনি সংসারে নেমে যারা দুঃখ-কষ্ট ও নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে ভয় পায় তারা কাপুরুষ ছাড়া আর কি'।

'তা ছাড়া তোমাদের আরো একটা স্বভাব কি জানো, কোন একটা কাজে একবার অকৃতকার্য হ'লে জীবনে নিরাশ হ'য়ে পড়ে ভাবো যে তোমাদের দিয়ে আর কিছু হবে না। এটা কিন্তু ভারী খারাপ। একবার কোন-কিছুতে কৃতকার্য হ'লে না ব'লে যে বারবারই তাতে অকৃতকার্য হবে এমন কোন কথা নেই। উদ্যম ও পুরুষকারই জীবনের লক্ষণ। তোমরা যে মানুষ, তোমরা যে বেঁচে আছ তার প্রমাণ হচ্ছে তোমাদের ভেতর উদ্যম আছে, পুরুষকার আছে, 'ষ্ট্রাগল ফর এক্‌জিস্‌টেন্স' (জীবন-সংগ্রাম) আছে। জীবনে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও তেমনি আছে। জয়-পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাত—এ'সব নিয়েই তো মানুষের জীবন, এ'সব নিয়েই তো সংসার। জোয়ার থাকলে ভাঁটা থাকবে, উত্থান থাকলে পতন থাকবে; বাধা-বন্ধনহীন একটানা সরল স্বচ্ছন্দ জীবন পরিবর্তনশীল জগতে আর ক'জন পায়। হতাশার ভাব মনে আনবে না। শরীরে শক্তি, মনে সাহস ও উদ্যম সর্বদাই রাখতে চেষ্টা করবে। মনকে কখনো দুর্বল করো না। আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ই জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করার একমাত্র

উপায়। মনকে সর্বদা বলবে 'আমি পার্‌ব'; 'পারব না' এ'কথা স্বপ্নেও ভাব্‌বে না। এই রকম হ'লে সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্যতা লাভ করবে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস ক'রো'।

দয়া-ভিক্ষার অথবা নিশ্চেষ্ট জীবন নিয়ে কেবলই কৃপা পাবার কথা শুন্‌লে স্বামিজী মহারাজ অনেক সময় বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন: 'গুরুকৃপা, ভগবানের দয়া এ'সবে বিশ্বাস করা মোটেই খারাপ নয়, কিন্তু নিজে কিছুই করবো না, গুরু বা ভগবান সব ক'রে দেবেন—এ'রকম যারা ভাবে তারা দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন ছাড়া আর কি। এই যে কৃপার কথা বলা হয়েছে: 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্; যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে, পরমানন্দ-মাধবম্' এই মনোভাব বা স্বীকৃতি থেকে শিষ্যের বা ভক্তের নিরভিমান ও নিরহংকারের ভাব প্রকাশ পায় মাত্র। যথার্থ শিষ্য বা ভক্ত যে, ভগবানের কাছে সে শরণাগত থাকবে। শরণাগতি মানে এই নয় যে, কুড়েমি ক'রে বসে থাকব আর ভগবানকে বলব: হে ভগবান, তুমি আমায় কৃপা করো। এটা তো মহাদুর্বলতা ও স্বার্থপরতার চিহ্ন। অহংকার বিসর্জন দিয়ে নিরভিমান হওয়াই দরকার। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে কৃপা পাবার আশা করি, সে আশার ভেতর উদ্যম থাকে না, আত্মবিশ্বাস বা শরণাগতির ভাব থাকে না, থাকে কেবল নিশ্চেষ্টতা ও চালাকী ক'রে বাজীমাৎ করার মতলব। এ'সবে কি আর হয় বাপু? ভগবানের চোখে ধুলি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কৃপা আদায় করা বড় সহজ কাজ নয়। তিনি অতিশয় সুচতুর, পরমচৈতন্য-স্বরূপ। ত্রিভুবনের বুদ্ধিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সুতরাং কিছু করব না, ফাঁকি

দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দয়া বা কৃপা আদায় করব—এও কি কখনো হয়? প্রসন্নতা চাইলে কর্তৃত্বাভিমানহীন হ'তে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে সংসারে কর্ম ও সাধনা করতে হয়, তবেই তিনি কৃপা করেন—অবশ্য কৃপাবাদে যদি তুমি বিশ্বাস করো। নচেৎ একমাত্র বিবেক-বিচার, যথার্থ ভক্তি অথবা কর্তৃত্বাভিমানরহিত কর্ম দিয়েই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। চেষ্টা চাই, নিষ্ঠা চাই ও প্রবল বিশ্বাস চাই। negative (নেতিবাচক) ভাব মনে একেবারে স্থান দেবে না, সর্বদাই positive (ইতিবাচক) ভাব মনে আনবে। 'আমি পারব' বা 'আমার দ্বারা হবে' একথাই কেবল ভাববে, 'পারব না' এ'রকম ভাব কখনো মনে আনবে না। আশাই মানুষকে কৃতকার্যতার পথে এগিয়ে দেয়, নিরাশা জীবনে ধ্বংস ও অকৃতকার্যতা আনে।

স্বামী অভেদানন্দের ভাব ছিল ঠিক এ'রকমই। লোক ও প্রসঙ্গ হিসাবে তিনি গম্ভীরভাবে তিরস্কারও করতেন যেমন একদিকে, সমবেদনাও জানাতেন তেমনি অপরদিকে স্নেহপূর্ণ মূর্তি নিয়ে। কঠোরতা ও কোমলতা এ'দুয়ের মিলন ছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে।

আলোচনা হ'ত বিচিত্র বিষয়ের তা আগেই বলেছি। জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল পরিপূর্ণ, যে কেউ যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে, স্বচ্ছন্দে যোগ দিতেন তিনি সেই সব আলোচনায় অপূর্ব মনীষা ও প্রজ্ঞার উদার আলোক নিয়ে, আনন্দমুখর হ'য়ে উঠত সকল প্রসঙ্গ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। একজন হয়তো প্রশ্ন করলেঃ 'মহারাজ, আপনি পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশ ঘুরেছেন, কিন্তু কোন্ দেশের খাওয়া (আহার)

বেশ স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত দেখলেন?' প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী মহারাজ বলতেন পাশ্চাত্যেরই শুধু নয়, প্রাচ্যেরও নানান দেশের খাওয়ার রীতিনীতি, বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, জার্মাণী, ফ্রান্স, যুগোশ্লেভিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি ও ভারতবর্ষের বিচিত্র দেশের ও সিংহলের খাওয়ার রুচি ও রান্নার নিয়মপ্রণালী সব ভিন্ন ভিন্ন। তারপর কি কি তরকারী বা শাকসব্জী কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায়, কেমন ক'রে তাদের উৎপন্ন ও চাষ-আবাদ করতে হয়, কিভাবে তাদের রান্না করতে হয়, কোন্ কোন্ দেশের খাওয়া ভাল ও বিজ্ঞানসম্মত—সকল আলোচনা তিনি নিরলস ও অবিশ্রান্তভাবে করতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি। তাঁর অভিমত ছিল: ভারতীয়দের খাওয়ার জিনিস একটা যা হয় হলেই হ'ল, স্বাস্থ্যের দিকে মোটে লক্ষ্য নেই। কতকগুলো ঘি চর্বি, মাখন, তেল, গরমমশলা আর মিষ্টি খেলেই আমরা মনে করি বুঝি ভাল খাওয়া হ'ল। আমাদের রুচিকর খাবার জিনিসের মধ্যে লুচি, পরোটা, বেশী ক'রে মশলা দেওয়া মাছ আর মাংসের কালিয়া, পোলাও ও সন্দেশই প্রধান। তাও আবার এতটুকুতে হয় না, চাই সকল জিনিসই বেশী বেশী। আকণ্ঠ খাওয়া না হ'লে আবার খাওয়া আমাদের হয় না—অথচ এ'সবই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ওসব দেশে (পাশ্চাত্যে) রান্নার ও খাওয়ার প্রণালী বেশ সহজ সরল ও সুন্দর। তেল, ঘি ও মশলার ব্যবহার ওরা খুব কমই করে, অথচ খাবার জিনিস সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। তারা পরিমাণে কম, কিন্তু

বারে বেশী খায়। খাবার নির্বাচনও তাদের বৈজ্ঞানিক ও রুচিসঙ্গত'।

একজন হয়তো প্রশ্ন করলেঃ 'কেন মহারাজ, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালাদেশের খাওয়ার যত প্রকারের উপকরণ ও সাজসজ্জা আছে, তেমনটি বোধহয় আর কোন দেশে পাবেন না'। স্বামিজী মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দিতেনঃ 'হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্যি খুবই সত্যি বলেছ, কেননা এক বাঙ্গালাদেশের মাটিতে তৈরী হয় যত রকমের তরকারী ও শাকসবজী, তেমন আর কোন দেশে হয় না। তাছাড়া বাঙ্গালাদেশের তরকারী ও খাবারের মধ্যে সুক্তুনি, ছ্যাঁচ্ড়া, মাছের ঝোল, অম্বল, খিচুড়ী, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, জিলাপি— এ'সবের তুলনা কোথাও মেলে না। অবশ্য পোলাও, কালিয়া এ'সব আমদানী হয়েছিল বাইরে (বাঙ্গালার বাইরে) থেকে মুসলমানদের রাজত্বকালেই। বাঙ্গালীজাতি রান্না-বিষয়ে সত্যিই সুপটু। অনুকরণশক্তিও অসাধারণ। একমাত্র এদের মতো উর্বর মস্তিষ্কই সৃষ্টি করতে পারে হাজার রকমের তরকারী ও মিষ্টান্ন। অপরাপর কাজের মতো বাঙ্গালীদের রান্নার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের অভিমত যে বাগগুহা, অজন্তা প্রভৃতির শিল্পনৈপুণ্যের মূলে ছিল বাঙ্গালীজাতির মস্তিষ্ক। অবশ্য এর পেছনে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু তা' বলা মুস্কিল। তবে কি জানো, কতকগুলো ভাল রাধলে বা ভাল খেলেই তো আর মানুষের স্বাস্থ্যের ও দেশের উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীজাতি সকল বিষয়ে অগ্রণী। তীক্ষ্ণ ও বিচক্ষণ তার বুদ্ধি ও প্রতিভা, দেশসেবা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে দান তার অপরিসীম। কিন্তু তাহলেও এ'কথা সত্যি যে, বাঙ্গালী যদি রান্নার পেছনে

এতটা বুদ্ধির অপচয় না ক'রে অপরাপর বিষয়ের পরিপূর্ণতার দিকে মন দিত, তবে অগ্রগতির পথ হ'ত আরো সচল ও সাবলীল। সকল দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, পাঞ্জাবীদের রান্না ও খাওয়ার সাজসরঞ্জাম বরং সহজ ও সরল, শরীরও তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মনে স্ফূর্তি আছে, অদম্য কর্মপ্রেরণা ও সাহস—যদিও বাঙ্গালীদের মতো তারা এখনো মস্তিষ্ক লাভ করতে পারেনি'।

আর একজন হয়তো প্রশ্ন করলে একেবারে ভিন্ন রকমের। সে বল্লেঃ 'মহারাজ, ভগবান লাভ কেমন ক'রে হয়?' স্বামিজী মহারাজ একটু হেসে ও গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেনঃ 'নূতন ক'রে ভগবানকে কি আর লাভ করবে বলো? তিনি তো অন্তর্যামী-রূপে সর্বদাই সর্বত্র আছেন। তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, বুদ্ধির বুদ্ধি। প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি কাজ তাঁর কল্যাণ-ঈঙ্গিত ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যে হ'তে পারে না। তিনিই তো তোমার বুদ্ধি-রূপে ও আত্মা-রূপে হৃদয়গুহায় বাস করছেনঃ 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'। পৃথিবীতে তিলার্ধ স্থান পাবে না যেখানে তিনি নাইঃ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। তিনি সর্বত্রই আছেন; কাছেও বটে, আবার দূরেও বটে, অন্তরেও বটে—বাইরেও বটেঃ 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'। তুমি নিজেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু তা' জান্‌তে পারছ না অজ্ঞানের জন্যে। অজ্ঞান স্বার্থপরতার রূপ নিয়ে তোমার ভেতর বাঁসা বেঁধে রয়েছে, তোমার বিচার-বুদ্ধিকে ম্লান করেছে। যে মুহূর্তে স্বার্থপরতার অন্ধকার দূর হবে, সে মুহূর্তেই ভগবানের কল্যাণময় রূপ প্রত্যক্ষ করবে। তিনি তো সর্বদাই স্বপ্রকাশ; আত্মা-রূপে তোমার, আমার

ও জীব-জগৎ সকলের ভেতর আছেন। তাঁকে লাভ করার অর্থ হ'ল তিনি যে তোমা থেকে অভিন্ন এটা প্রাণে প্রাণে জানা বা অনুভব করা। এই জানার নামই অপরোক্ষজ্ঞান বা অনুভূতি'।

অপর একজন হয়তো প্রশ্ন করলেঃ 'মহারাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞানে প্রার্থক্য কি?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেনঃ 'ধর্মের সত্যিকারের 'ডেফিনিসন্' (অভিধান) কি তা' ভেবে উঠতে পারিনি। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এ'টুকুমাত্র বুঝেছি যে, ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। আত্মার উপলব্ধির নামই ধর্ম। ব্রত, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-উৎসব—এ'সব ধর্মের আনুসঙ্গিক বা সহায়ক, এরা আসলে ধর্ম নয়। তবে সাধারণের জন্যে এ'সবেরও দরকার আছে। জীব-জগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, অণু-পরমাণু এ'সব কেমন ক'রে হ'ল, এই জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ কি—এ'সকলের বাস্তব ও চাক্ষুষ জ্ঞানের সন্ধান যে অনুশীলনী বৃত্তি দেয়, তাকেই বিজ্ঞান বলে। পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণমূলক পার্থিব জ্ঞানই বিজ্ঞানের যন্ত্র। বিজ্ঞান অপার্থিব নিত্য বস্তুর সন্ধান দিতে পারে না, তাই বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা-সাধন এখনো পর্যন্ত হয় নি বুঝতে হবে। তবে অবিশ্রান্ত গতিতে সে চরমলক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে, তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর মিতালী হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একদিন-না-একদিন হবে। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক্ ঠিক একথাই তাঁর *Where is Science Going* বইয়ে বলেছেন'।

'ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হ'লঃ একটা আছে পথে অতৃপ্ত ও পিপাসু মন নিয়ে, আর অপরটা আত্মতৃপ্ত হ'য়ে; একটা পথ বা উপায়, আর অপরটা লক্ষ্য। ধর্ম ও বিজ্ঞান

তাই পরস্পরসাপেক্ষ, অথবা একটি অপরটির পরিপূরক। বৈজ্ঞানিকদের ভেতর অনেকে এখন কস্‌মিক এনার্জি (পরাশক্তি) বা গডের (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব মানতে আরম্ভ করেছেন। প্ল্যাঙ্ক্, জিন্স্, এডিংটন এঁরা এ'সব কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কথায় কথায় উঠ্‌তো হয়তো কখনো জ্যোতিষশাস্ত্রের (Astrology) কথা। স্বামিজী মহারাজ বলতেন: সায়েন্স (বিজ্ঞান) হিসাবে এ্যাসট্রোলজিকে (জ্যোতিষশাস্ত্র) মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি কেবল ঐ এ্যাস্‌ট্রোলজি (জ্যোতিষশাস্ত্র) অদৃষ্ট-গণনা ক'রে যা বলে তাকে অব্যর্থ ও জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে মেনে নেওয়ায়। আমিও এ্যাস্‌ট্রোলজি ভাল ক'রে পড়েছি, বক্তৃতা দিয়েছি কয়েকটা এর ওপর আমেরিকায় থাকতে,[১] কিন্তু তাহলেও যে শাস্ত্র মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা করে, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার ওপর একাধিপত্য বিস্তার করে, কিংবা বিবেক-বুদ্ধিজীবি মানুষকে দৈবের হাতের যন্ত্র-পুত্তলিকা ক'রে তোলে, তার সকল সত্যতা মেনে নিতে আমি রাজী নই—অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে। সংস্কারই মানুষের চরিত্র গঠন

[১] স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার মনীষীদের সামনে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ওপর যে কয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি হ'ল: (১) Solar Magnetic Science, (২) Planet and Planetary Influence, (৩) Helio-centric Science, (৪) Earth and its Relation to the Sun, প্রভৃতি। আমেরিকায় শিল্পীদের দিয়ে এসব' বক্তৃতার জন্য গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের বিচিত্র গতির নক্সাও (ডায়েগ্রাম) তিনি আঁকিয়েছিলেন। নক্সাগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। এ' বক্তৃতাগুলি এখনো ছাপা হয়নি। বক্তৃতা ও ছবির নক্সাগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে।

করে, সংস্কারের প্রেরণাই প্রবৃত্তির আকারে মানুষ ও জীবজন্তুকে পরিচালিত করে। এই সংস্কারকে ভাঙা ও গড়ার একমাত্র মালিকও মানুষ। মানুষ ভাল-মন্দ কর্ম দিয়ে তার সংস্কার বা অদৃষ্ট সৃষ্টি করে, আবার মানুষই কর্ম দিয়ে তার গতির পরিবর্তন করে। এক কথায় বলতে গেলে মানুষই নিজে তার অদৃষ্টের নিয়ন্তা ও কর্তা, ঈশ্বর বা সয়তানের স্থান সেখানে নেই। মানুষের ইচ্ছাই আসলে স্বাধীন, তাই সত্যিকারের ইচ্ছা করলে মানুষ নিজের চেষ্টায় তার কল্যাণের পথ প্রসারিত করতে পারে, আবার অকল্যাণের অভিশাপকেও ডেকে আন্‌তে পারে। মোটকথা এ্যাস্‌ট্রোলজি, পামিষ্ট্রী (হস্তরেখা-গণনা) কিম্বা সামুদ্রিক বিদ্যা মানুষের মনে এই ধারণা ও বিশ্বাস এনে দেয় যে, অদৃষ্টের লেখাই সব, দৈবের লিখন খণ্ডন করা মানুষের সাধ্য নয়। এতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টার ভাব নষ্ট হয়! দৈব বা অদৃষ্টের প্রভাব অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন মানুষদের ওপর বেশী দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক ও বিচারীরা বলেন অদৃষ্ট ও অলৌকিকী শক্তি দৃষ্টশক্তিরই সূক্ষ্ম অবস্থা। তবে এ'কথাও ঠিক যে, পৃথিবীর সকল জিনিস আবার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, ঈশ্বরের রাজত্বে কখনো বে-আইন বা অনিয়ম থাকতে পারে না। তাই যাকে আমরা 'অদৃষ্ট' বা 'অলৌকিক' বলি, তাও একটি সূক্ষ্ম নিয়মের (higher law) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথার্থ রহস্য জানি না বলেই কোন-কিছুকে আমরা অলৌকিক বা অদৃষ্ট বলি। শ্রীশ্রীঠাকুর লাল জবাফুলের গাছে লাল ও সাদা দু'টি জবাফুল দেখেছিলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণ মানুষ এতে বিস্মিত হয় ও ভাবে সমস্তই মায়ার ভেল্কী। কিন্তু আসলে

এ'কথা ঠিক যে, ঐ লাল জবাফুলের গাছে সাদা জবাফুল ফুটেছিল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে—যদিও সে নিয়মটি আমরা জানি না, আর জানি না বলেই তাকে বলি অলৌকিক। পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা অদৃষ্ট বা দৈব নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না, তাদের কাছে নিজেদের চেষ্টা বা পুরুষকারের মূল্যই বেশী। এ্যাস্‌ট্রোলজি ও পামিষ্ট্রিকে তারা মোটামুটি সায়েন্স (বিজ্ঞান) হিসাবে গণ্য করে বটে, কিন্তু এদেরকে ভাগ্যনিয়ন্তা ব'লে বিশ্বাস করে না। এদের নিয়ে যত মাতামাতি দেখি কেবল এই দেশেই (ভারতবর্ষে)। তাছাড়া ওদেশে (পাশ্চাত্যে) এ্যাসট্রোলজিকে লোকে পয়সা রোজগারের উপায় ব'লে গ্রহণ করে না।

পরিপূর্ণভাবে না হলেও যতটুকু আমরা দেখেছি তা' থেকে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জ্যোতিষ ও হস্তরেখাগণনাকে স্বামী অভেদানন্দ পরিপূর্ণ (perfect) বিদ্যা বা কার্যকরী বিজ্ঞান (এ্যপ্লায়েড সায়েন্স) ব'লে স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তিনি বলতেন: 'কর্মের দ্বারা হাতের রেখারও পরিবর্তন করা যায়। দৈব, কবচ, মাতুলি, জলপড়া, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক্ এ'সব নিয়ে যদি চব্বিশ ঘণ্টা মানুষ মেতে থাকে তবে সে আর ভগবচ্চিন্তা করবে কখন্। অনন্ত সম্ভাবনার বীজ মানুষের অবচেতন মনের সুপ্ত গহ্বরে লুকোনো আছে, অধ্যবসায় ও পুরুষকার থাকলে ইচ্ছার প্রেরণায় সে' বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ফলে-ফুলে সুশোভিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। আত্মবিশ্বাসই মানুষের যথার্থ কল্যাণ সাধন করে। তাছাড়া এ'কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, আত্মা সর্বশক্তিমান, সকল শক্তি সূক্ষ্ম-আকারে আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। তাই ইচ্ছা করলে আমরা

নিজেরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রন করতে পারি'।

তারপর আলোচনার ভেতর নানান কথার পর হয়তো উঠ্‌তো অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ। স্বামিজী মহারাজ সকল আলোচনায় যোগ দিতেন সমানভাবে। তিনি বলতেন: 'অদ্বৈতবাদ সব শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও সেই মত ছিল। বৈরাগ্য ও সকল ঐহিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা না এলে অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্‌ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। জ্ঞান বা বিচারপথ বড়ই কঠিন, তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ওপর দিয়ে চলা যেমন কঠিন। অদ্বৈতজ্ঞান কেবল মুখে বল্লে হয় না, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই। বিশ্বাসে ও ব্যবহারে পুরোদস্তুর দ্বৈতবাদী, পার্থিব জিনিসের ওপর ষোলআনা আসক্তি, আর দু'চার খানা বই পড়ে যদি মুখে বলো যে 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা', তবে তা' মহা-হিপোক্রেসির (কপটতার) পরিচায়ক নয় কি? মনে ভাবছ ও আচরণে করছ এক রকম, আর মুখে বলছ আর এক রকম—এ'রকমটি হ'লে চলবে না। অদ্বৈতানুভূতি হ'লে সত্যি-সত্যি মন ও মুখ এক হয়। তখন মনে যা ভাব্‌বে, বাইরে তাই আচরণ করবে। তখন জগৎকে পরিবর্তনশীল ও ব্রহ্মকে নিজের সত্তা থেকে অভিন্ন ও অপরিণামী পরমচৈতন্য ব'লে অনুভব করবে। এই অনুভব কিন্তু মনের নয়—প্রাণের। বোধে বোধস্বরূপ। তথাকথিত সংসারের সুখ-দুঃখজড়িত মানুষ তখনই ঠিক মায়াপাশমুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। এতটুকু মায়া-মমতা থাকতে একত্বানুভূতি হয় না। একত্বানুভূতির নামই ব্রহ্মজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানের নির্দেশক বিচারপ্রণালীকে 'অদ্বৈতবাদ' বলে। অদ্বৈতজ্ঞান শেষের কথা। অদ্বৈতানুভূতি

হ'লে মনুষ্য-জীবনের সকল রহস্যের চির-সমাধান হয়, তখন আর কিছুই বাকী থাকে না—'কিঞ্চিৎ নাবশিষ্যতে'। এই অনুভূতি মানুষ পার্থিব সংসারেই লাভ করতে পারে। একেই বলে জীবন্মুক্তি'।

স্বামী অভেদানন্দের জ্ঞান ও প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী তা' আগেই বলেছি। প্রাণীতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কলাবিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি সকল বিদ্যায়ই তাঁর অসাধারণ অধিকার ও অনুভূতি ছিল। তা'ছাড়া সমসাময়িক (কন্‌টেমপোরারি) চিন্তাধারা ও সকল রকম প্রসঙ্গের সঙ্গে তিনি নিজেকে সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রাখতেন।

তুলনামূলকভাবে সকল-কিছু পড়াশোনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, আর হাল্‌কা, অম্বল-চাকা বা পল্লবগ্রাহী পড়াশোনার চিরদিনই বিরোধী ছিলেন। অন্ততঃ যেকোন একটা বিষয়ে জ্ঞান থাকবে গভীরভাবে, আর বাকী সমস্ত জিনিসের অভিজ্ঞতা থাকবে কিছু কিছু—এই ছিল তাঁর অভিমত। তাঁর কথাই ছিল : 'something of everything and everything of something'। তা'ছাড়া ভারতের শাস্ত্র বা দর্শনই কেবল পড়ব ও জানব, অন্য কোন দেশের শাস্ত্র বা দর্শনের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ও পরিচয় রাখব না এ' ধরণের একোমুখী মনোবৃত্তিকে তিনি গোড়ামী ও সংকীর্ণতার নামান্তর বলতেন। সকল দেশের শাস্ত্র, অনুভূতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে নিজেদের দেশের সকল-কিছুকে মিলিয়ে (কম্‌প্যারেটিভ্‌লি) পড়লে তবেই মন ও মস্তিষ্কের প্রসার অক্ষুণ্ণ থাকে। তুলনামূলক অনুশীলন ছাড়া মানুষের পার্থিব জ্ঞান ও অনুভূতি কোনদিনই সম্পূর্ণ ও গভীর হয়

না—এ'কথাই স্বামিজী মহারাজ সকল সময় বলতেন। তাঁর নিজের জীবনও গঠিত ছিল এই পরিপূর্ণ অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশকে নিয়ে, তাই সংসারের সাধারণ খুঁটিনাটি কিংবা সর্বসাধারণের সঙ্গে সকল সময়ে নিজেকে লিপ্ত রাখলেও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত অথচ সহানুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানদীপ্ত মানুষ।

॥ স্মৃতি ঃ ছয় ॥

আমরা তখন দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। ইংরেজী ১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাস হবে। ঘন কুয়াসায় সারা দার্জিলিঙ সহর ঢাকা। সূর্যের সাধ্যও নাই .য কোন রকমে একবার উঁকি মার্‌তে পারে। সকাল সাড়ে আটটা—কি ন'টা হবে। স্বামিজী মহারাজ তাঁর অফিস-ঘরের চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছেন। অফিস-ঘরটি তাঁর থাকার ঘরের সাম্‌নের দিকে, ছোটখাট অথচ দেখতে বেশ সুন্দর। সেই ঘরের পশ্চিম দিকের কোণে রাখা ছিল একটি বেতের চেয়ার। সাম্‌নে একটি ছোট টেবিল, তার ওপর একটি ফুলের ভাস্‌। প্রতিদিন সকালে টাটকা ডালিয়া প্রভৃতি ফুল তুলে তাতে সাজিয়ে রাখা হ'ত ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বেলে দেওয়া হ'ত কয়েকটা ধূপকাটি। ধূপের গন্ধে সারা অফিস-ঘর ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌ত। ঘরের হু'দিকে আরো কতকগুলি বেতের চেয়ার সাজানো থাকতো অভ্যাগত লোক ও ভক্তদের বসার জন্য। নীচে পাতা থাকত একটি কার্পেট। ঘরটির চারদিকে কাঠের দেওয়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দার্জিলিঙ ও আরো কয়েকটি ভাল ভাল দৃশ্যের ছবি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার ফটো টাঙানো। জানালাগুলিতে কাচের সার্সি দেওয়া, জলভরা ঘন কুয়াসা অথবা বৃষ্টি এলে সার্সিগুলি বন্ধ ক'রে দিলেও বাইরের দৃশ্য ও সব চেয়ে উত্তর-দিকের সার্সি দিয়ে গগনচুম্বী কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্ময়বিপুল অথচ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যেত—অবশ্য আকাশ যদি মেঘশূন্য বা কুয়াসামুক্ত থাক্‌তো। অফিস-ঘরের বাইরে দরজার হু'দিকে কাঠের টবে ছিল অর্কিড, গোলাপ ও নানান রকম

ফুলের গাছ। ফুল ফুটে থাক্‌তো প্রায় সকল সময়ই। তবে ঠাণ্ডার জন্য ফুলের গন্ধ বিশেষ পাওয়া যেত না। দরজার সামনে ছিল খানিকটা উঠান। সিমেণ্ট দিয়ে তা' বাঁধানো ছিল ও তার সামনে ও আশেপাশে ছিল হরেক রকম ফুলের গাছ, তাতে ফুল ফুটে চারদিক আলো ক'রে থাক্‌ত। অবশ্য এ'সবেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল পরে।

সকাল সাড়ে আটটা—কি ন'টার সময় সেখানেও ছিল আমাদের স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করার সময়। তাই অফিস-ঘরের ডান পাশ দিয়ে আশ্রমবাসীদের থাকার জায়গা থেকে ওপরে যে সিঁড়ি উঠেছে সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে একদিন উঠ্‌ছি আমরা দু' তিন জন মিলে। সিঁড়িটা ছিল সিমেণ্টের তৈরী। তার দু'পাশে লোহার রেলিঙ্‌ ও সারি সারি নানান রকম ফুলের গাছ সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমাদের হঠাৎ নজরে পড়লো বামদিকের ঘরের জানালার দিকে। জানালাটা ছিল খোলা। দেখলাম আমাদেরি একজন তামাক খাচ্ছিলেন খোস মেজাজে অথচ গম্ভীরভাবে তাঁর বিছানার ওপর বসে। তামাক খাওয়াটা যদিও ছিল না একেবারে বিচিত্র রকমের, তাহলেও দৃশ্যটা ছিল বেশ হাস্যকর ও কিছুটা কৌতুকজনক। বন্ধু আমাদের বসেছিলেন যেন ধ্যানমৌন মহাদেব, এলোমেলো লেপ ও কম্বলের স্তূপ রচনা করেছিল অভ্রভেদী হিমালয়, বাঘছালের পরিবর্তে পরণে ছিল গেরুয়া কাপড় ও গায়ে কয়েকটা মোটা মোটা ধোঁয়াটে রঙের গরম জামা ও মাথায় গেরুয়া টুপি। সারা ঘরটি ভরে উঠেছিল তামাকের ধোঁয়ায়, আর বাইরের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়েছিল নিবিড় কুয়াসায়। সবার চাইতে দর্শনীয় বস্তু হয়েছিল তাঁর

ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গীটা। চলন্ত রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ধূম্রকুণ্ডলীও হার মেনেছিল বন্ধুর মুখের একপাশ দিয়ে নির্গত তাম্রকূট-ধোঁয়ার কাছে। তাই বিস্মিত হয়েছিলাম যেমন একদিকে, হাসিও পেয়েছিল তেমনি অপরদিকে। পেছনের দরজা দিয়ে ক্রমশঃ এসে দাঁড়ালাম আমরা স্বামিজী মহারাজের সামনে ও একে একে প্রণাম ক'রে বসলাম পাশের চেয়ারে। চাপাহাসি তখনো আমাদের মুখে। স্বামিজী মহারাজ দেখে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'কিগো, ব্যাপারটা কি হয়েছে বলো দেখি?' আমরা আরো হেসে বল্লামঃ 'মহারাজ, ঘরে আগুন লেগেছে'। স্বামিজী মহারাজ একটু শশব্যস্ত ও সচকিত হ'য়ে বল্লেনঃ 'সেকি? কোথায় লাগলো?' আমরা বল্লামঃ 'না অগুন লাগেনি বটে, তবে দার্জিলিঙ মেলের একটা ইঞ্জিন চলেছে প্রবল বেগে নীচের ঘর দিয়ে, ধোঁয়া ছুটেছে এঁকেবেঁকে সাপের মতো, আকাশ বাতাস ও সারা দাজিলিঙ সহর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে'।

স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকলেন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে—ছোট্ট শিশুরা যেমন নীরব ও নির্বাক হ'য়ে থাকে অঘটন-কিছু একটা ঘট্‌তে দেখলে। তাঁর সেই অবস্থা দেখে অবশেষে সত্য ঘটনার সকল-কিছুই খুলে বল্লাম। তিনি শুনে হো হো ক'রে হেসে বল্লেনঃ 'ওঃ, তাই বলো, আমি মনে করেছিলাম বুঝি সত্যি সত্যিই কোথাও আগুন লেগেছে। আগুন লাগায় আর বিচিত্র কি বলো। যা সব ছেলেরা অসাবধানী'। তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেনঃ 'তা ও আর কি শিখ্‌বে, আমার কাছ থেকে ঐ আদর্শটাই শিখেছে

যে কেমন ক'রে হুকা থেকে ধোঁয়া ছাড়তে হয়। ধোঁয়া ছাড়া ভিন্ন আর কি ভাল গুণ আমার আছে বলো!'

স্বামিজী মহারাজকে যেন একটু বিষণ্ণ দেখ্‌লাম। তাঁকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে বেশ গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'ছ্যাখো, আমি তোমাদের অনেকবারই বলেছি, তোমাদের আদর্শ হবে চেয়ারে বসা অভেদানন্দ নয়। যে অভেদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাবার পর কালী-তপস্বীর বেশে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত খালি পায়ে ও একটি কৌপীন মাত্র সম্বল ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছিল, সেই হবে তোমাদের জীবনের আদর্শ। কঠোরতা ছাড়া জীবন তৈরী হয় না। জীবনে ত্যাগই আসল। ঠিক ঠিক যাঁরা ত্যাগী তাঁরাই আবার ভোগ করতে জানেন। ত্যাগময় জীবন না হ'লে ভোগ হয় রোগের কারণ। তখন স্বার্থ আর স্বার্থ!'

আমরা নির্বাক হ'য়ে শুনছি। বলার বা জিজ্ঞাসা করার তখন কিছুই ছিল না, শোনারই কেবল আগ্রহ ছিল। স্বামিজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত ও রক্তিম। তিনি একটু আনমনা হ'য়ে বললেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের) শরীর গেল, স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সবাই বেরিয়ে পড়্‌ল যে যার দিকে। আমিও তাই করলাম। কত দেশ আমরা ঘুরেছি। সকলেই স্বাধীনভাবে, কেউ কারু সঙ্গে নয়। এক এক দিকে মুখ ক'রে চলেছি, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, সম্বলমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম আর মনের অদম্য উৎসাহ ও শক্তি'।

'এলাহাবাদে ঝুঁসির কথাই তোমাদের বলি। ঝুঁসিতে আমি

অনেকদিন ঝুপির ভেতর ছিলাম। তার আগে কাশীতে ছিলাম অনেকদিন, কষ্টও পেয়েছিলাম অসুখে। সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) আমার খুব সেবা করেছিল। ঝুঁসি ঠিক গঙ্গার ধারে। সামনে এলাহাবাদের ফোর্ট। ধ্যান করতাম ঝুপির ভেতর বসে। সদানন্দ আমার সঙ্গেই ছিল। সে' সময় আমি তাকে 'বিচারসাগর' পড়াই। বিচারসাগরের পঠন-পাঠনের চল বাঙ্গালাদেশে নাই বল্লে চলে। পাঞ্জাব-অঞ্চলে মেয়েরাও এই বই নিয়ে আলোচনা করে। তখন আমাদের আহার জোটে তো জুটল, না জোটে উপবাস এই ছিল ভাব। কত দিন কত রাত্র ঠিক এইভাবে কেটে যেত কিছুই হুঁস্ থাকত না। বেহুঁস হ'য়ে ধ্যান করতাম, ফোর্টের ঘণ্টাও কাণে প্রবেশ করত না। একদিন ঠিক করলাম যে, অজগরবৃত্তি অবলম্বন করব। অজগরবৃত্তি হ'ল নিজে কিছুই চেষ্টা করব না, বিনা চেষ্টায় খাবার জোটে ভাল, নইলে উপবাস। সে'দিন আবার বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্য গুহায় একজন নানকপন্থী সাধু ছিল। সে আমায় অত্যন্ত যত্ন করত। ভিক্ষা করার জন্যে সে আমায় অনুরোধ করলে। আমি বল্লাম আজ অজগরবৃত্তি নিয়েছি, ভিক্ষা করব না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা ছ্যাখো। বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। সদানন্দেরও সে'দিকে খেয়াল ছিল না। সে গঙ্গার ধারে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছিল। এমন সময় দেখা গেল আমাদেরি চির-পরিচিত বরাহনগরের পুরাতন বন্ধু মৈত্র মশায় এসে হাজির। তাঁর হাতে এক ঝুড়ি মিষ্টি। সদানন্দ দূর থেকে দেখে দৌড়ে এলো। আমিও দেখে অবাক। মৈত্র মশাই বল্লেন: আমি তোমাদের জন্যে তাড়াতাড়ি আসছি এই

মিষ্টিগুলো নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণার কথা ভেবে আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠল, ভাবলাম গীতার সেই কথা: 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্',—ভগবান ভক্তের ভার নিজেই বহন করেন। মৈত্র মশায় গিয়েছিলেন প্রয়াগে, সেখানে শুনেছিলেন কার কাছ থেকে যে, কালী-তপস্বী থাকে ঝুঁসিতে। তাই মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে ছাখা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায়ই মৈত্র মশায় এসে হাজির হয়েছিলেন একেবারে আমার অজগরবৃত্তির দিনই। ভগবানের কার্যকলাপ মানুষ আর কতটুকু বোঝে বলো!'

স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'সাধু, ব্রহ্মচারী, মুমুক্ষু ভক্ত—সকলের আদর্শ এ'রকমই হওয়া উচিত। তপস্যাময় হবে জীবন, ভগবানের জন্যে পাগলকরা টান থাকবে মনে, তবেই তো। ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কি অনুরাগ ছিল শুনেছ তো? শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে ছিলেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথা এক মুহূর্তের জন্যে তারা সহ্য করতে পারত না। ভগবানের জন্যে প্রাণ যখন সত্যিকারের আকুলি-বিকুলি করবে তখনই জানবে তোমাদের মনে অনুরাগ জেগেছে, আর তখনই ঠিক ঠিক পার্থিব সুখ-সম্পদের ওপর বিতৃষ্ণা আসে ও যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হয়। সাধক বা ভক্ত ম্যাদাটে হবে কেন? তার মনে সর্বদাই এই রোক থাকবে যে, এ' জীবনেই ভগবান লাভ করব—'সংকল্প সাধন কিংবা শরীর পতন'। শুধু লোকত্থাখানো ভক্তি ও আচরণ দিয়ে কোনদিন কিছু হয় না। শুধু কর্ম-জগতে কেন, সাধন-জগতেও হাত পা ছেড়ে লাফিয়ে পড় 'উইথ্ টু সিন্‌সিয়ারিটি' (যথার্থ মন-মুখ এক ক'রে), তবেই না'।

'কেবল হুঁকোর ধোঁয়াকে সোজা ক'রে ছাড়ব—কি বাঁকা ক'রে ছাড়ব—এই করলে তো আর ভগবান লাভ হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগময় জ্বলন্ত আদর্শকে জীবনে মূর্তিমান ক'রে তুলতে হবে। এর জন্যে চাই বুদ্ধদেবের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞা: 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,' অথবা রামপ্রসাদের মতো অচলা ভক্তি। সাধক রসিকচন্দ্র জগন্মাতাকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন: 'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'। সাধন-জীবনে এ'রকম রোক চাই, তেজস্বিতা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে শরণাগতির ভাব চাই। শুধু বীরভাব থাকলে অহংকার মাথা তুলতে পারে, তাই ভগবানের কাছে ভক্তের শরণাগতির ভাব চাই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখনা, ভবতারিণী দেখা দিলেন না ব'লে তাঁর কি কাতরতা! বলেছিলেন: মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দিলি না? এই রকম ব্যাকুলতা চাই, তবে তো সিদ্ধি'।

কথাগুলি বলতে বলতে স্বামিজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। সমস্ত শরীর স্তব্ধ, চক্ষু স্তিমিত ও শান্ত, গড়গড়ার নল মুখেই লেগে থাকল। মনে হ'ল যেন ধূলিময় পৃথিবীর রাজ্য ছেড়ে সুদূর কোন এক অজানা দেশে তিনি বিচরণ করছিলেন। দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল। যতদূর মনে আছে—দশ কি পনের মিনিটকাল ঠিক এ'ভাবে কেটে গেল। তারপর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগলেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। সে' ভালবাসায় যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল তা' আর আমি মুখে কেমন ক'রে বোঝাব তোমাদের। তাঁর কাছে গেলে মনে

হ'ত তিনিই আমাদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন —সব। সে' ভালবাসার কি আর তুলনা আছে! আমাদেরও এমন হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে ভাললাগত না'।

সেবক তামাক দিয়ে গেল। স্বামিজী মহারাজ আস্তে আস্তে তামাক টানতে টানতে হেসে বললেন: 'তবে হ্যাঁ, একবার কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, আর সেই ছাড়াছাড়ি থেকে আমি বুঝেছিলাম তিনি আমায় কত ভালবাসেন'।

আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কখন্ সে' ছাড়াছাড়ি হয়েছিল মহারাজ?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'ঐ যে, যখন আমি বরাবর-পাহাড়ে গিয়েছিলাম একজন হটযোগীর সন্ধানে। ছেলেবেলা থেকে আমার মনে যোগশিক্ষা করার তীব্র বাসনা ছিল। কলেজ ষ্ট্রীটে এলবার্ট হলে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মুখে প্রথম পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাখ্যা শুনি। সে' বক্তৃতাই বলতে গেলে আমার মনে যোগাভ্যাস করার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে পাতঞ্জলদর্শনের একখানা বই কিনেছিলাম। সংস্কৃতের ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পাতঞ্জলদর্শন ভাল ক'রে পড়ার জন্যে একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে হাজিরও হয়েছিলাম'।

অধৈর্যের দল আমরা অস্থির হ'য়ে পড়েছিলাম স্বামিজী মহারাজের মুখ থেকে সেই বরাবর-পাহাড়ে হঠযোগীর কাছে যাওয়ার ঘটনাটি শোনার জন্য। তিনিও আমাদের আর প্রশ্ন করার অবসর দেননি। গায়ের গরম কাপড়টি আরো একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে তিনি বল্লেন: 'যোগশিক্ষা

করার নেশা তখনও আমার কাটেনি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখে হঠযোগীর কথা শুনে ঠিক ক'রে ফেল্লাম যে বরাবর-পাহাড়ে (গয়ার কাছে) আমি যাব। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম একদিন কাকেও কিছু না ব'লে। রেলভাড়ার পয়সা কোন রকমে জোগাড় ক'রে কাশীপুর থেকে গঙ্গা পার হলাম। বালি-ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়ে গয়ায় পৌছালাম তার পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটা—কি আটটায়। ষ্টেশন থেকে প্রায় চার ক্রোশ পায়ে হেঁটে হাজির হলাম একেবারে বরাবর-পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের তলায় ছিল ছোট ছোট গ্রাম। দুনিয়ার কর্ম-কোলাহল থেকে তারা ছিল একেবারে দূরে, সরল স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনই ছিল যেন তাদের কাম্য। গ্রামের লোকদের কাছ থেকে হটযোগীর গুহার খবর জেনে নিয়ে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের ওপর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে। চারদিকে জঙ্গল, আর জায়গায় জায়গায় ছিল কাঁটাগাছের ছোট ছোট ঝোপ। অনেকক্ষণ চলার পর দূরে দেখতে পেলাম একটা গুহার সামনে বসে আছেন একজন সাধু। তার সম্মুখে জ্বলছে একটা ধুনি, আর চারদিকে তাঁকে ঘিরে আছে দু'তিন জন লোক। লোকগুলির পরণে ছিল সাদা কাপড়, সাধুজীর শিষ্য বোলেই মনে হলো। সাধুর চেহারাটা ছিল অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, ভীষণ রুক্ষখুক্ক। দেখেই প্রাণ গেল শুকিয়ে। ভাবলাম উনিই হবেন হটযোগী —যাঁর কথা বলেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমায় যেতে দেখে সাধুর শিষ্যগুলো পাথর ছুঁড়ে মারবার উপক্রম করলে। আমি কিন্তু ভ্রুক্ষেপ না ক'রে চলতে লাগলাম ও চলতে চলতে হাজির হলাম একেবারে তাদের সামনে। কাছে গিয়েই 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ব'লে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম।

আমার পরণে ছিল গেরুয়া ও হাতে কমণ্ডলু, ভাবলে সন্ন্যাসী, সুতরাং বেঁচে গেলাম সে যাত্রায় কোন রকমে'।

'পাহাড়ের ওপর আশ্রমটা মন্দ ছিল না। বেশ নির্জন, কাছে লোকালয়ের নামগন্ধ নেই। কিন্তু কি জানি কেন আমার পরিবেশটা মোটেই ভাললাগছিল না। সাধুকে দেখে মনে হ'ল অঘোরপন্থী। অঘোরপন্থীরা তান্ত্রিকদের আলাদা একটা ক্লাশ (শ্রেণী)। তারাও যোগসাধনা করে। তাদের আচার-ব্যবহার সাধারণের চোখে অত্যন্ত কদর্য মনে হয়। মড়ার আধপোড়া মাংস মাথার খুলিতে ক'রে তারা খায়। বিশেষ ক'রে মরা মানুষের মাথার ঘি তাদের অত্যন্ত প্রিয়। কচি ছেলের মাংসও তারা কখনো কখনো খায়। কাপালিকরাও এদেরই ভিন্ন একটা ক্লাশ (শ্রেণী)। কাপালিকদের চেহারা অত্যন্ত ভীষণ। আচার-ব্যবহার আরো ভয়ঙ্কর। মা কালীর সামনে তারা মানুষকে বলি দেয় ও মাথাহীন কবন্ধ শরীরের ওপর বসে গভীর রাত্রে সাধনা করে। তন্ত্রে শব-সাধনার কথা আছে, কিন্তু এই সাধনা কাপালিকদের মতো নয়'।

সাধুজীর শিষ্যদের দেখে আমি কিন্তু হতাশ হলাম। দেখলাম তাঁর একটি শিষ্যের আবার ভীষণ হাঁপানি হয়েছে। শিষ্যদের দেখে গুরুর অবস্থা খানিকটা অনুমান করা গেল। হঠযোগী সাধুর ওপর আমার শ্রদ্ধার ভাব কমে এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তে লাগল শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর অহেতুকী ভালবাসার কথা। কী তীব্র একটা আকর্ষণের ভাব আমার হৃদয়ে যেন অনবরত তখন অনুভূত হ'তে লাগল। ভেসে উঠলো চোখের সামনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই স্নেহপূর্ণ মুখখানি। সে' জায়গা থেকে পালানোই তখন শ্রেয় মনে

করলাম। কিন্তু পালাব কেমন ক'রে সে' চিন্তাই আমাকে অস্থির ক'রে তুল্লো। শেষে মতলব করলাম—জল আনার অছিলা ক'রে মার্‌ব চোঁচা দৌড়। করলামও তাই। হঠযোগীর কাছে কমণ্ডলু ক'রে জল আনার অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে ও কিছুদূর গিয়েই প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। চারদিকে কাঁটাগাছের ঝোপ, পা রক্তাক্ত হ'য়ে গেল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামই একমাত্র সম্বল। কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে দৌড়ুতে লাগলাম সোজা—যে পথ ধরে এসেছিলাম গয়া-ষ্টেশন থেকে। সাধুজীর চেলারা পাথর ছুড়তে আরম্ভ করেছিল আমায় দৌড়ে পালাতে দেখে। আমারও তখন প্রাণের ভয়, দৌড়ুতে লাগলাম প্রাণপনে। অবশেষে হাজির হলাম গ্রামের একটা ধর্মশালায়। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ধর্মশালায় রাত্রিটা কাটালাম। অধিক রাত্রি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তাই কেবল মনে হ'তে লাগল। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, আর ঘন অন্ধকার। রাত্রিটা কাটলো কতক জেগে, কতক ঘুমিয়ে। ভোর হ'তে না হ'তে চলতে লাগলাম গয়া-ষ্টেশনের দিকে। অবশেষে ষ্টেশনে এসে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গাড়ি হাজির হ'ল তার কিছুক্ষণ পরে। টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসলাম। সারা রাস্তাটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই কেবল মনে হচ্ছিল, আর আকুলি-বিকুলি করছিল প্রাণটা তাঁকে দেখার জন্য। তার পরদিন প্রায় ভোরের দিকে গাড়ী এসে থামল বালি-ষ্টেশনে। গাড়ী থেকে নেমে গঙ্গা পার হ'য়ে একেবারে ধূলোপায়ে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে গিয়ে হাজির হলাম। দু'চোখ তখন জলে ভরে এসেছিল। প্রণাম করলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মাথাটি রেখে'।

'শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ছিলেন তাঁর ঘরের ছোট তক্তাপোষটির ওপর বসে। আমায় দেখেই আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্লেন: কিরে, এ্যাদ্দিন আমায় না ব'লে কোথায় ছিলি বল্? আদ্যোপান্ত তাঁকে খুলে বল্লাম। তিনি শুনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। স্নেহের চক্ষে তাকিয়ে মাথা নাড়্তে নাড়্তে জিজ্ঞাসা করলেন: তা—হঠযোগীকে ক্যামন দেখলি বল্ দিকিনি? লাগলো ভাল তো? আমি মাথা হেট ক'রে বললাম: মোটেই ভাললাগেনি। শুনে তিনি অত্যন্ত খুসি হলেন। তারপর গম্ভীর অথচ ইষৎ হেসে বল্লেন: হ্যাঁ, ভাললাগবে কেন বল্? বড় বড় সাধু আর সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, সব্বাইকে তো আমি জানি। চার খুঁট ঘুরে আয়, (নিজের বুকে হাত দিয়া) এখানে যা দেখছিস্, এমনটি আর কোথাও পাবিনি। এই ব'লে প্রাণখুলে তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। প্রাণের সমস্ত অশান্তি ও গ্লানি যেন নিমিষ মধ্যে দূর হ'য়ে গেল। তারপর সস্নেহে বল্লেন: ছ্যাখ্, অকুল সমুদ্রে পড়ে মাস্তলের পাখী যেমন চারদিক ঘুরে পরিশ্রান্ত হ'য়ে শেষে মাস্তলে এসে বসে,[১] তেমনি চারখুঁট না ঘুরে দেখলে কি আর এখানকার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কদর কেউ বুঝতে পারে? তা' ভালই করেছিস হঠযোগীকে দেখে এসে'।

১। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬।৮।২) এ'রকমের একটি উদাহরণ আছে। সেখানে মন-রূপ জীবাত্মাকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে: 'স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য! তন্মনো * * প্রাণবন্ধনং হি সোম্য'।—সূতা দিয়ে বাঁধা পাখী যেমন চারদিক ঘুরে ঘুরে অন্য কোন আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধন, অর্থাৎ নিজের খাঁচাতেই ফিরে আসে, তেমনি * * পরামাত্মাই মনের তথা জীবাত্মার একমাত্র আশ্রয়।

স্বামিজী মহারাজ তারপর নিজেই স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রসঙ্গ তুলে বল্লেন: 'দেখ, স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আমায় কি ভালই না বাসতেন। এখন শুনি নাকি স্বামিজীকে আমি বিশেষ মান্য করি না। তোমরা তো আমার 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ্ ওয়ার্ক' বইটা পড়েছ। কি রকম লাগে বলতো? আচ্ছা ঐ বইটা পড়ে বুঝ্‌তে পার কি—স্বামিজীকে আমি মানি না?'

আমরা: 'সেকি কথা মহারাজ? অপূর্ব আপনার ভাষার মাধুর্য। প্রতিটি কথায় স্বামিজীর প্রতি আপনার নিবিড় শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। গুরুভায়ের উপর গুরুভায়ের অগাধ ভক্তি ও অফুরন্ত ভালবাসার নিদর্শন সত্যিই আপনার ঐ বইখানির পাতায় পাতায় পরিস্ফুট'।

স্বামিজী মহারাজ: 'ঠিক বলেছে। প্রশংসাবাদেরও আমি অর্থ বুঝি। স্বামিজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও পাশ্চাত্যে সাফল্যময় কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যেই তো আমার 'বিবেকান্দ এ্যাণ্ড হিজ্ ওয়ার্ক' বইখানি লেখা। স্বামিজী যে কত বড় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল যে কি নিবিড় ও কত মধুর, তা' আর অপরে কি ক'রে বুঝবে। শুধু বাইরের আবরণই সব-কিছু নয়, প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধটাই আসল'।

আমরা: 'মহারাজ, 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ্ ওয়ার্ক' বইখানির ভাষার লালিত্য ও গাম্ভির্য অতুলনীয়। আপনার অপরাপর বইয়ের ভাষা থেকে এই বইয়ের ভাষা যেন একটু ভিন্ন রকমের। ছন্দ-মাধুর্য এতে সুপরিস্ফুট'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ। বইখানির

ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, তাই এত ভাল হয়েছে। আমেরিকায়ও এ' বইখানির খুব প্রশংসা হয়েছিল'।

আমরা: বইখানির ভাষা যেমন প্রাণবান, তেমনি উদ্দীপনাময়ী। আপনিই তো লিখেছেন: 'These storms of opposition instead of quenching the fire of the spiritual truth of Vedanta that was burning upon the altar of the God-inspired soul of this Hindu preacher, fanned it into a blaze of light, the glory of which was visible from shore to shore, nay from accross the waters of the Atlantic ocean.' [২]

'The great soul thus passed away when his fame as a great Yogi, as a spiritual teacher, a religious leader, a patriot-saint, as a writer and an orator and above all, as the most disinterested worker for humanity had reached its climax and when new calls for greater work were ringing in his ears. As a lover of freedom, he could not have chosen a more auspicious day that the fourth of July, when the atmosphere around our planet was reverberating with the thoughts of freedom that were arising from the free souls of the American nation'. [৩]

তা' ছাড়া স্বামিজীর প্রতি যেখানে আপনার ভালবাসা,

২। 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ক', (১৯৩৭), পৃ: ১১
৩। ঐ পৃ: ২৫-২৬

শ্রদ্ধাবনতি ও আত্মনিবেদনের সরল স্বচ্ছন্দ ভাব পরিস্ফুট হয়েছে সেখানটি আরো সুন্দর। যেমন,

'Before I close, I must tell you that I had the honour of living with this great Swami in India, in England, and in this country. I lived and travelled with this great spiritual brother of mine, saw him day after day and night after night and watched his character for nearly twenty years, and I stand here to assure you that I have not found another like him in these three continents, and that no one can take the place of this wonderful personage. As a man, his character was pure and spotless; as a philosopher, he was the greatest of all Eastern and Western philosophers. In him I found the ideal of Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga and Jnana-Yoga; he was like the living example of Vedanta in all its different branches'. [৪]

বিশেষ ক'রে 'He is my comfort and solace. He is the senior brother to the whole world',[৫] অর্থাৎ তিনি আমার সুখ ও সান্ত্বনা, তিনি সমগ্র বিশ্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসনে সমাসীন'—আপনার প্রাণের এই সরল স্বীকৃতি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি'।

স্বামিজী মহারাজ: 'কি জানি বাবু, স্বামিজীকে আমি অন্তর

৪। বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্কস, (১৯৩৭) পৃঃ ২৮-২০

৫। ঐ পৃঃ ৩১

দিয়ে যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি তেমনই প্রকাশ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ভার স্বামিজীকে দিয়ে গিছলেন। তিনি বলেছিলেন: 'নরেন, এদের তুই দেখবি'। তাই স্বামিজী ছিলেন আমাদের কেন্দ্রাধিপতি'।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে আবার বল্লেন: 'Be orginal or die. জীবনে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ একটা বড় জিনিষ। মানুষ যদি অনুকরণ· ক'রে ক'রে কেবল গতানুগতিকতার পথে চলে, তবে সে একটা মেসিনে পরিণত হয়। তাই মানুষের মধ্যে যদি স্বাতন্ত্র্য কিছু না থাকে তবে তার জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না। লণ্ডনে থাকতে স্বামিজীকে আমি একবার বলেছিলাম: দেখ, আমার লেখায় কিন্তু তোমার ভাষা (ইংরাজী) আমি মোটেই অনুকরণ করিনি। স্বামিজী তা' স্বীকার করেছিলেন'।

আমরা বল্লাম: 'স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) ভাষার সত্যই তুলনা নাই। তিনি ছিলেন বর্‌ন (born—জন্ম থেকে) অরেটার (বক্তা)। তাঁর ভাষা একটা সাইক্লোনিক (ঘূর্ণি) তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রে সকল শ্রোতা ও পাঠককে যেন উত্তাল প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে নিতে চায়, সবার ভেতর একটা প্রচণ্ড উন্মাদনার ভাব সৃষ্টি করে। আপনার ভাষার মধ্যে পাই সংযত ও শান্ত ভাবের ইঙ্গিত, যুক্তিতর্কপূর্ণ কন্‌ষ্ট্রাক্‌টিভ (গঠনমূলক) একটি ধারা'।

স্বামিজী মহারাজ ঈষৎ একটু হেসে বল্লেন: 'তা—কি জানি বাবু, দু'জনের ভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্য তো একটা আছেই। প্রত্যেক মানুষের রুচি ও প্রকৃতি যেমন ভিন্ন, লেখার ষ্টাইল ও ভাষার বাঁধুনিও তেমনি বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক।

সকল মানুষের মুখকে যেমন ভেঙে এক রকমের করা যায় না, সবার লেখার ধারাকেও তেমনি একই ধরণের করা অসম্ভব। তবে স্বচ্ছতাই জানবে লেখার গভীরতাকে প্রকাশ করে। ভাষা বেশী শক্ত ও ধোঁয়াটে হ'লেই যে লেখার ভাব গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে এমন কোন কথা নেই। যিনি যে জিনিষটা যত বেশী পরিস্কার ক'রে প্রকাশ করতে পারেন তাঁর বলার ভঙ্গী বা লেখার ভাষা ততই স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়। আচার্য শংকরের ভাষা দেখেছ তো ক্যামন প্রসন্ন অথচ গম্ভীর'।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারটা বেজেছে। স্বামিজী মহারাজ তাঁর চিঠিপত্র লেখার জন্য উঠলেন। আমরাও সকলে বাইরে এলাম।

আর একদিনের কথা। স্বামিজী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের কথাপ্রসঙ্গে বল্লেন: 'স্বামিজীর কাণ্ডকারখানা তো জানোই। তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন লণ্ডনে। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তার আগেই গিছলেন। লণ্ডনে পৌছুলে ৩৩নং ব্লুমস্‌বেরী-স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটীর হলে (Hall) স্বামিজী একদিন আমার লেকচারের (বক্তৃতার) ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক ছিল স্বামিজীই বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু তাঁর মনে মনে সংকল্প ছিল অন্য রকম। ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। সে'দিন আগে থেকেই তিনি আমায় বল্লেন: তোমাকে সোসাইটি হলে (Hall) আজ বক্তৃতা দিতে হবে। আমি তো শুনে অবাক। সোজাসুজি আমি অস্বীকার করলাম। বল্লাম: জানতো, পাব্‌লিকের (জনসাধারণের) সামনে বক্তৃতা আমি কোনদিনই করিনি। স্বামিজী বল্লেন: তা আমি জানি, কিন্তু শ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে তৈরী হও

আজ। তবুও আমি ঘোর আপত্তি জানালাম। কিন্তু আমার আপত্তি তখন আর শোনে কে? তিনি আমার কোন যুক্তি বা কথায় কাণ দিলেন না। আমি তখন যে কী বিপদে পড়েছিলাম তা' এক শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন! আমার অসহায় অবস্থা দেখে স্বামিজী বল্লেন: যাঁর নাম সম্বল ক'রে আমরা ঘরবাড়ী ছেড়েছি, তাঁকে স্মরণ ক'রে যা মনে আসবে তাই দু'চার কথা বলবে। চিন্তার কি কারণ আছে। আমি বল্লাম: সে তো তোমার কাছে অতি সহজ কথা। আমি কিন্তু তা' পারব না। কিন্তু স্বামিজী শোনবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে অথচ স্নেহপূর্ণ হাস্যে বল্লেন: তা হয় না। আমি তোমার নাম এ্যানাউন্স্ (প্রচার) ক'রে দেব, এখন থেকে তৈরী হও। এই ব'লে তিনি চলে গেলেন। পাশ্চাত্য দেশে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে তা' আমি জানতাম, কিন্তু এত শীঘ্র যে সম্মুখ-সমরে দাঁড়াতে হবে তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই অনবরত একদিকে চিন্তা করতে লাগলাম স্বামিজীর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা, আর অপরদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। গত্যন্তর কিছু না দেখে অবশেষে মোটামুটি একটা সাবজেক্ট্ (বিষয়বস্তু) ঠিক ক'রে রাখাই শ্রেয় মনে করলাম। জানতাম— স্বামিজী যখন বলেছেন, তাঁর কথার নড়চড় হবে না। অগত্যা বক্তৃতার দিন (২৭শে অক্টোবর) বৈকালে হাজির হলাম খৃষ্টো-থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটির হলে। তখনো পর্যন্ত ঠিক ছিল যে, স্বামিজীই সে'দিন বক্তৃতা দেবেন। বিশিষ্ট শ্রোতাদের সমাগম হয়েছিল। বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে স্বামিজী তাঁর সংকল্প কাজে পরিণত

করলেন। তিনি উঠে শ্রোতাদের উদ্দেশ ক'রে বল্লেন: মাননীয় শ্রোতৃবৃন্দ, আমার প্রিয় ও সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ সবে মাত্র এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে, তিনিই আজ আপনাদের বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বলবেন। শোনা মাত্র আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। স্বামিজীর এ্যানাউন্সমেণ্ট (প্রচার) শুনে শ্রোতৃবর্গ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ঘন ঘন করতালি দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার যে অবস্থা হয়েছিল তা' এক শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম ডায়াসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক করেছিলাম 'পঞ্চদশী' (পঞ্চদশীর দার্শনিক মতবাদ) সম্বন্ধে কিছু বলব।[৬] শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীকে স্মরণ ক'রে সে' সম্বন্ধেই অনর্গল বলে যেতে লাগলাম, নিজেও বুঝতে পারছিলাম না যে কি আমি বলছি, তবে মনে হচ্ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন আমার মুখ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন অবিশ্রান্তভাবে। সমস্ত হল্‌টা তখন নিঃস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল'।

'ঘণ্টাখানেক বলার পর যখন আমি বক্তৃতা শেষ করলাম, হলের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত শ্রোতাদের মুহুর্মুহু করতালি-ধ্বনি যেন উত্তাল সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। স্বামিজীকেও বিপুল আনন্দে করতালি দিতে দেখেছিলাম। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। গোড়ার দিকে একবার স্বামিজীকে হঠাৎ

৬। বক্তৃতাটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে *An Introduction to the Philosophy of Panchadasi* নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে।

ঘাড় নাড়তে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি বক্তৃতায় আমার কোন ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম তা' নয়। তিনি ওভাবে আমার বক্তৃতা উপভোগ করেছিলেন। সমবেত শ্রোতারা আমার বক্তৃতা ভালভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট (উপলব্ধি) করেছিলেন'।'

৭। 'One of the events which satisfied the Swami (Vivekananda) immensely, was the success of the maiden speech of the Swami Abhedananda, whom he had designated to speak in his stead at a club in Bloomsbury Spuare, on October 27. The new monk gave an excellent address on the general character of the Vedanta teaching; and it was noticed that he possessed spiritual fervour and possibilities of making a good speaker. A description of this occasion, written by Mr. Eric Hammond reads ;

'Some disappointment awaited those that had gathered that afternoon. It was announced that Swamiji did not intend to speak, and Swami Abhedananda would address them instead. An overwhelming joy was noticeable in the Swami (Vivekananda) in his scholar's success. Joy compelled him to put at least some of itself into words that rang with delight unalloyed. It was the joy of a spiritual father over the achievement of a well-beloved son, a successful and brilliant student.' The Master was more than content to have effaced himself in order that his brother's opportunity should be altogether unhindered. The whole impression had in it a glowing beauty quite

তখন মনে হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত কৃপা ও করুণার কথা এবং প্রত্যক্ষ করলাম স্বামিজীর অফুরন্ত ভালবাসার নিদর্শন! সত্যই দেখেছিলাম সে'দিন গুরুভায়ের কৃতকার্যতায় গুরুভাইয়ের কি গৌরব ও আত্মগরিমার ভাব'।

'স্বামিজীকে যেমন ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি যুক্তির দিক থেকে আবার তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়তাম না। মতের অমিলও হ'ত কোন সময়ে কোন কোন বিষয় নিয়ে, কিন্তু সেই অমিলের পেছনে থাকত না আত্মগরিমা ও প্রশংসা লাভের বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি, থাকত মাত্র শ্রদ্ধাবনতির ভাব। সে' দু' একটা ঘটনার কথাই তোমাদের আজ বলি'।

'প্রথমবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) বেলুড় মঠের নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন ক'রে কর্মপদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন। তিনি সকলের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। দ্বিতীয়বার

indescribable. It was as though the Master thought and knew his thought to be true: *Even if I perish on this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it* * *. He (Vivekananda) remarked that this was the first appearence of his dear brother and pupil, as an English-speaking lecturer before an English audience, and he pulsated with pure pleasure at the applause that followed the remark. His selflessness throughout the episode burnt itself into one's deepest memory.' —*Life of Swami Vivekananda, Vol. II, pp. 528-29.*

যখন তিনি ইংলণ্ডে যান, তখন আমার সঙ্গে তাঁর দু'টি বিষয় নিয়ে তর্ক ও মতভেদ হয়েছিল।[৮] একটি নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শের অধিকারী করা ও অপরটি—মঠ ও মিশনের প্রতীক নিয়ে। তার আগে ক্রমবিকাশ ও জন্মান্তরবাদ নিয়েও কতকগুলি বিষয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে কিছুটা মতভেদ হয়েছিল। যাইহোক, প্রথম—নির্বিচারে সকলকেই সংঘভুক্ত ও সাধু-সন্ন্যাসী করার ব্যাপারে আমি আপত্তি তুল্‌লাম—যদিও সে আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছিল পরে। একদিন আমি বল্লাম: এই যে সকলকে নির্বিচারে সঙ্ঘে স্থান দিয়ে তুমি সন্ন্যাসের অধিকার দিচ্ছ, এটা কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মিডিয়েভেল যুগে (মধ্য-যুগে) ক্রিশ্চানধর্ম-সঙ্ঘের শোচনীয় পরিণতির কথা তুমি জান। বৌদ্ধসঙ্ঘের কথাও তাই। জাতি ও অধিকারী নির্বিশেষে সঙ্ঘের মধ্যে সকলকে সন্ন্যাসী করায় বৌদ্ধধর্মের পরিণতির কথাও তোমার জানা আছে'।

'উত্তরে স্বামিজী আমায় বলেছিলেন: তুমি ঠিকই বলেছ। ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির অধিকারী আর ক'জন হয় বলো। তবে কি জানো, চান্স (chance—সুযোগ) সকল মানুষকেই দেওয়া উচিত। আমি যে ছেলেদের শ্রীঠাকুরের

৮। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে যান ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। স্বামী অভেদানন্দও প্রথমবার পাশ্চাত্যে (লণ্ডনে) যান ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের এই দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতের দিকে রওনা হন ও রোম প্রভৃতি ঘুরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সিংহলে পদার্পণ করেন।

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

স্বামী অভেদানন্দ

সঙ্ঘে স্থান দিচ্ছি, এটা জানবে তাদের চান্স (সুযোগ) দিচ্ছি এ'জন্যে যে—যদি কোন ছেলে নিজের চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতে ভগবানের কৃপালাভ করতে পারে। সে'দিন স্বামিজীর সেই যুক্তি আমি বিনা বাধায় মেনে নিয়েছিলাম। কারণ জীবনের উন্নতির পথে চান্স (সুযোগ) সকল মানুষই পেতে পারে, শ্রেণী-বিভাগ বা অধিকারী ভাগের প্রশ্ন সেখানে নগণ্য। অনন্ত সম্ভাবনার (infinite possibilities) বীজ প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত আছে, সুতরাং দিব্যজ্ঞানের অধিকারী সকলে হ'তে পারে। তবে সকল মানুষ এ'রহস্য জানে না, আর জানে না বলেই তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে, সুযোগ পেলে হয়তো মানুষ তার জীবন-সমস্যার সমাধান একদিন না একদিন করবে'।

'তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় মতভেদটি হয়েছিল মঠ ও মিশনের প্রতীক নিয়ে। বেলুড় মঠ ও মিশনের প্রতীকের ডিজাইন (নক্সা) নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। প্রতীকের চারদিকে একটি সাপ (কুণ্ডলিনী) ফণা ধ'রে তার মুখ ও লেজ দিয়ে গোলাকার বৃত্ত রচনা করেছে। বৃত্তটি অনন্তের (infinity) চিহ্ন, যদিও বেলুড় মঠ ও মিশনের প্রতীকটিতে সাপ যে'ভাবে বৃত্ত রচনা করেছে, তাতে অনন্তের ভাব ঠিক প্রকাশ পায় না। কারণ সাপ যদি নিজের লেজকে মুখ দিয়ে গ্রাস না ক'রে ফণা ধরে থাকে তবে তা' অসাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচায়ক হয় না। এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করেই আমি স্বামিজীকে বলি যে, তুমি যে এম্‌ব্লেমটি (প্রতীকটি) আঁকিয়েছ তাতে আমাদের মঠ ও মিশনের মতবাদ ও আদর্শ যে সার্বভৌমিক ও

অনন্ত ভাবের প্রকাশক তা' বুঝায় না। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ কেন? আমি বলিঃ তোমার ডিজাইনে (নক্‌সায়) সাপটি ফণা ধরে থাকায় অখণ্ড বৃত্ত রচিত হয়নি। জলরাশি কর্মচাঞ্চল্যের, পত্রযুক্ত পদ্ম প্রেম-ভক্তির, হংস যোগের ও দেদীপ্যমান সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। এই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগের সমন্বয়-কল্পনা ঠিকই আছে। প্রতীক সঙ্ঘের তথা সঙ্ঘ-নিয়ামক শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্ম ও আদর্শের প্রতিভূ ও প্রকাশক। কিন্তু তোমার পরিকল্পিত প্রতীকে সেই সার্বভৌমিক ভাবের ঠিক প্রকাশ হয়নি। তাই প্রকাশক হিসাবে প্রতীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্ম ও তার আদর্শের সার্বভৌমিক ও অনন্তের ভাব যাতে প্রকাশ পায় তাই করা দরকার। স্বামিজী ঘাড় নেড়ে আমার যুক্তিতে সম্মতি জানিয়ে বলেনঃ তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কি জানো, কাজ চালাবার জন্যে তাড়াতাড়িতে এটাই এখন করেছি, ভবিষ্যতে আবার সংশোধন ক'রে নিলেই হবে। কিন্তু নানান কাজের ঝঞ্ঝাটে সে' প্রতীকের আর সংশোধন করেন নি তিনি'।

'স্বামিজীর পরিকল্পিত প্রতীকটির ত্রুটি সম্বন্ধে জানিয়ে আমি একদিন আমার সংশোধিত প্রতীকের নক্সাটি[১] স্বামিজীকে দেখিয়েছিলাম। আমার সংশোধিত প্রতীকটিতে ছিলঃ সাপ তার নিজের লেজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে সার্কেল (circle—বৃত্ত) রচনা করেছে। তার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের চিহ্ন-স্বরূপ আছে সূর্য, পদ্ম, হংস ও তরঙ্গময় জলরাশি। সূর্যের মধ্যে ওঙ্কার ও সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আছে বৈদিক বামাবর্ত স্বস্তিক—পরমকল্যাণের

১। সংশোধিত প্রতীকটি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, সোসাইটি ও আশ্রমে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

নিদর্শন-রূপে। স্বস্তিকের ওপর চন্দ্র ও তারকাবিন্দু। তারকাটি আবার পাঁচ কোণবিশিষ্ট। তারকা পুরুষের প্রতিকৃতি। তারকার ওপরের কোণটি পুরুষের মাথা, নীচে দু'দিকের দু'টি কোণ দু'টি হাতের ও নীচেকার দু'টি কোণ দু'টি পায়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও তারকাকে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি বলা যেতে পারে। তন্ত্রে এ'দুটি লিঙ্গ-যোনি তথা শিব-শক্তির প্রতীক। চন্দ্র আবার ইজিপ্টের হোরাসের মাতা আইসিসের প্রতিচ্ছবি। আইসিসকে প্রকৃতিদেবী (Nature) রূপেও কল্পনা করা হয়। চন্দ্র ও তারকা ইসলামধর্মেরও প্রতীক।

চন্দ্র ও তারকাকে মুসলমানরা মসজিদের চূড়ায় ও পতাকার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।[১০] তবে ইসলামধর্মে

১০। 'The crescent moon was the symbol of Isis and emblematic of the Hindu *yoni*, the productive power of the mother nature. This crescent has now became the symbol of the Mohammedans, it is placed on the top of mosques and tombs as well as on the banner of the Mohammedans. The five pointed stars which they place on the top of the crescent is the pentacle. This is the symbol of *Purusha*, the male princple'.—*Path of Realization* (1946), p. 85.

চন্দ্র ও তারকা যে আসলে বেদ ও তন্ত্র থেকে নেওয়া, এ'কথা ইসলামধর্মীরা সম্ভবতঃ স্বীকার করেন না। কিন্তু এ'থেকে প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল বেদ'।

'খৃষ্টানদের ক্রুশের (Cross) কথাও তাই। তোমরা আমার 'ওয়ার্ড য়্যাণ্ড ক্রশ ইন্ এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' ও 'নেশাসেটি অব্ সিমবলস্' লেক্‌চার (বক্তৃতা) দু'টো পড়বে, তাতে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা আছে। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা তাউ-ক্রশের প্রচলন করেন—যা দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'টি' (T)-এর মতো। অনেকের মতে খৃষ্টানদের ক্রুশ ইজিপ্টের প্রতীক 'ক্রাকস্-আন্‌সাটা'-র অনুকরণে তৈরী। আমার মতে ক্রুশ ও ক্রাকস্-আন্‌সাটা দু'টিই বৈদিক স্বস্তিক থেকে নেওয়া। তবে ক্রাকস্-আন্‌সাটা আগে, না ক্রুশ আগে—সে'কথা ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয়'।

'মোটকথা আমার সংশোধিত প্রতীকে অসাম্প্রদায়িকতা ও অখণ্ড সার্বভৌমিকতার ভাব পরিপূর্ণ-রূপে বর্তমান আছে। আমি এই সংশোধিত প্রতীকটি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, সোসাইটি ও আশ্রমের প্রতীক (emblem) হিসাবে গ্রহণ করেছি'।

আমরা সকলে নীরব। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মধ্যে থেকে একজন বল্লে: 'মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আপনার মতবাদ ও ভাবের মিল অনেকাংশে পাওয়া যায়। তেজস্বিতা, সাহসিকতা, স্বাধীন মনোবৃত্তি, পাণ্ডিত্য, স্পষ্টবাদিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, ঔদার্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ আপনাদের উভয়ের মধ্যেই আমরা দেখি। ভালবাসার

অচ্ছেদ্য বন্ধন দু'জনের ভেতর ছিলই, কিন্তু বিভিন্নতাও আবার লক্ষ্য করেছি উভয়ের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যেন কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়। প্রবল ঘর্ণিবায়ুর তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে নিমেষের মধ্যে তিনি সমগ্র বিশ্বের বুকে এক তাণ্ডবলীলার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ও সে' আলোড়নের মধ্যে পেয়েছিল মানুষ তার নূতনের পরিচয়। বহুদিনের জড়তা এবং সুপ্তিও পেয়েছিল জাগরণ ও দিব্যচেতনা। বিরাট বিশ্বের বক্ষস্থল বিদীর্ণ ক'রে সলিল-সিঞ্চন দিয়ে তিনি করলেন উর্বর ও ফলপ্রসু, আর আপনি বপন করলেন তার ওপর বীজ ধীর ও মন্থর প্রযত্ন দিয়ে, গড়ে তুল্লেন সমগ্র ক্ষেত্র বিচারশীল ও শান্তিকামী মানুষের বাসের উপযোগী ক'রে। আপনার ভেতর পাই আমরা সৃজনশীল গঠনমূলক শক্তি ও প্রেরণা, তাই আপনার লেখার ছত্রে ছত্রে আছে যুক্তি-তর্কপূর্ণ চিন্তা ও সাধনার ধারাবাহিক সোপান। সরল অথচ অতলস্পর্শী তাদের ভাব, আশা ও চিরসম্ভাবনার তারা দীপ্ত দীপশিখা!'

স্বামিজী মহারাজ সে'কথাগুলি যেন একটি শান্তশিষ্ট ছোট শিশুর মতো বসে শুনছিলেন। আমাদের মধ্যে থেকে পুনরায় একজন প্রশ্ন করলে শক্তি-সঞ্চারের কথা নিয়ে। সে' বল্লে: 'মহারাজ, কাশীপুরের বাগানে স্বামিজীর শক্তি নাকি আপনার ভেতর সঞ্চারিত হয়েছিল? আপনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক, কিন্তু স্বামিজী শক্তিসঞ্চার ক'রে আপনাকে করেছিলেন জ্ঞানপথের পথিক?'

স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'হ্যাঁ, লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এ'কাহিনীটাই লিখেছেন। শরৎ মহারাজকে আমি

ঘটনা যে সত্যি নয়, তা লিখেছিলাম। তিনি ভুল সংশোধন করতে রাজী হ'য়ে আমাকে পত্রও দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ভুল আজো পর্যন্ত থেকেই গেছে তাঁর বইয়ের মধ্যে, সংশোধন আর করা হ'ল না। তা'ছাড়া আরো মজার কথা যে, লীলাপ্রসঙ্গের দেখাদেখি পরবর্তী প্রায় সকল লেখকই অবলীলাক্রমে ঐ এক ভুল ঘটনাটাই তাদের বইয়ে উল্লেখ ক'রে চলেছে'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'তা'হলে সত্যকারের ঘটনাটি কি মহারাজ?' স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'শরৎ মহারাজ যখন লীলাপ্রসঙ্গ লেখেন তখন আমি ছিলাম আমেরিকায়। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শ প্রচার করতে গেলেন আমেরিকায়, আমি ও শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) দু'জনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য-জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ ক'রে খাতায় লিখতে আরম্ভ করলাম। এ'খবর বোধ হয় অনেকেই জানে না। ইচ্ছা ছিল তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাল একটি জীবনী লিখব দু'জনে। তা'ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর ভাবানুযায়ী উপনিষৎ, গীতা, সংহিতা, রামারণ, মহাভারত, বেদ প্রভৃতি থেকে অনেক শ্লোক এবং অংশও একটি খাতায় আমি সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু আমার সংকল্প কাজে আর পরিণত হ'য়ে ওঠেনি, কারণ স্বামিজী আমায় হঠাৎ ডেকে পাঠালেন ওদেশে (পাশ্চাত্যদেশে) গিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। শরৎ মহারাজ আমার আগেই রওনা হ'য়ে গিছলেন। স্বামিজীর ডাক এলে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি গুরুভাইরা আনন্দে আমায় যাবার সম্মতি দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন যাত্রা করি। রাজা মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ),

নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ), তুরীয়ানন্দ, শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতি সকলে কলকাতা আউটরাম ঘাটে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। জন্মভূমি ও গুরুভাইদের ছেড়ে অজানা দেশে যাবার সময়ে চোখের জল সত্যই সংবরণ করতে পারিনি। গুরুভাইদের চোখেও সে'দিন জল দেখেছিলাম, আর অনুভব করেছিলাম তাদের অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসার আকর্ষণ!'

'বিদেশে চলে যাওয়ার জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী-লেখা খাতাগুলি আমি শশী মহারাজের (রামকৃষ্ণানন্দ) কাছেই রেখে যাই। গুরুদাস বর্মন তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী'-র প্রথম ভাগের ভূমিকায় এ'কথার উল্লেখও করেছেন'।[১১]

'আমেরিকা থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একেবারে ফিরে আসার পর একদিন লীলাপ্রসঙ্গে শক্তিসঞ্চারের ঘটনাটি পড়ে আমিও অবাক হ'য়ে গিছলাম। শরৎ মহারাজ যে সত্যি ঘটনা না জেনে লিখেছেন তা' বুঝতে পারি। কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির দিন রাত্রে স্বামিজী ও আমি যখন পাশাপাশি বসে ধ্যান করি তখন শরৎ মহারাজ সেখানে ছিলেন না, ছিলেন মাত্র নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ) ও গোপাল দা (অদ্বৈতানন্দ)। অবশ্য তাঁরা ছিলেন অন্যদিকে, কাজেই তাঁরাও আমাদের ঠিক দেখতে পাননি। তাই লীলাপ্রসঙ্গে পড়ে আমি শরৎ মহারাজকে তৎক্ষণাৎ ভুল ঘটনার কথা লিখে পাঠাই। শরৎ মহারাজ তখন বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধনে) থাকেন।

১১। গুরুদাস বর্মণ সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বই সংশোধন করার আগে আমি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ভুল-সংশোধন ছাপাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে শরৎ মহারাজ যে পোষ্টকার্ডটি দিয়েছিলেন তা' এখনো আমার কাছেই আছে। শরৎ মহারাজ যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাতে পরবর্তী সংস্করণে তিনি ভুল সংশোধন ক'রে দেবেন লিখেছিলেন। আমিও শরৎ মহারাজের কথায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। তারপর লীলাপ্রসঙ্গের পরবর্তী সংস্করণও কিছুদিন পরে ছাপানো হ'ল, কিন্তু দেখি—যে ভুল ছিল সে ভুলই র'য়ে গেল, বইয়ে সংশোধন করা আর হয়নি'।[১২]

১২। লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত শিবরাত্রির ঘটনা ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসে ঘটেছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীম লিখেছেন ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। ঘটনাটি কাশীপুর বাগানে ঘটে। ১৭৮।১৯২৫ তারিখে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পত্রটির হুবহু প্রতিলিপি উল্লিখিত হ'ল :

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

উদ্বোধন আফিস
১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার
কলিকাতা
১৭—৮—'২৫

"প্রিয় অভেদানন্দ,

তোমার পত্র পাইলাম। বই খুলিয়া দেখিলাম আমারই ভুল হইয়াছে। আগামী সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া দিব। উদ্বোধনে ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই উদ্বোধন পড়িয়া থাকে। উদ্বোধনের গ্রাহক ছাড়া বাহিরের অনেক লোকই পুস্তক কিনিয়াছে ও কিনিবে। সুতরাং

তারপর স্বামিজী মহারাজ তামাক খেতে খেতে বল্লেন: 'লীলাপ্রসঙ্গে লেখা আছে যে, কাশীপুরের বাগানে স্বামিজী আমাকে ধ্যান করার সময় বল্লেন: আমায় ছুঁয়ে থাক্‌তো। আমি ছুঁলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: কি অনুভব কর্‌ছিস? আমি বলেছিলাম: ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি ধর্‌লে যেমন শক্ (shock) লাগে—তেমনি। তারপর আমি গভীরভাবে ধ্যানস্থ হই। শ্রীশ্রীঠাকুর সে'কথা শুনে স্বামিজীকে নাকি তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন: 'কিরে, একটু জম্‌তে না জম্‌তেই খরচ? ওর (কালীর) ভেতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কর্‌লি বল্ দিকিনি? ওর সব ভাবই নষ্ট ক'রে দিলি। ছ'মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হ'য়ে গেল'। তারপর ডানদিকে একটু হেলে রিভল্‌ভিং বুক্‌কেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' বইখানি টেনে নিয়ে বল্লেন: 'এই দেখ, বইয়ে এই লেখা আছে (স্বামিজী মহারাজ পড়তে লাগলেন):

এ' সংস্করণে যে ভুল র'হয়া গেল তাহার আর কোনও উপায় নাই। আমার ভালবাসা, প্রীতিসম্ভাষণাদি জানিবে। আশা করি তোমার শরীর ভালই আছে। আমি একরূপ ভাল আছি, কিন্তু গোলাপ মার শরীর খুবই খারাপ। Heart-এর অসুখ। কখন যে কি হবে বলা যায় না। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীসারদানন্দ"।

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ ইংরেজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণধামে গমন করেন। দুঃখের বিষয় লীলাপ্রসঙ্গের পরবর্তী কোন সংস্করণেই পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয়নি।

'ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাব সহায়ে পূর্ব-ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠান সকল করিয়া ফেলিতে লাগিল'।[১৩]

'কিন্তু আসল ঘটনাটি হ'ল: শিবরাত্রির দিন স্বামিজী, আমি, নিরঞ্জন স্বামী, গোপাল দা প্রভৃতি সকলে উপবাস করি ও চারপ্রহরে চারবার শিবপূজা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদিতে সারারাত্রি কাটাই। স্বামিজী ও আমি পাশাপাশি বসে ধ্যান করছিলাম। স্বামিজী একবার ধ্যানের পর আমায় বল্লেন: আমার শরীরে খুব একটা জোর কারেন্ট্ (current) বইছে। পরমহংসদেব যে শক্তি-শঞ্চারের কথা বলেন, ছাখ্ত—সেটা এই শক্তি কিনা? আমি তাঁর ডান হাতের কনুয়ের কাছে ও ডান উরুতে আমার ডান হাতটি দিয়ে দেখি সত্যিই স্বামিজীর সর্বশরীর কাঁপছে। স্বামিজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: কি ফিল্ (feel—অনুভব) করছিস? আমি বল্লাম: খুব জোর একটা ভাইব্রেসান (vibration—কম্পন)। কিন্তু আমার তখন মনে হয়েছিল: এটা কুণ্ডলীনীশক্তির জাগরণ। ব্যস্, এই পর্যন্ত। এর বেশী আর কোন ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু ঘটনাটি ঠিক ঠিক না জানার ফলে অতিরঞ্জিত হ'য়ে যা দাঁড়িয়েছে—তা' পড়লে দুঃখ হয়'।

১৩। স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৮-১৭

স্মৃতি : সাত

সন্ধ্যায় আকাশ বেশ পরিষ্কার। তুষার-ধবল কাঞ্চন-জঙ্ঘার আশেপাশে পেঁজা তুলার মতো কিছু-কিছু সাদা মেঘ। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ তার ওপর পড়ে অপূর্ব এক মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের বুকে এদিকে সেদিকে চিড়, ভূর্জপত্র প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী যেন রাত্রির প্রতীক্ষায় নির্বাক ও নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে বন্য-গোলাপ, ডালিয়া প্রভৃতি অসংখ্য রঙের ও রকমের ফুল, মানুষের যত্ন ও ভালবাসার প্রত্যাশা রাখে না, নির্জনে প্রকৃতির বুকেই দেয়, তারা তাদের গন্ধ ঢেলে প্রকৃতিই রাখে তাদের আদর ও মর্যাদা।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হ'য়ে এলো। পাহাড়ের বুকে চারদিকের ঘরগুলিতে আলো জ্বলে উঠলো। আশ্রমের ঠাকুর-ঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা উঠলো বেজে। আমরা সকলে মন্দিরে গিয়ে স্তোত্রপাঠে যোগ দিলাম। আরাত্রিক সেরে আসতে বাজলো প্রায় আটটা। তারপর আস্তে আস্তে স্বামিজী মহারাজের আফিস-ঘরের দিকে আমরা গেলাম। দেখলাম দরজাটি বন্ধ ক'রে নিবিষ্ট মনে তিনি কি একখানা বই পড়ছেন। দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন : 'এই যে, ক্যামন লাগছে তোমাদের দার্জিলিঙ ?'

আমরা বল্লাম : 'মহারাজ, ভালই লাগছে, তবে ঠাণ্ডাটা পড়েছে কিছু বেশী'।

স্বামিজী মহারাজ একটু হেসে বল্লেন : 'তবুও এ'টা বৈশাখ মাস, শীতকালে এলে তো একেবারে জমে বরফ হ'য়ে যেতে'।

দু'পাশে সাজানো বেতের চেয়ারে আমরা বসলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন একজন আগন্তুক, স্বামিজী মহারাজকে তিনি দেখতে এসেছেন কলকাতা থেকে। দার্জিলিঙে এসে চাঁদমারীতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি উঠেছেন। বৈকালে এসেছেন আশ্রম দেখতে। আমরা তাঁর পরিচয় দিলে স্বামিজী মহারাজ শুনে বল্লেন: 'বেশ, বেশ, বসুন। তা'—মশায়ের কি কাজ করা হয়?' আগন্তুক ভদ্রলোক হাত জোড় ক'রে বল্লেন: 'আপনি আর আমাদের 'মহাশয়' বলবেন না। বয়সও আমার অত্যন্ত কম। তা'ছাড়া আপনারা মহাপুরুষ—আমাদের প্রণম্য'।

স্বামিজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'কারু বয়স কম হ'লে যে তার প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করায় আপত্তি আছে এ' কেবল এখানেই (ভারতবর্ষে) আমি দেখছি। সামাজিক আচারের মধ্যে শিষ্টাচার ও শিষ্ট-সম্ভাষণ হ'ল অন্যতম। কাকেও 'তুমি' বা 'তুই' বল্লে যে তার প্রতি অসম্মান দেখানো হয় এমন কথা আমি বলছি না, কেননা ভাব নিয়ে কথা। মা, বাবা যখন তাঁদের ছেলেকে 'তুই' বা 'তুমি' বলেন তখন তার মধ্যে পুত্রস্নেহের অনাবিল ভাব থাকে। আবার মনিব যখন চাকরকে 'তুই' বা 'তুমি' বলেন তখন তার ভেতর থাকে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। একজন অপরের চেয়ে বড় মানে সে মর্যাদায় ও সম্মানে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে কিন্তু স্নেহ ভালবাসা থাকে না, থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব। সাধুভাবকে বজায় রাখার জন্যে সমাজে শিষ্টাচারের প্রচলন আছে। শিষ্টাচার বলতে মোটামুটি বোঝায় প্রত্যেকের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার। শিষ্টাচার কিনা

শিষ্ট বা সদাচরণ। তাই বয়সে, মর্যাদায় বা গুণে ছোট হ'লে যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে না করাটা বরং দোষের হয়।

আমাদের মধ্যে একজন স্বামিজী মহারাজকে প্রশ্ন করলে: 'কেন মহারাজ, 'তুমি' বা 'তুই' শব্দ ব্যবহার করলে কি একজনকে অবজ্ঞা করা হয়?'

স্বামিজী মহারাজ: 'সে তো আমি বলেছি। ভাব যদি ভাল থাকে তবে অবজ্ঞা বোঝাবে না। কিন্তু সাধারণতঃ একজন মানুষ আর একজনকে যখন 'তুই' বা 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করে তখন তার মনের অবচেতন স্তরে অহংকার মেশানো শ্রেষ্ঠত্বের ভাব লুকোনো থাকে, অর্থাৎ সে যে সম্মান ও মর্যাদায় অপরের চেয়ে বড়, সমকক্ষ নয়—এই ভাব বা অভিমান থাকে। আত্মাভিমান ভাল নয়। অভিমান থেকে অহংকার আসে, অহংকার এলে ভাল-মন্দ-জ্ঞান লোপ পায়। সাইকোলজিক্যাল এ্যানালিসিসে (মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে) এ'গুলি বেশ ধরা পড়ে। তাই নিজের মধ্যে অভিমানের ভাবকে না জাগানোই ভাল। ভগবান সকলের মধ্যে আছেন। তা'ছাড়া বিবেক, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আর কার মধ্যে নেই বলো? সকলে নিজেদের স্বরূপ জানে না বলে মনে করে তারা দুর্বল—একজনের চেয়ে অপরে ছোট বা বড়। জ্ঞানীরা তাই শিষ্টাচারের প্রবর্তন করেছেন সমাজের মঙ্গলের জন্য। আমাকে, তোমাকে ও সকলকে নিয়ে তো সমাজ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয়ের কল্যাণই মানুষের কাম্য। আচার প্রকাশ পায় আচরণ বা ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। কাকেও কটু কথা বল্লে—কি মিষ্টি কথা বল্লে এ'সব নিয়ে কথা নয়, কথা হ'ল মনের ভাব নিয়ে। আমরা

যে ভাষা ব্যবহার করি, তা' অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। কোন-কিছু করার বা বলার আগে মনে আমরা তার চিন্তা করি প্রথমে, তারপর মুখ-রূপ যন্ত্র দিয়ে তাকে বাইরে প্রকাশ করি। বেদান্তও বলে যে, বাইরের জগৎ মনেরই বিকাশ মাত্র। আচার্য শংকর বলেছেন: 'চরাচরম্ ভাতি মনোবিলাসম্'। তাই ভেতরের ভাব ভাল হ'লে বাইরের কথাবার্তা এবং আচরণও ভাল হয়। অথবা এর বিপরীতভাবে বলা যায় যে, বাইরের কথাবার্তা ও আচরণ ভাল হ'লে ভেতরের ভাব সৎ হয়। সাইকোলজিতে (মনোবিজ্ঞানে) এই জিনিষটিকে বোঝানো হয়েছে থট্ এ্যাণ্ড স্পিচ্ (thought and speech) অথবা আইডিয়াজ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডস্ (ideas and words)-এর থট্ (চিন্তা) বা আইডিয়াটাই (ভাবটাই) মনের বাইরে প্রকাশ পায় স্পিচ্ (কথা) বা ওয়ার্ড (শব্দ)-এর আকারে। ভর্তৃহরি তাঁর 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা'-য়' এ' নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। ভাবের সঙ্গে কথার নিত্য-সম্বন্ধ। দর্শনকাররা মূল ভাব ও কথাকে[১] শিবশক্তি বা পার্বতী-পরমেশ্বর বলেছেন। ভারতবর্ষে সকল-কিছুকে আধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ আধ্যাত্মিকতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য'।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'কথা বা ভাষার দিকে তাই সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়, কারণ কথা বা ভাষা ভাবেরই অভিব্যক্তি ব'লে ভাষার সারল্য ও স্বচ্ছতা ভাবের মাধুর্যকে আরো বৃদ্ধি করে। শিষ্টাচার বা শিষ্ট-আচরণেরও কতকগুলি উপাদান বা উপকরণ

১। বেশীর ভাগ সময় ভাব ও কথার পরিবর্তে শব্দ ও অর্থের তুলনা করা হয়।

আছে, যেমন সাধুভাষা, কল্যাণ-চিন্তা ও চেষ্টা, পরোপকার, প্রেম বা ভালবাসা। এই উপকরণগুলি মানুষের অন্তরের ভাবকে ভাল করে। পাশ্চাত্যের লোকেরা শিষ্টাচারকে যথেষ্ট মূল্য দেয়। তাই যোগ্য ও গুণী ব্যক্তির পূজো ওরা করে, যার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব সম্মানসূচক ব্যবহার করতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানোকে ওরা কর্তব্য ব'লে মনে করে। আমাদের দেশেও যে করে না, তা নয়। কিন্তু অনেকেই আবার দেখেছি শিষ্টাচারকে অবশ্য-পালনীয় ব'লে মনে করে না। ভারতবর্ষই তো একমাত্র দেশ—যেখানে নারীত্বের সম্মান যথার্থভাবে দেওয়া হয়েছে। নারী মাতৃজাতি। বেদে ও তন্ত্রে এঁদের আদ্যাশক্তি বলা হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর নিজের সহধর্মিণীকে জগন্মাতা ব'লে পূজো করেছিলেন। কিন্তু আজকাল সে আদর্শের প্রতি সম্মান দেওয়াকে আমরা কর্তব্য ব'লে মনে করি না। তার পরিবর্তে ভোগ ও স্বার্থ আমাদের যথাসর্বস্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নারীদের আমরা প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় বোলেই যেন মনে করি। মনুর উপদেশও এখন ভেসে গেছে। এ'দিক থেকে বরং সত্যকারের ভারতীয় আদর্শ বজায় রেখেছে পাশ্চাত্যের লোকরা। স্ত্রীলোকদের প্রতি ওদের আচরণ সর্বদাই সম্ভ্রমপূর্ণ। সর্বত্রই মেয়েদের ওরা আগে আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে ওসবের বালাই নেই। তবে আজকাল এদেশে মেয়েরা শিক্ষালাভ ক'রে স্বাধীনতার মর্যদা কিছুটা বুঝেছে, কাজেই যথেচ্ছাচারিতার যুগ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে বৈকি। বৈদিক যুগে সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সমানই অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ্যযুগে স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা সে'সব অধিকার

লোপ ক'রে দিয়েছিল। ঈশ্বর যেমন পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন, মেয়েদেরও তেমনি। জ্ঞান, বুদ্ধি বা প্রতিভা ও অধ্যবসায় উভয়েরই সমান। কাজেই সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার তো উভয়েরই থাকা উচিত। সংসারে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, নইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য লোপ পেয়ে যাবে'।

মনে হ'ল আমাদের সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির প্রতিচ্ছবি যেন তাঁর চোখের সাম্‌নে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছে। সমাজের নগ্ন মলিন মূর্তি চিন্তা ক'রে তাঁর অন্তর বেদনাতুর ও চঞ্চল, যদিও অফুরন্ত ক্ষমার প্রসন্নতা তাঁর প্রতি কথার মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছিল। তিনি আবার বললেনঃ 'সমাজের সকল-কিছুকে আবার নূতন ক'রে তৈরী করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা দেখাবে। সুপ্ত শক্তি ও গুণকে ফুটিয়ে তুলবে মানুষই তার পারস্পরিক সহযোগিতা দিয়ে, তার জন্যে দিনরাত ভগবানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা দুর্বলতার চিহ্ন। মানুষের সঙ্গে মানুষ ভাল ব্যবহার করে—তার মানে একজন অজ্ঞাতসারে অপরের আত্মস্বরূপের প্রতি অন্তরের সম্মান দান করে। অবশ্য পরিচিত হ'লে আদবকায়দার কোন বালাই থাকে না। আমিও আমার ছেলেদের (শিষ্যদের) কাকেও বলি 'তুই' বা 'তুমি। এটা অবশ্য স্নেহ বা ভালবাসার জন্যে। তবে আপনি আশ্রমে এসেছেন আমাদের অতিথি হিসেবে, সুতরাং আপনাকে যত্ন করা ও সম্মান দেখানো তো আমাদের কর্তব্য'।

আগন্তুক ভদ্রলোকটির অবস্থা তখন সত্যিই শোচনীয়। স্বামিজী মহারাজের একান্ত সৌজন্য, ভালবাসা ও সম্মান-

প্রদর্শনের ভাব দেখে তাঁর হৃদয় বিমুগ্ধ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তিনি শশব্যস্ত হ'য়ে একবার স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু স্বামিজী মহারাজ সস্নেহে বাধা দিয়ে বল্লেন: 'থাক্ থাক্, আপনারা ভক্ত লোক, বসুন। প্রাণের বিনিময়টাই আসল। দার্জিলিঙ আশ্রম দেখে আপনার কেমন লাগলো বলুন?'

ভদ্রলোক সম্ভ্রমের সঙ্গে আসন গ্রহণ ক'রে বল্লেন: 'বৈকালে এসে সমস্ত আশ্রমটি ঘুরে দেখেছি। বড়ই শান্তিপূর্ণ। চারদিকের মনোরম দৃশ্য ও তার সঙ্গে আশ্রমের দিব্যভাবপূর্ণ পরিবেশ ও নীরবতা প্রাণের সকল দুঃখ দৈন্য যেন দূর ক'রে দেয়'।

স্বামিজী মহারাজ প্রসন্ন মুখে বল্লেন: 'এরই জন্যে তো এতদূরে এই পাহাড়ের ওপর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা! শ্রীশ্রীঠাকুরের এখানে দিব্য-আবির্ভাব। যে যেখান থেকেই এখানে আসুন না কেন—শান্তি তিনি পাবেনই এখানে। সহর থেকে জায়গাটা একটু দূরে ও নীচে হওয়ায় নির্জনতা সদা সর্বক্ষণই পাওয়া যায়। সাধু ও ভক্তরা এখানে এসে বিশ্রাম করবেন, প্রাণে শান্তি পাবেন'।

ভদ্রলোক একজন চিত্রশিল্পী। কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করার পর দশ বার বছর ধরে ছবি আঁকা নিয়ে ডুবে আছেন। আর্ট সম্বন্ধে পড়াশুনা তাঁর যথেষ্ট। স্বামিজী মহারাজ তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব খুসী হলেন। বল্লেন: 'আপনি তো মশায় একজন গুণী লোক। স্বভাবের সৌন্দর্য উপভোগ করাই আপনার কাজ। তবে উপভোগ নিজে করলেই তো হবে না, অপরকেও তা'

করাতে হবে। ঠিক ঠিক আর্টিষ্টের (শিল্পীর) লক্ষণই হ'ল যে, নিজে সৌন্দর্য উপলব্ধি ক'রে শিল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন সেই সৌন্দর্যকে অপরের উপভোগের জন্য। শিল্পে নিজে আত্মহারা হবেন, পরকেও তাতে আত্মহারা করবেন। অনন্তের ভাব ও সৌন্দর্য বিশ্বপ্রকৃতির ভেতর দিয়েই অভিব্যক্ত হয়। শিল্পের সাধনা জাগ্রত করে শিল্পীর ভেতর পবিত্র শান্তি ও চেতনা ও তাই দিয়ে তিনি অনুভব করেন প্রকৃতির ভাব ও সৌন্দর্য। শিল্পী তাঁর অনুভূতি দিয়ে তা' সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন। শিল্পী শিল্পের পরিবেশক মাত্র, তবে সেই পরিবেশনের পেছনে শিল্পীর অন্তদৃষ্টি ও প্রাণপাত সাধনা থাকা চাই'।

কিছুক্ষণ চুপ করার পর স্বামিজী মহারাজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আপনার থাকা হয় কি কলকাতায়'?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেনঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্বামিজী মহারাজঃ 'তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কলকাতার মঠে গেছেন'।

ভদ্রলোকঃ 'আজ্ঞে না'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'সে কি, কলকাতায় আশ্রম করলাম তো আপনাদের জন্যেই। কলকাতা থেকে রোজ রোজ পায়ে হেঁটে বা গাড়ী ক'রে তো আর বেলুড় মঠে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলাম। উত্তর-কলকাতা হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থল। ওই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়েই তো তিনি কেশব বাবুর বাড়ীতে যেতেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের চেহারা ছিল তখন অবশ্য ভিন্ন রকমের। সিমলায় রামচন্দ্র

দত্ত ও সুরেশ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর প্রায়ই যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজে, ঠনঠনের কালীবাড়ী ও কখনো কখনো গুহদের কালীবাড়ীতেও তিনি যেতেন। তাঁর পদধূলিতে বিশেষ ক'রে উত্তর-কলকাতার পথঘাটের ধূলিকণা চিরপবিত্র। আমি তো তাই উত্তর-কলকাতাকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ ও মন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করলাম, নইলে কলকাতার আশেপাশে বা কিছু দূরে জায়গা পেয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে না। আমেরিকা থেকে ফেরার পর কলকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে বিশেষ ক'রে কিছু একটা করার বাসনা জেগেছিল। ভাল একটা ইউনিভার্সিটি (বিশ্ববিদ্যালয়) ও সর্বভারতীয় সন্ন্যাসী-সংঘ[২] গড়ে তোলারও প্রবল ইচ্ছা ছিল। আর ছিল পাহাড়ের ওপর নির্জন স্থানে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা, শ্রীশ্রীঠাকুর সে' আশা পূর্ণ

২। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামী অভেদানন্দ যে সমস্ত জনহিতকর কাজ আরম্ভ করার মনস্থ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সর্বভারতীয় সাধু বা সন্ন্যাসী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করাও ছিল অন্যতম কাজ। ভারতে সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা ঐক্য ও ভালবাসার একটি সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর ঐ সংঘ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌমিক মতবাদ ও ভাবধারার ভিত্তিতে যাতে সমগ্র সন্ন্যাসী-সংঘ গ'ড়ে ওঠে, সকলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোভাব নষ্ট হ'য়ে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়—এই ছিল সংঘ গড়ে তোলার পেছনে স্বামী অভেদানন্দের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানান বাধাবিপত্তির জন্য সেই মহতী ইচ্ছা কাজে পরিণত হ'য়ে ওঠেনি।

saint (তিনি নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় মহাত্মা)। কিন্তু ভারতীয় মহাত্মা যে কে তা' তিনি বহুদিন জানতে পারেন নি। কিছুদিন পরে হঠাৎ ম্যাক্স-মুলায়ের লেখা 'লাইফ য়্যাণ্ড সেইংস্ অব রামকৃষ্ণ' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও বাণী) তাঁর হাতে এলো। বইখানা খুলতেই একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখে তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন: 'এই তো সেই মহাত্মা—যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছি'। সমস্ত শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। তিনি জানতে পারলেন—তিনিই (সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ) এই ভারতীয় মহাপুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনী ও বাণীগুলি অতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি পড়তে তখন লাগলেন, একবার নয়, অনেকবারই, আর সে'দিন থেকে তাঁর ধ্যানের সামগ্রী হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি ও জীবনের একমাত্র সহায়-সম্বল হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রমাণ সাইজের (বড় আকারের) অয়েলপেন্টিং (তৈলচিত্র) আঁকতে ইচ্ছা করলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে থেকে শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ও আলাপ-পরিচয় হয় লণ্ডনে। প্রাগে (Prague) যখন আমি যাই তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। তাঁর ভগ্নী হেলেনা ডোরাকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ আমায় নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখতে থাকেন ও সাধন-ভজন বিষয়ে উপদেশ নিতেন। পরে তাঁর ভগ্নির কাছ থেকে আমার খবর পেয়ে একবার লিখে পাঠালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে

তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগে। তাঁর নাম জপ ও ধ্যান কিভাবে করতে হয় লিখে পাঠালে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কেমন ক'রে জপ ও তাঁর মূর্তি কিভাবে ধ্যান করতে হয় আমি সমস্ত লিখে পাঠালাম। তিনিও আমার নির্দেশ মতো নিয়মিতভাবে ধ্যান জপ করতেন'।[১]

'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি (তৈলচিত্র) আঁকার একান্ত ইচ্ছা নিয়ে (ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্) শরৎ মহারাজকে ও আমাকে লিখে পাঠালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নানান রকম পশ্চারের (posture—ভঙ্গিমার) ছবি (ফটো) পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্যে। শ্রীশ্রীঠাকুরের যে তিন রকম পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ছবি পাওয়া যায় শরৎ মহারাজ তাঁকে তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিন রকমের তিনটি ছাড়া আর কোন ছবি নেই। যেমন, একটি সমাধিস্থ বসা ছবি, একটি কেশববাবুর[২] বাড়ীতে দাঁড়ানো ও অপরটি থামে হাত দেওয়া ধুতি-পরা ও কোঁচাটি ঘাড়ে ফেলা পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ছবি। এই তিন রকমের মাত্র ফটো তোলা হয়েছিল। শরৎ মহারাজ ফটো পাঠাবার পর ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ আমায় চিঠি লিখে তা' জানান। প্রথমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাষ্ট্ (bust—মস্তক থেকে বক্ষঃস্থল

১। বলা বাহুল্য যে, ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ স্বামী অভেদানন্দকে দীক্ষাগুরু ব'লে নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ স্বামী অভেদানন্দকে যে-সকল চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলিতে স্পষ্টই তিনি স্বীকার করেছেন যে, স্বামী অভেদানন্দই তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার পথে গুরু। স্বামী অভেদানন্দকে লেখা ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের বহুমূল্যবান পত্রগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ সময়ান্তরে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

২। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

পর্যন্ত আধখানা শরীরের) ছবি আঁকেন ও শরৎ মহারাজকে সে'টি উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। তিনি আবার তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিন্ন ভিন্ন পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ফটো (আলোকচিত্র) চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ভাল ক'রে ফুল ফিগারের (সম্পূর্ণ আকৃতির) একটি ছবি (তৈলচিত্র) আকার জন্যে। শরৎ মহারাজ তাই তিন রকম পশ্চারের (ভঙ্গিমা) ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন'।

আমাদের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তিন রকম ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর কোন পশ্চারের ফটো নাই কেন মহারাজ' ?

স্বামিজী মহারাজঃ 'এর কথা আমি পরে বলব, মনে করিয়ে দিও। এখন যা বলছি শোন। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ তিন রকমের ফটো পেয়ে কেশববাবুর বাড়ীতে হাত তোলা সমাধিস্থ ছবিটাই পছন্দ করলেন। কিন্তু ঐ ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-দু'টি খোলা না থাকায় তিনি একটু চিন্তিত হলেন। তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ খোলা থাকলে মুখের এক্স্প্রেসন্ (expression—ভাব) ভাল হয়, তাই দিনরাত তিনি চিন্তা করতে লাগলেন চোখ-দু'টি খোলা থাকলে মুখের এক্সপ্রেসন (ভাব) কিরকম হয়। আর্টের দিক থেকে এ'কথা সত্য যে, রেখার সামান্য একটু অদল-বদলে কত-কিছু ভাবের পরিবর্তন হ'তে পারে। তাই চিন্তার বিষয় ছিল বৈকি। একান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে একদিন তিনি বাহ্যিক জ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেল্লেন। ঐ অবস্থায় তিনি একটি ভিসন্ (vision—

অলৌকিক দর্শন) দেখেন। ভাব-চোখে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মহিমোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসন্ন মুখখানি থেকে যেন স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। চোখ-দু'টি খোলা, অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব তাতে মাখানো, অথচ একান্ত উদাসীন ও ব্রহ্মনিবদ্ধ ছিল দৃষ্টি। নিরাবিল আনন্দের ভাব ও উন্মাদনা নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তুলি নিয়ে ছবিখানির মুখ আঁকতে লাগলেন। মুখের ভাবকে হুবহু ফোটালেন যেমনটি দেখেছিলেন তাঁর দিব্যদর্শনে। তেজোদ্দীপ্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের মাঝখানে ফুটিয়ে তুল্লেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ চাওয়া প্রসন্ন-গম্ভীর মুখটি। শিল্পীর সুপ্ত স্বপ্ন জাগ্রত হ'য়ে উঠলো আশা ও আনন্দের সার্থকতা নিয়ে!'

ছবি আঁকা প্রায় শেষ হবার আগে আমাকে ডোরাক্ একদিন চিঠি লিখে পাঠালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড়ের রঙ্ কিরকম হবে জানার জন্যে। চিঠি পেয়ে আমি আমার সিল্কের গেরুয়া পাগ্ড়ি থেকে কিছুটা ছিঁড়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড়ের রঙ্ হুবহু তিনি আমার পাঠানো গেরুয়া পাগ্ড়ির নমুনা অনুযায়ী দিয়েছেন'।

আমাদের মধ্যে থেকে সেই শিল্পী ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে বল্লেন: 'অতি অপূর্ব ঘটনা মহারাজ!'

স্বামিজী মহারাজ: 'অতি অপূর্ব ঘটনা তো বটেই। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ ছিলেন শুদ্ধ আধারের মানুষ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মতো তিনি জীবনযাপন করতেন, স্বভাবও ছিল সরল ও পবিত্র, তারি জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের এ'ধরণের অতুলনীয় ছবি আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ছবির জীবন্ত মূর্তিতে

ঈশ্বরীয় ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ! ডোরাকের বন্ধু প্রাগের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী লোকা-র (Mr. Nloka) সঙ্গেও আমার বিশেষ পরিচয় ছিল'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন বল্লে: 'ছবিটি সত্যিই লাইফ-লাইক্ (life-like—জীবন্ত) হয়েছে। বাম হাতের আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত এমনি নিখুঁৎভাবে আঁকা—যেন শরীর থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে ফুটে উঠেছে'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, ওখানেই তো শিল্পীর কৃতিত্ব। যতদূর সম্ভব অরিজিন্যাল (original—মৌলিক) ক'রে ফুটিয়ে তোলাতেই ছবির—বিশেষ ক'রে অয়েল-পেন্টিঙ্-এর (তৈলচিত্রের) বৈশিষ্ট্য থাকে। শ্রীমার ছবিরও তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি আঁকা শেষ ক'রে ডোরাফ্ শ্রীমার ছবি (তৈলচিত্র) আঁকেন। শ্রীমার যে ফটোটি তিনি পছন্দ করেছিলেন তাতে মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল তাঁর ডান পাশের দিকে ফেরানো। তিনি আঁকার সময় মুখটিকে সাম্‌নের দিকে ক'রে নিয়েছিলেন। শ্রীমার ছবি আঁকার আগে অবশ্য স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) মাথায় পাগড়ী-বাঁধা একখানি বষ্ট্ (bust) অয়েল-পেন্টিঙ্-ও (তৈলচিত্র) তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সন্তানদের এক একখানা ছবি আঁকেন। কিন্তু তা' আর হ'য়ে ওঠেনি, কারণ অসময়ে তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তবে আমার যে তিনখানি ছোট সস্‌পেন্টিং তিনি এঁকেছিলেন তা' আমার কাছে এখনো আছে। এই তিনখানির ভেতর দু'হাত তুলে প্রণাম করা ছবিটি অন্যতম'।

৩। বাকী দু'টি ছবির ভেতর একটি স্বামী অভেদানন্দের ইংরেজী 'টু সাইকোলজি' বইয়ের গোড়ার দিকে ব্লক ক'রে দেওয়া হয়েছে ও অপরটি এখনো অপ্রকাশিত।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ॥

(ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ অঙ্কিত)

॥ শ্রীশ্রীসারদাদেবী ॥

(ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ অঙ্কিত)

শিল্পী ভদ্রলোক : 'মহারাজ, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। শ্রীমার ছবিটি আপনার নিজের কি রকম লাগে শুনতে ইচ্ছা হয়'।

স্বামিজী মহারাজ : "আর্টের (শিল্পের) দিক থেকে আমি বল্‌ব যে, শ্রীমার ছবি শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়েও ভাল ও শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান। এতে কলার-কম্বিনেসন্‌-এর (colour-combnation—রঙ্‌ বা বর্ণ-সংমিশ্রণের) তুলনা নেই। কমনীয়তা ও সফট্‌নেস্‌-এর (softness—কোমলতার) সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীমার ছবিতে যেন সুপরিস্ফুট। অফুরন্ত ভালবাসা ও মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশ। শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না। নারীত্বের সকল-কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট ছবিটিতে যেন মূর্ত ও জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছে। সর্বদা প্রসন্নময়ী ক্ষমার ভাব মুখে ও চোখে সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে। শ্রীমার স্তোত্রেও তাই আমি লিখেছি,

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্‌।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্‌॥
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্‌ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্‌
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্‌॥

রসরাজ অমৃতলাল বোস 'স্নেহেন বধ্নাসি' লাইনকটি পড়ে একদিন অশ্রুছলছল নেত্রে আমায় বলেছিলেন : 'মহারাজ, শ্রীমার উদ্দেশে রচিত আপনার এই লাইন-ক'টি অন্ততঃ চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে অমর হ'য়ে থাকবে। অপূর্ব

এইকথা যে, করুণাময়ী মা আমাদের সকল দোষকে সকল সময় গুণ হিসাবে গণ্য করতেন। অহেতুকী তাঁর কৃপা! চিরক্ষমাসুন্দরমূর্তি ছিলেন মা সারদা, আর তারি জন্য পাপী তাপী আমরা সকলে তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাবার অধিকার পেয়েছিলাম!'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'আমার কি ভাব জানো? শ্রীমার কেন, সমস্ত দেবীমূর্তিই নবযৌবনসম্পন্না হওয়া উচিত। প্রাচীন ছবি এবং ভাস্কর্যে দেখ্‌বে—দেবীমূর্তিতে সর্বদাই নবযৌবন-রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বুড়ো, অসুখে জর্জরিত, রোগ বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত—এই ধরণের ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরী করা মোটেই উচিত নয়। শ্রীমার সম্বন্ধেও তাই। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীমার ছবিতে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। অপূর্ব লাবণ্য ও পবিত্র স্নিগ্ধতা যেন সমগ্র ছবিখানিতে মাখানো আছে। ছবিটির সত্যই তুলনা নাই!'

আমাদের মধ্যে থেকে একজন বল্লে: অনেককে বলতে শুনেছি —শ্রীমার ছবি নাকি একটু ওয়েষ্টারনাইজড্ (Westernised —বিলেতী ভাবাপন্ন হয়েছে)।

স্বামিজী মহারাজ: "হ্যাঁ, শ্রীমার ছবি (প্রতিকৃতিতে) প্রাচ্যের বদলে পাশ্চাত্যের নারী-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এটাই তাদের বলার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি সম্বন্ধেও আমি ওরকম কত-কিছু মন্তব্য ও সমালোচনা শুনেছি। সাধারণ মানুষ কেন, বিশিষ্ট আর্টিষ্টদের ভেতরেও রুচি ও মতের যথেষ্ট অমিল আছে। দৃষ্টিভঙ্গী তো আর সকল লোকের সমান নয়। তবে আর্টের (শিল্পের) একটা নিজস্ব ভঙ্গী ও

ধারা থাকা উচিত। যিনি আর্টিষ্ট (শিল্পী) হবেন, তাঁর সকল সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভাবের বাইরে থাকা উচিত। তাঁর কাছে টেকনিক (technique—শিল্পকৌশল বা অঙ্কনশৈলী) ভিন্ন ভিন্ন থাকতে পারে, কিন্তু কলা-সৌন্দর্যের ভেতর এদেশ-ওদেশ বা জাতি-বিচারের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। শিল্পী সৌন্দর্যের সাধক, শিল্পকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আসনে যথাযোগ্যভাবে বসানোই তাঁর কাজ। The combination of light and shade-ই (আলো-ছায়ার সংমিশ্রনই) কেবল ছবি, প্রতিকৃতি বা চিত্র নয়, তাতে সজীবতা অর্থাৎ সচল প্রাণের পরিচয় থাকা দরকার। শিল্পীমাত্রের মধ্যে তাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে insight and inspiration (অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবের উদ্দীপনা) থাকা চাই। শিল্পী সাধক, শিল্প তাঁর সাধনা। শিল্পীর মধ্যে কল্পনাশক্তি বিশেষ প্রবল হয়। কল্পনা বা মনের মধ্যে প্রথমে তিনি সকল জিনিসের ডিজাইন (design—ছাঁচ, নক্সা বা আদর্শ) সৃষ্টি করেন, তারপর তুলির রেখায় ও রঙে তাকে বাইরে প্রকাশ করেন। সাবজেকটিভটা তখন অবজেকটিভে পরিণত হয়, অথবা বলতে পার আইডিয়ালিজম পরিশেষে রিয়ালিজম হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে ছবি আইডিয়ালিষ্টিক (আদর্শ) ও রিয়ালিষ্টিক (বাস্তব) দু'রকমই আছে। গ্রীসিয়ান আর্ট (গ্রীসিয় শিল্প) নিছক রিয়ালিষ্টিক (বস্তুনিষ্ঠ), কেননা গ্রীসের শিল্পীমন ও শিল্পদৃষ্টি ছিল কেবল বাইরের অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে নিবদ্ধ। সুদৃঢ় সুঠাম শরীর, সবল মাংশপেশীযুক্ত অঙ্গ, সুদীর্ঘ নাসা ও আয়ত চক্ষু প্রভৃতি ছিল তাঁদের মতে শিল্পের সৌন্দর্যের মধ্যে গণ্য। মোটকথা প্রাকৃতিক বিকাশ ও সৌন্দর্যের তাঁরা উপাসক ছিলেন। এ্যাপোলো,

ডায়ানা প্রভৃতির ছবি দেখলেই তা' বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় শিল্পের আদর্শ এই সব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তর্দৃষ্টি ও অধ্যাত্মিকতাই ভারতের সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য। ভারতের শিল্পী তাই জড়শরীরের চেয়ে মন বা ভাবকে ফোটাতে চান তাঁর শিল্পের ভেতর দিয়ে। ভাবেরই তিনি প্রধান পূজারী। উদাহরণ যেমন, বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি। ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধের অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ এ'সব মোটামুটি ভাবে খোদাই করলেও বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত ভাবকেই তারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট করতে চান। দেখলে মনে হয় বাইরের জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্তরের শান্তি ও আনন্দের সন্ধানেই বুদ্ধ নিজেকে গভীরভাবে ডুবিয়ে দিয়েছেন। যোগাসনে বদ্ধপদ্মাসন, ভূমিস্পর্শমুদ্রাযুক্ত হস্ত, মুদ্রিত চক্ষু, প্রসন্ন ও কল্যাণসুন্দর মূর্তি—এ' সমস্তই ভগবান বুদ্ধের আত্মকাম ও আত্মতৃপ্তির ভাবকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে!' স্বামিজী মহারাজের সেবক তামাক দিয়ে গেল। নলটি মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে তামাক খেতে খেতে তিনি পূর্বেকার প্রসঙ্গের অনুসরণ ক'রে বল্লেন: 'বিশেষ ক'রে দেবদেবী ও মহামানবদের ছবি আঁকতে বা মূর্তি তৈরী করতে গেলে তাতে দেবত্বের ভাব ও মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা উচিত। শিল্পের জগতে ইষ্ট বা ওয়েষ্ট (প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য)—এ'ধরণের কোন বালাই থাকা উচিত নয়। তবে টেকনিকের মধ্যে ভেদ থাকতে পারে। মানুষের রুচি বিচিত্র, শিল্পীও মানুষ, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ভেতর রুচির বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। টেকনিক বা অঙ্কনশৈলী শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সৃষ্টি হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর

কারণ রুচি বা ইচ্ছা। মানুষমাত্রেই ইচ্ছার বশবর্তী। মানুষ ইচ্ছা অনুসারে সকল জিনিস ভাঙে ও গড়ে। সকল সৃষ্টির মূলে তাই ইচ্ছা থাকে। শুধু মানুষ কেন, ভগবানও বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে। সাইকোলজিষ্টরা (মনোবৈজ্ঞানিকরা) ইচ্ছাকে তাই সকল কার্যের কারণ বলেন। শ্রেণী বা জাতি হিসাবে এক ও অখণ্ড হলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ, জলবায়ু, সামাজিক পরিবেশ ও ভৌগলিক পরিস্থিতি অনুয়ায়ী মানুষের রুচি, ভাষা ও উচ্চারণ বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের শিল্পী যে রুচি ও মনোভাব নিয়ে ছবি আঁকেন, জাপানী শিল্পী ঠিক সে রুচি ও ভাবকে নিয়ে ছবি আঁকেন না। পাশ্চাত্য শিল্পীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের থেকে আবার ভিন্ন। তবে দৃষ্টিভঙ্গী রুচি থেকে গড়ে ওঠে তা' আগেই বলেছি। উদাহরণ যেমন, গৌতম-বুদ্ধের ছবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পীরা এঁকেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। গান্ধারশিল্প মথুরাশিল্পকে অনুসরণ করে নি, মথুরাশিল্প আবার অন্যান্য শিল্প থেকে পৃথক। বৌদ্ধযুগে অজন্তা ও বারহুতের শিল্পচাতুর্যের মধ্যেও হুবহু মিল ছিল না। পাশ্চাত্যেও তাই। পাশ্চাত্য স্থাপত্যে গথিকের সঙ্গে সারাসেনিকের ঠিক মিল নেই। Man thinks and does everything in his own image (মানুষ প্রত্যেক জিনিসই নিজের অনুরূপ চিন্তা ও কাজ করে)। এ'রকম হওয়াও স্বাভাবিক। বাঙ্গলাদেশের শিল্পী দেবীমূর্তি আঁকলে দেবীর মুখের ভাব, গড়ন ও পোষাকপরিচ্ছদ সবই বাঙ্গালী মেয়েদের মতো করবে। জাপানী শিল্পী আঁকলে ফুটিয়ে তুলবে তার নিজের দেশ ও সমাজের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের

শিল্পীরা আঁকবে তাদের সমাজের আচার-ব্যবহার ও রুচির দিকে নজর রেখে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবি বা মূর্তিতে তাই নাক, মুখ, চোখ, কাণ, শরীরের হাবভাব, গায়ের রঙ ও গঠন, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। একই সরস্বতী, দুর্গা ও গণেশের ছবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পীদের হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবদেবীগুলির গড়নের মধ্যে আবার পার্থক্য অনেক। এখানে ধর্ম ও বিশ্বাস-ভেদে শিল্পে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তা'ছাড়া মোগল, রাজপুত, কাঙড়া-উপত্যকা প্রভৃতির শিল্প-বিকাশের মধ্যেও শৈলী ভিন্ন ভিন্ন'।

'সৃষ্টিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এঁরা এক ও অদ্বিতীয় হ'লেও তাদের বিকাশে বৈচিত্র্য আছে। শিল্প বা শিল্প-প্রতিভা তেমনি এক হ'লেও বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন শিল্পীর রুচি ও দৃষ্টিভেদে শিল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমার ছবিকে তাই যাঁরা ওয়েষ্টার্নাইজড (Westernised) বলেন, তাঁরা নিজ নিজ রুচির গণ্ডীকে লক্ষ্য ক'রে বা দেশ ও সমাজের ভিন্নতার মাপকাটিকে ধরে মন্তব্য করেন। ফ্র্যাঙ্ক-ডোরাক যথার্থ ধ্যানী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রীমার ছবি এঁকেছেন। শিল্পী আসলে স্বভাব-সৌন্দর্যের সাধক, পৃথিবীর মাটিতে বাস করলেও তিনি অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী, তাই তাঁর নিজস্ব কোন সমাজ, জাতি বা বর্ণ থাকে না, বরং নিরপেক্ষ ও উদার মন নিয়েই তিনি 'সুন্দর'-এর সাধনা করেন। শিল্পে স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টি করাই তো তাঁর জীবনের ব্রত। রস ও ভাবের পরিবেশক-রূপে নির্দ্বন্দ্ব মন নিয়ে

শিল্প সৃষ্টি করেন তিনি নিজেকে ও শিল্প-প্রেমিককে রসোত্তীর্ণ লোকে পৌঁছে দেবার জন্য। ফ্রাঙ্ক-ডোরাকের শিল্পসৃষ্টি রসোত্তীর্ণ ছিল, তাই তিনি শ্রীমার এ'ধরণের জীবন্ত প্রতিকৃতি আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীমার সমগ্র জীবনের আলেখ্য তিনি এঁকেছেন—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সমন্বয়সাধন ক'রে। অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও অনাগত ভবিষ্যতের দিকে শিল্পী তাঁর সৌন্দর্যসেবী দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিলেন, তাই পরিপূর্ণ হয়েছে তাঁর সংকল্প ও সাধনা'।

'কিন্তু সাধারণ মানুষ চায় বাস্তবের পূজা। সে বাইরের জগতে গাছপালা, ঘর-বাড়ী যেমনটি দেখে, তেমনটিই দেখতে চায় তার নকল-করা প্রতিকৃতির ভেতর, এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মেজাজ যায় বিগড়ে, আর তারি জন্য ফটো বা ফটোর হুবহু নকল ছবি হয় তার কাছে আদরের জিনিস। কিন্তু ফটো হ'ল কোন-কিছুর কয়েক সেকেণ্ডের রিপ্রোডাকশন (পুনর্প্রতিফলন) বা রিপ্রেজেণ্টেশন (প্রতিচ্ছবি) মাত্র। কাজেই কোন মানুষের ফটো মানে হ'ল সে' মানুষটির হাবভাব, অভিব্যক্তি এক বা কয়েক সেকেণ্ডে যা ছিল ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি। তার আগেকার বা পরেকার কোন-কিছুর খবর সে দিতে পারে না। তাই শিল্প-বিকাশের দিক থেকে ফটো (আলোকচিত্র) ইম্পার্ফেক্ট (অসম্পূর্ণ)'।

'প্রকৃতপক্ষে এক বা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের রূপ থেকে মানুষের একটা গোটা জীবনের ইতিহাস কখনো জানা যায় না। প্রতিসেকেণ্ডে পার্থিব সকল-কিছুর যখন পরিবর্তন হয়, তখন মানুষের দেহের প্রত্যেকটি অনু-পরমাণুও প্রতিমুহূর্তে

রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন যে শরীর দেখছ, একঘণ্টা পরে দেখবে ঠিক সে' শরীর নাই। আজ যে চেহারা দেখছ, কাল তার পরিবর্তন দেখবে। প্রতি সাত বৎসর অন্তর মানুষের দেহের সকল-কিছুর পরিবর্তন চোখে ধরা পড়ে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের তথা ভাব, ধারণা, ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে তোলা ফটোতে একটি মানুষ সম্বন্ধে আর তোমরা কতটুকু জ্ঞান লাভ করবে বলো! তারপর আবার লাইট এ্যাণ্ড সেডের (আলো ও ছায়ার) খেলা। আমিও ফটো তোলাতে একজন এক্সপার্ট (পাকা লোক) ছিলাম। ফটো তুলে নিজেই প্রিণ্ট্ ও এন্লার্জ (আকারে বড়) করতাম। তাই জানি এক্সপোজারের (প্রতিবিম্ব-গ্রহণক্ষম ফলকাদি আলোকে অনাবৃতকরণের) ওপর ফটোর অদৃষ্ট নির্ভর করে। কাজেই ফটো অর্থাৎ নকল ছবি যথার্থ স্বরূপের পরিচয় না দিয়ে বরং ছায়ারই প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে'।

'ভাবধর্মী শিল্পীরা তাই ঠিক ঠিক কোন জিনিসকে রিপ্রেজেণ্ট করে (যেমনটি জিনিস ঠিক তেমনটি ভাবে আঁকে) না, তারা আইডিয়ালাইজড্ ফরম্‌কে (ভাবমূর্তিকে) পরিস্ফুট করে। শিল্প দু'রকম : রিয়ালিষ্টিক ও আইডিয়ালিষ্টিক (বাস্তব ও আন্তর অর্থাৎ ভাবপ্রকাশক)। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে কোন-কিছুকে আইডিয়ালাইজ করা যায় না। শিল্পী তাই ভাবুক ও সাধক। শিল্পও শিল্পীর ধ্যানের পরিণতি। শিল্পী কোন মানুষের ছবি আঁকে মানে সে সেই মানুষের সমগ্র জীবনকে ধ্যাননেত্রে আগে নিরীক্ষণ করে ও পরে তার প্রতিফলন করে বাইরে। ছবি তাই মানুষের আকৃতি ও গঠনের সঙ্গে হুবহু না মিলতে পারে, কিন্তু তার সমষ্টি রূপ ও পূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় দেয়'।

'এটা সত্যি যে একটি মানুষের জীবন হ'ল a sum-total of his impressions that builds up a history of whole life (তার সংস্কার বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি যা সমগ্র জীবনের ইতিহাস গঠন করে)। মোটকথা জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা-পারম্পর্যকে সাজালে যে ইতিহাস তৈরী হয় তাই হ'ল—বাইরের দিক থেকে অন্ততঃ গোটা একটি মানুষ। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন তখন মানুষের ঐ সমগ্র জীবনের ইতিহাসটাই রঙ ও তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। তাতে সেই মানুষটির সঙ্গে তার ছবি হুবহু মিলল কিনা সে খতিয়ে দেখে না। এমন কি—শিল্পী মানসচক্ষে ভিস্যুয়ালাইজ (প্রত্যক্ষ) করেন মানুষের অনন্ত অনাগত জীবন, আর তারি জন্য শিল্পজগতে তাঁরা যথার্থ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। র‍্যাফেল ম্যাডোনার কি অদ্ভুত ছবিই না এঁকেছেন! ম্যাডোনাকে তিনি ভাবচক্ষে নিরীক্ষণ করেছিলেন। ঐ একটি ছবির জন্য তিনি চিরদিন অমর হ'য়ে থাকবেন'।

'ফ্রাঙ্ক-ডোরাকও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার ফটো-দু'টিই তাঁকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। শ্রীমার ছবিকে (তৈলচিত্রকে) তিনি আইডিয়ালাইজড্ (ভাবসমৃদ্ধ ও জীবন্ত) করেছেন। শ্রীমার সমগ্র দিব্যজীবন ও মহিমা ভাবচক্ষে দর্শন ক'রে তিনি অয়েল-পেন্টিঙটি (তৈলচিত্রটি) এঁকেছিলেন। শ্রীমার ছবিখানিকে এ্যাপ্রিসিয়েট করতে (বুঝতে) গেলে তাই শিল্পীর অন্তরের ধ্যানঘন ভাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সাধারণ লোক হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, গায়ের রঙ, মিলল কিনা এই সব নিয়ে ছবি বা শিল্পের বিচার করে, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্যের জগতে ঐসব বিচারের মূল্য নিতান্ত নগণ্য'।

'শ্রীমার ছবিতে মানুষী ভাবের বদলে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, আদ্যাশক্তি ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্তি। তাঁর ছবি আঁকতে গেলে শিল্পীকে তাই অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী হ'তে হবে'। বন্ধু ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলেন। স্বামিজী মহারাজের প্রসঙ্গ শেষ হ'লে তাঁর যেন চমক ভাঙলো। তিনি জিজ্ঞাসু মন নিয়ে স্বামিজী মহারাজকে বল্লেন: 'স্বামিজী, এখন বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিন রকম পশ্চারের (অবস্থার) ছবি তোলার কথা'।

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'তখন সবেমাত্র প্রথম কোডাক ক্যামেরা মার্কেটে (বাজারে) বেরিয়েছে। বরাহনগরের অবিনাশ একটি নূতন ক্যামেরা কিনেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও কোনদিন তুলতে দিতেন না। ভবনাথ[১] অবিনাশকে ডেকে এনেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের মন্দিরে বাইরের রকের ওপর বসে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। সেই সুযোগে অবিনাশ তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট ক'রে নিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-ধ্যানস্থ বসা ছবি এখন পুজো করা হয়—ওটা ঐ সময়ের তোলা। কিন্তু ঘটনা হ'ল এই যে, পাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ভেঙে গেলে তিনি জানতে পারেন ছবি তোলা হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ক্যামেরা থেকে বার করার সময় প্লেটখানা (নেগেটিভ কাচখানি) হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় ভেঙেছিল ঠিক ওপরের (মাথার) দিকে। কাজেই প্লেটের ওপরের

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' ভবনাথের সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

দিকটা পরে অর্ধগোলাকার ক'রে কেটে নিয়ে তা' থেকে আর একটি নেগেটিভ করা হ'ল। তাই প্রিন্ট্ করা ছবিতে দেখবে যে, মাথার দিকে অর্ধচন্দ্রাকার একটা কালো দাগ আছে। সেটা অর্ধেক গোল ক'রে কাটা নেগেটিভের দাগ।'

'শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ছবি কিন্তু পারফেক্ট (নিখুঁত) হয়নি। তাড়াতাড়ি করার জন্য ছবিতে লাইট এ্যাণ্ড শেডের (আলো-ছায়ার) যথেষ্ট গোলমাল হয়েছিল। ওতে ঠোঁট-দু'টো বেশ পুরু হ'য়ে গেছে। মনে হয় যেন একটি দাঁতও নেই। কিন্তু আমরা দেখিছি তাঁর ঠোঁট মোটেই পুরু কিংবা দাঁতও ভাঙা ছিল না। তাই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতায় একজন আর্টিষ্টকে নিজে ইনস্ট্রাকশন (নির্দেশ) দিয়ে রিটাচ্ (আর একবার তুলি লাগিয়ে সংশোধন) করিয়ে নিয়েছি। অরিজিন্যাল ফটো (আসল ছবি) আমার নোটবয়ের ভেতর[২] ছিল, তা' থেকেই সংশোধন করেছি। এর কপি আমাদের মঠে (কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে) পাওয়া যায়'।

'শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় ছবি তোলা হয় রাধাবাজারে (কলিকাতা) একটি ফটোগ্রাফারের দোকানে। আমি ও

২। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অরিজিন্যাল ফটো (আসল ছবি) আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে দেখেছি। অনেক দিনের পুরাতন বলে ঐ ফটোগ্রাফটা একটু অস্পষ্ট (fade) হ'য়ে গিয়ল।

৩। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী করা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এই ছবি সম্বন্ধে অনেকে মন্তব্য ক'রে বলেন 'ঠাকুরের এই ফটো ঠিক হয় নি'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবিতকালেই এ'ধরণের মন্তব্য আমরা শুনেছি ও তাঁকে জানালে তিনি বলেছিলেন :

লাটু মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সুরেশ মিত্র মহাশয় অনেক অনুরোধ ক'রে সেবার ফটো তোলার জন্যে তাঁকে সম্মত করিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমরা দু'জনে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে রাধাবাজারে যাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে যে থামটা দেখতে পাও, ওটা আর্টিফিসিয়াল (নকল)। তিনি বার্ণিশ-করা চটিজুতো পায়ে দিয়ে কোঁচা খুলে কাপড়ের খুঁটটি কাঁধের ওপর দিয়েছিলেন। গায়ে ছিল একটা কাল রঙের হাফকোট। থামের ওপর হাত দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন'।

'অপর ছবিটি এর আগেই কেশববাবুর (নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন) বাড়ীতে (কমল-কুটিরে) তোলা। কোমর বাঁধা, এক হাত ওপরে, আর এক হাত বুকের কাছে।[৪] এই তিন রকম পশ্চারের (ভঙ্গিমা) ছাড়া আর কোন ধরণের ছবি শ্রীশ্রীঠাকুরের নেই'।

'লোকে স্বাধীনভাবে অনেক মন্তব্যই করতে পারে, কিন্তু তাদেরকে কিছু বলায় আমার অধিকার নেই। স্বচক্ষে যাঁকে দিনরাত দেখেছি, যাঁর সেবা করার সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের কিছু-না-কিছু মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কোন ঠোঁটই তাঁর বিন্দুমাত্র পুরু ছিল না, বা একটি দাঁতও ভাঙা ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠোঁট-দু'টি ছিল সুন্দর ও পাতলা। অবিনাশের ফটোগ্রাফীর কাজ খুব ভাল জানা ছিল না, তাই লাইট এ্যাণ্ড সেডের গোলমাল হয়েছিল ছবিটিতে। আমি নিজের চোখে যে'রকম দেখেছি, সে'রকম তৈরী করিয়ে নিয়েছি, এতে অপরাধ কি বলো? আমার কথায় বিশ্বাস হয় মেনে নেবে, নইলে নেবে না, যে ছবি ভালো লাগে তাকেই পূজো করবে, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। তবে যতদূর সম্ভব ছবি ঠিক ঠিক হয়, ততই ভাল'।

৪। অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত-দু'টির ভঙ্গিমার নানান রকমের ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তাঁরা বলেন—ওটি এক ধরণের মুদ্রা। যে হাতটি ওপরের

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'ফ্রাঙ্ক-ডোরাক্ নাকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ধ্যানমূর্তির ছবিও এঁকেছিলেন ?'

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা শ্রীশ্রীঠাকুরের ওই ধ্যানমূর্তির ছবি আমাদের কলকাতার মঠে আছে। সেটা এ্যানাটমিক্যালি ডিভালাপ (শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ) ক'রে দেখানো। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ফ্রাঙ্ক-ডোরাক্ পূর্ণবিকশিত ক'রে দেখিয়েছেন। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি পূর্ণবিকশিত হয় তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি কেমন হয়—এই দেখানোই ছিল ঐ ছবিটিতে উদ্দেশ্য'।

সে'দিন স্বামিজী মহারাজের সন্ধ্যায় চা-পানের একটু বিলম্ব হয়েছিল। ঘড়িতে বেজেছে প্রায় ন'টা। পুরো একঘণ্টা কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আমাদের সময় কেটে গেছে। স্বামিজী মহারাজের সেবক আর একবার দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে ইঙ্গিত জানালেন চা-পানের আয়োজন ঠিক। স্বামিজী মহারাজ শশব্যস্তে বল্লেন: 'হ্যাঁ, যাচ্ছি'। তিনি আলোয়ানটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠলেন এবং যাবার সময় বল্লেন: 'তোমরা বসো, আমি আবার এখুনি আসছি'।

দিকে আছে, তাতে ইঙ্গিত করেছেন—ব্রহ্মই সত্য, আর বুকের উপর হাতটিতে ইঙ্গিত করেছেন—এই জগৎটা কিছুই নয়, মিথ্যা। আমরা স্বামিজী মহারাজ কেন, কোন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের মুখে বা তাঁদের লেখায় এই ব্যাখ্যান কখনো শুনিনি। মনে হয়, হাতের ঐ ভঙ্গিমা বা মুদ্রার ব্যাখ্যা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই জানতেন, কাজেই ওই ব্যাপারে আমাদের নিজেদের সকল ব্যাখ্যা কল্পনাপ্রসূত।

॥ স্মৃতি ঃ আট ॥

স্বামিজী মহারাজ তাঁর ঘরে চলে যাবার পর আমাদের সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ ছবির প্রসঙ্গই চলতে লাগলো। বন্ধু ভদ্রলোকটি বল্লেন: 'ছবি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজের জ্ঞান অদ্ভুত। প্রতিভার বিকাশ সত্যই মানুষের সঙ্গে কথা কইলে বোঝা যায়'। এরই মধ্যে স্বামিজী মহারাজ হাজির হলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ' এত তাড়াতাড়ি এলেন যে? স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'ভাবলাম ব্রজের গোপীরা ব্যাকুল হ'য়ে শ্যামচাঁদের জন্যে বসে আছে, সুতরাং দর্শনটা শীঘ্রি দেওয়াই ভাল। তা'ছাড়া আমারও তো একটা common sense (সাধারণ জ্ঞান) আছে'। স্বামিজী মহারাজের কথা শুনে আমাদের মধ্যে হাসির একটা রোল উঠলো। এরই ভিতরে স্বামিজী মহারাজের মধ্যে ভাবের বেশ একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'এই common sense-ই (সাধারণ জাগতিক জ্ঞান) শেষে Divine sense-এ (পারমার্থিক জ্ঞান-এ) পরিণত হয়'।

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ তো, কিন্তু সত্যকার বুঝলে কতটুকু? এই জাগতিক ঘটি-বাটির জ্ঞানই শেষে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান দিয়ে ঘটি-বাটি জানছ, সেই জ্ঞান দিয়েই ব্রহ্মকে জানবে। জ্ঞান কি আর দু'টো? এক পারমার্থিক জ্ঞানই জাগতিক বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের জ্ঞানেও বুদ্ধিজ্ঞানের দরকার আছে। বুদ্ধি দিয়ে শুদ্ধব্রহ্মকে ধরা না গেলেও ব্রহ্মজ্ঞানের

জন্য শুদ্ধবুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বিচারই একমাত্র উপায়। জ্ঞান ছুটো নয়। একই জ্ঞান কখনো বুদ্ধিবৃত্তি, আবার কখনো বুদ্ধিভাস্য ব্রহ্ম। বুদ্ধিবৃত্তি থেকে অজ্ঞান চলে গেলে তো আর বুদ্ধি থাকে না, তখন তা' শুদ্ধজ্ঞান। একই জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। যে ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে খাচ্ছ, চলছ, ফিরছ, কথা কইছ ও জগতের সব-কিছু কাজ করছ, প্রকৃতপক্ষে সেটাই ব্রহ্মজ্ঞান। একই সমুদ্রের উপর নানান রকমের তরঙ্গ উঠছে, আসলে তারা সমুদ্রের জলেরই তরঙ্গ। তরঙ্গ জল থেকে ভিন্ন নয়। জলেরই তরঙ্গ, আবার তরঙ্গই জল। এই ভাবটি ঠিক ঠিক realize (অনুভব) করা চাই'।

সকলে চুপ ক'রে বসে শুনছি। Common sense (সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান) যে Divine sense (পারমার্থিক ব্রহ্মজ্ঞান) হয়—এ'কথার মর্মটা আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারলাম না, পারাও সহজ নয়। স্বামিজী মহারাজ আমাদের মুখের ভাব দেখে বুঝেছিলেন, তাই তিনি আবার বল্লেন: 'কেবল কথা শুনে কিংবা বই পড়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব বোঝা যায় না। জীবনে সাধন চাই। 'সাধন' মানে কৃচ্ছসাধন বা গতানুগতিকভাবে ধর্মানুষ্ঠান করা নয়। যা দিয়ে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয় তাকেই সাধন বলে। বিচারবুদ্ধি হ'ল শুদ্ধ মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির সাহায্যেই যথার্থ তত্ত্ব নির্ধারিত হয়। 'ব্রহ্মই সত্য, আর সব-কিছু অসত্য,—এই যথার্থ নির্ধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়েই হয়'।

তারপর আমাদের মধ্যে একজনের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন: 'কি বলো, ছবি-আঁকাও যা আর গান গাওয়াও তা। একটিতে রঙ দিয়ে ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয় তুলির সাহায্যে,

আর অপরটিকে সুর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় কথার সাহায্যে। দু'টো একই জিনিস; artist (শিল্পী) দু'জনেই'।

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। বন্ধু ভদ্রলোকটি একটু উৎসাহিত হ'য়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে, আপনি সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহ'লে কিছু জানেন নিশ্চয়ই'। স্বামিজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কি আর করি বলুন। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ওদেশে (পাশ্চাত্যদেশে) কাটিয়েছি অনেক দিন, জানার আগ্রহও ছিল, সুযোগও পেয়েছিলাম অনেক, কাজেই বিচিত্র বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলেছিলেন: কালে তুই সব জানবি। তাই তাঁরই কৃপায় যতটুকু শিখেছি আর কি!'

তারপর সংগীতের প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। কারু কোন বিষয় জানার বা শোনার আগ্রহ দেখলে স্বামিজী মহারাজ আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠতেন। একটির পর আর একটি ঘটনা বা আলোচনা তিনি ছবি-আঁকার মতো ব'লে যেতেন, স্পষ্টই মনে হ'ত যেন চোখের সামনে সব ঘট্‌ছে। কখনো গম্ভীর, কখনো সরস ও মধুর, কখনো বা হাস্যপূর্ণ রসিকতা, অথচ সব-কিছুর মধ্যে তাঁকে দেখা যেতো আনন্দময় পুরুষ, সরল ও শিশু-ভোলানাথ।

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'কী আনন্দের দিনই না একদিন গেছে সঙ্গীতের আলোচনা ও অনুশীলন নিয়ে। স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) গাইতেন গুরুগম্ভীর সুরে ধ্রুপদগান, আমি তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো পাখোয়াজ সঙ্গত করতাম। তখনকার প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিক মহাশয়ও স্বামিজীর সঙ্গে অনেকদিন বাজিয়েছেন। গোপাল বাবুর ছাত্রই তো প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী মুরারী বাবু। স্বামিজীর

কণ্ঠস্বর ছিল বেশ মধুর, গম্ভীর ও উদাত্ত। আমি তাঁর কাছ থেকে কয়েকখানা ধ্রুপদগান শিখেছিলাম। Copy (নকল) করার শক্তি ছিল আমার অসাধারণ। সঙ্গীত শেখার ক্ষেত্রে তাই আমি, শরৎ প্রভৃতি ছিলাম স্বামিজীর অনুচর। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) বেশ গান করতে পারতেন। তবে তাঁর গলার volume (ওজন) ছিল একটু কম, কিন্তু ভারি মিষ্টি'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলে: 'মহারাজ, সঙ্গীত হিসাবে কাদের দেশের সঙ্গীত ভাল ও scientific (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্পন্ন)?'

স্বামিজী মহারাজ: 'ভাল ও scientific (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্পন্ন) সকল দেশেরই সঙ্গীত। সকল দেশের সঙ্গীতেরই একটা ঐতিহ্য আছে। তবে প্রাচীনতার কথা নিয়ে সবার মধ্যে যথেষ্ট গণ্ডগোল আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে harmony-ই (স্বরসঙ্গিত) প্রবল। ভারতীয় সঙ্গীতে melody (রাগ)-প্রধান। তবে harmony (স্বরসঙ্গতি) বা melody (রাগ) নিয়ে সঙ্গীত বড়—কি ছোট তা' বিচার করা যায় না। Evolution-এর (ক্রমবিকাশের) দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতা এখন স্বীকৃত ও more scientific (আরও বিজ্ঞানসম্মত)। এই সে'দিনই তো একটি ইংরেজী পত্রিকায় দেখলাম যে, ফিলাডেল্ফিয়া সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রার (Philadelphia Symphony Orchestra) Conductor (পরিচালক) মিঃ লিওপোল্ড ষ্টোকোওয়াস্কি (Mr. Leopold Stokowski) পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতে সুরছন্দের (musical rhythm) রূপ এতই উন্নত সে তার সঙ্গে তুলনা করলে

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরছন্দকে ছেলেমানুষী বলেই মনে হয়[১]। তিনি আরো বলেছেন: ভারতে harmony-র (স্বরসঙ্গতির) প্রচলন এখনো হয়নি বটে, কিন্তু তবুও আমি স্বীকার করি যে, সাধারণ ভাবে সমস্ত পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীত বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু শেখার আছে।[২]

ক্রমে কথা উঠল সঙ্গীতের উৎপত্তি নিয়ে। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'অনেকের অভিমত যে, Greecian ও Indian music (গ্রীসিয় ও ভারতীয় সঙ্গীত) এই উভয়ের ভেতর যখন অনেকটা মিল পাওয়া যায়, তখন ভারতীয় সঙ্গীত গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করা জিনিস। কিন্তু এ'কথা মোটেই সত্য নয়। তোমরা আমার 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' (ভারতীয় সংস্কৃতি) বইখানা নিশ্চয়ই পড়েছ। তাতে আমি স্পষ্টই দেখিয়েছি যে, শুধু সঙ্গীত কেন—দর্শন, ইতিহাস, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও ভারতের সাংস্কৃতিক সকল উপাদানই বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়, ভারতেরই তারা নিজস্ব জিনিস'।

আমাদের বন্ধু ভদ্রলোকটি 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' বইখানির নাম এর আগে শোনেন নি। স্বামিজী মহারাজ বইখানির নাম করতে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বইখানি

১। 'I find there are rhythms in India so highly developed that they make Western musical rhythms sound childish in comparison'.

২। 'India has not yet begun to have harmony in music. * * Yet I find that in common all Western musicians, have much to learn in this matter from India'.

দেখতে চাইলেন। স্বামিজী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বইখানি আনতে বল্লেন। সে'টি আনা হ'লে বন্ধু ভদ্রলোককে দেখিয়ে তিনি বল্লেন: 'বইখানি এখান (আশ্রম) থেকে পরে কিনে নেবেন। একটা জায়গা থেকে পড়ছি শুনুন'। তিনি বইখানি খুলে পড়তে লাগলেন:

'The dawn of Aryan civilization broke for the first time on the horizon, not of Greece or Rome, not of Arabia or Persia, but of India which may be called the motherland of Metaphysics, Philosophy, Logic, Astronomy, Science, Art, Music and Medicine, as well as of truly ethical science and religion'.

'The Hindus first developed the science of music from the chanting of the Vedic hymns. The Sama-Veda was especially meant for music. And the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greeks had it. Probably the Greeks learnt it from the Hindus. It will be interesting to you to know that Wagner was indebted to the Hindu science of music, especially for his principal idea of the 'leading motive', and this is perhaps the reason why it is difficult for many Western people to understand Wagner's music. He became familiar with Eastern music through Latin translations, and his

conversation on this subject with Schopenhauer is probably already familiar to you'. ৩

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছ থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ আহার, পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকদের ভেতর সে'গুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী (Essenes) সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব

৩। 'আর্য সভ্যতার অরুণালোক ভারতের দিক্‌চক্রবালে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথম, গ্রীসে রোমে আরবে বা পারস্তে নয়। ভারতবর্ষই সকল-কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন, স্থায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সত্যিকারের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

'হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋক্‌ছন্দ থেকে সঙ্গীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ গানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিন গ্রামের প্রচলন ভারতবাসীরা জানতেন। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনিষ শিক্ষা করেছিলেন। . তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ ওয়াগণারও হিন্দুসঙ্গীতের কাছে —বিশেষ ক'রে তাঁর 'লিডিং মোটিভ'-এর জন্য ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ওয়াগ্নারের সঙ্গীতপদ্ধতির অনেক মিল আছে। এ'জন্যই বোধহয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে তাঁর সঙ্গীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্নার কয়েকটি ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন এবং জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের সঙ্গে এ'সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন'।

Self-knowledge বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায়ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয়, এসেনীরা গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা element) স্বীকার করত, তবে আকাশতত্ত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিল'।

ইতিমধ্যে স্বামিজী মহারাজকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে হঠাৎ নিজেই পাগলিনীর প্রসঙ্গ তুল্লেন। তিনি বল্লেন: 'সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মনে পড়লো আজ সেই পাগলিনীর কথা! আহা, কি অপূর্বই না ছিল তার ভাব! কি মধুর ছিল তার কণ্ঠস্বর! পাগলিনী কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তার গান শুনলে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন'।

'মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বিরক্ত হ'য়ে আমাদের বল্লেন: ও (পাগলিনী) ঘরে এলে আমার ভয় হয়, পাছে বেসামাল হ'য়ে পড়ি। কি মধুর ওর গলা, ওর গান শুন্‌লে আমার মন সমাধি-সাগরে ডুবে যায়। দেতো ওকে বাগান থেকে বার ক'রে। নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) তারপর থেকে লাঠি নিয়ে পাগলিনীকে তাড়া করতো, কিন্তু-কে কার কথা শোনে! একবার ভয় দেখাবার জন্যে কাশীপুর থানায় আমরা তাকে নিয়ে গিস্‌লাম। পুলিশ ধমক দিয়ে ছেড়ে দিলে, আর তার পরক্ষণেই সে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে গান করতে লাগল,

মা মা বলে আর ডাকিব না,
তারা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।

ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী,
(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব
মা বোলে তো আর কোলে যাব না।

কি প্রাণস্পর্শী ছিল তার গান! পাষাণও বুঝি গ'লে যেত তার গানে! গান শোনামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন'।

কথাগুলির পর স্বামিজী মহারাজ নিজেই সুর ক'রে সেই গানের শেষ কলি-দু'টি গাইতে লাগলেন,

না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব
মা বোলে তো আর কোলে যাব না।

লাইন-দু'টি তিনি বারবার গাইতে লাগলেন ও চক্ষু ক্রমশঃ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো। কিছুক্ষণ পরে তিনি বল্লেন: 'সেই যে নিরঞ্জন একদিন পাগলিনীকে বিষম তাড়া করলে, তারপর থেকে আর কোনদিন কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সে আসেনি। আহা, সে সব দিনের স্মৃতি এখনো চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে। কী মধুর ছিল সেই দিনগুলি!'

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। যেন পুরাতন কত শত স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠছিল! মুখ উজ্জ্বল ও চোখের চাহনি উদাস! সারা অফিস-ঘর নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল। কেবল দার্জিলিঙ সহরের পাহাড়ের গায়ে চিড়গাছগুলিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল তখনো তাদের চারণগান গেয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছিল, তাই চারদিকের গাছগুলোর পাতা থেকে ঝরা

জলবিন্দুর টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল। তখন রাত্রি হবে সাড়ে আট কিংবা ন'টা।

আমরা সকলে নিস্তব্ধে কেবল স্বামিজী মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। ধ্যান অতি সহজ বস্তু এ'কথাই যেন মনে হচ্ছিল। স্বামিজী মহারাজ আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্লেন: 'গিরিশবাবু কিন্তু পাগলিনীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি পাগলিনীর মধুর চরিত্র তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে অপরূপভাবে ফুটিয়েছেন; তার অমর লেখনি দিয়ে পাগলিনীকে তিনি চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটির অভিনয় দেখে যেতে পারেন নি! গিরিশবাবুর লেখা 'চৈতন্যলীলা' (২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ) নাটক-দু'টির অভিনয় তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। শুনেছি 'বিল্বমঙ্গল' লেখা যে'দিন শেষ হয় সে'দিনই নাকি শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যায়। গিরিশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্রও 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটকের ভেতর মহিমোজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছেন। একেই বলে গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, ভালবাসা ও ভক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কী চোখে তিনি দেখতেন, কতখানি ভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন—তা' মুখে বুঝানো যায় না। তিনি ভৈরবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও করুণা ক'রে তাঁর সব-কিছু ভার গ্রহণ করেছিলেন'।

পাগলিনীর প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশঃ তিনি নাট্যসম্রাট গিরিশ-চন্দ্রের কথাই কেবল বলতে লাগলেন। আমরা তাঁর কথা বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে শুনছিলাম। কি ভালবাসা

ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব নিয়েই না তিনি গিরিশবাবু সম্বন্ধে বলছিলেন। প্রাণস্পর্শী হয়েছিল তাঁর ভাব ও ভাষা। প্রতিনিয়ত তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল গিরিশবাবুর উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেনঃ 'এখনো আমাদের দেশ গিরিশবাবুকে ঠিক ঠিক চিন্‌তে পারেনি। গিরিশবাবু ছিলেন সারা বাঙ্গালীজাতির গৌরব। কেবল বাঙ্গালাদেশ কেন, সমগ্র ভারতে এতবড় original (নূতন সৃষ্টিশক্তিশালী খাঁটি) নাট্যকার জন্মায় নি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গলা-সাহিত্যের জগতে দান তাঁর অপরিসীম। তিনি নাট্যকার ও অভিনেতা দুই ছিলেন। কথা-সাহিত্যের তিনি ছিলেন যাদুকর। আর বিশেষ ক'রে পৌরাণিক নাটক-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা। তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা ছিলেন দেবী সরস্বতী। Inner inspiration (অন্তরের প্রেরণা) নিয়ে তিনি মেতে যেতেন তাঁর লেখার মধ্যে। কিন্তু দেশ এখনো তাঁর সেই প্রতিভার পূজো করতে শিখেনি ব'লে বড় দুঃখ হয়। কালে তাঁর যথার্থ আদর দেশে নিশ্চয়ই হবে'।

আমাদের পাশে ছিলেন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের একজন পরম-অনুরাগী ভক্ত। তিনি বল্লেনঃ 'মহারাজ, নাটক লেখার ভঙ্গীও ছিল গিরিশচন্দ্রের অভিনব। তিনি নিজে কলম ধরতেন খুব কম সময়। ভাবের আলোড়নের মধ্যে এ'দিকে ওদিকে পায়চারী করতেন, দু'তিন জন বসে থাকতেন তাঁর পাশে খাতা কলম নিয়ে, গিরিশচন্দ্র ব'লে যেতেন নদী-প্রবাহের মতো অনর্গল ভাষায় এক একজনের দিকে ফিরে, আর লিখে যেতেন তাঁরা সিদ্ধিদাতা গণেশের মতো, অথচ প্রত্যেকটি

plot-এর (ঘটনার) বিষয়বস্তুর ভেতর এতটুকুও দেখা যেত না সামঞ্জস্যের অভাব'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'হ্যাঁ, অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর মেধা ও প্রতিভা। তিনি ছিলেন শুধু লেখক নন—স্রষ্টা, সাধক, সংস্কারক—অনেক কিছু। ভাবের তরঙ্গে ডুবে সর্বদাই তিনি পাগলের মতো থাকতেন। অনুবাদ করার শক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। সেক্সপিয়ারের লেখা 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদই তার নিদর্শন! কত apt (সঠিক) ও correct (হুবহু শুদ্ধ) হয়েছে তার অনুবাদ। যেমন ধর—ডাকিনীরা বল্‌ছে ঃ

First Witch :

When shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain ?

Second Witch :

When the hurlyburly's done
When the battle's lost and won.

Third Witch :

That will be ere the set of sun.

First Witch :

Where the place ?

গিরিশবাবু এর অনুবাদ করেছেন,

১ম ডাকিনী। দিদিলো, বল্ না আবার
মিলবো কবে তিন বোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডা। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হার্‌বে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রণ্‌রণে।

৩য় ডা। চিকিচিকি ঝিকিঝিকি,
ডুবু ডুবু হবে চাকি,
লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা। কোন্‌খানে বোন্—কোন্‌খানে,
বোন কোন্‌খানে? ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্যে আবার ডাকিনীরা বলছে,

First Witch :

Where hast thou been, sister?

Second Witch :

Killing swine.

Third Witch :

Sister, where thou?

First Witch :

A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd, and munch'd, and munch'd :
—'*Give me*', quoth I ;
'*Aroint thee, witch* !' the rump-fed
ronyon cries, etc.

এর অনুবাদ যেমন,

১ম ডাকিনী। বোন্, কোথায় ছিলি বসে?

২য় ডা। কচি কচি শোরের ছানা চিবুচ্ছিলেম ক'সে।

৩য় ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্?

১ম ডা। শোন্, বলি তবে শোন্,—
এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায়;

চাইতে গেলুম একটি মুঠো, পাড়াকুঁছুলি মাগী,
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে বলে 'দূর হ মাগী'।
—প্রভৃতি

'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের এ'রকম কত passage-এর (অংশের) উদাহরণই না পাশাপাশি দেখানো যেতে পারে—যাতে কোন্‌টি original (ঠিক ঠিক) ও সেক্সপীয়ারের নিজের লেখা, আর কোন্‌টি অনুবাদ তা' নির্ণয় করা দুঃসাধ্য মনে হবে। কী অদ্ভুতই না ছিল গিরিশবাবুর অনুবাদ করার কৃতিত্ব!'

* * *

আমেরিকায় থাক্‌তে সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। সুবিখ্যাত অভিনেতা জোসেফ জেফার্‌সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন লেখক, বক্তা, অভিনেতা, আবার ভাল চিত্রকর। একবার গ্রীন-একারে (Green Acre) তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল নাটক সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে। তিনি 'Possibility of Drama', (নাটকের সম্ভাবনা) সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মিস্ ফার্‌মার সেই বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমাদের ফটোও তোলা হয়েছিল সে' সময়ে'।

'আর একবার মিষ্টার ভ্যান্ হ্যাগেনের সঙ্গে এ্যাভিনিউ থিয়েটারে জোসেফ জেফার্‌সনের অভিনয় দেখতে যাই। সে'দিন 'রাইভালস্' (Rivals) নামে একটি Comic-এ (প্রহসন-নাটকে) তিনি 'বন্ একার্স'-এর (Bon Acres) অভিনয় করেছিলেন। খুব সুন্দর হয়েছিল তাঁর অভিনয়। জেফার্‌সন ছিলেন আবার কালা, কাণে কিছুই শুনতে পেতেন না, অথচ play (অভিনয়) করতেন আশ্চর্য রকমের'।

'একবারের কথা, বোধহয় ইংরেজী ১৯০৫ সালে হবে, আমি মিসেস্ কেপের সঙ্গে 'হার্লেম অপেরা হাউস'-এ (Harlem Opera House) সেক্সপীয়ারের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস্' দেখ্‌তে যাই। সে'দিন বিখ্যাত অভিনেতা মিষ্টার ম্যানস্‌ফিল্ড (Mr. Mansfield) সাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। অপূর্ব ছিল তার অভিনয়ের ভঙ্গী!'

'তবে আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি এড্‌মণ্ড রাসেলের অভিনয় দেখে। 'ম্যাডিসন স্কোয়ার কনসার্ট হল্'-এ সে'দিন ছিল 'শকুন্তলা' অভিনয়। রাসেল ভূমিকা নিয়েছিলেন দুষ্মন্তের। দুষ্মন্তের ভূমিকাকে তিনি জীবন্ত করেছিলেন। 'ওয়াল্'ক্ থিয়েটার'-এ রাসেলের 'হ্যাম্‌লেট' অভিনয়ও আমি দেখেছি। কি প্রতিভাবান অভিনেতাই না তিনি ছিলেন! তাঁর অভিনয় দেখে আমার সর্বদাই মনে পড়্‌ছিল গিরিশবাবুর অভিনয়ের কথা। গিরিশবাবুর প্রতিভাকে এদেশে কেউ ঠিক চিনলে না এটাই আমার দুঃখ! বিল্বমঙ্গলে বা চৈতন্যলীলায় গিরিশবাবুর অভিনয় আমি দেখেছি। তুলনা করলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গিরিশবাবুর অভিনয়ের কোন কোন অংশ রাসেলের অভিনয়-নৈপুণ্যের চেয়ে সহস্র গুণে ভাল! কি inspired (ভাব-বিমুগ্ধ) হ'য়েই না গিরিশবাবু তাঁর ভূমিকাগুলির অভিনয় করতেন! তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমেরিকায় যখন ছিলাম তখন অনেকবার তিনি আমায় চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর শরীর যখন (১৯১২ খৃষ্টাব্দে, ১৩১৮ সালে) গেল, তখন আমি তাঁর দর্শন লাভও করেছিলাম। তিনি স্থূলশরীর (materialized body) নিয়ে আমায় দেখা দিয়েছিলেন। দেখেছিলাম—গিরিশবাবু আমার সাম্‌নে এসে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে 'থু থু' শব্দ করতে লাগলেন,

কিন্তু কোন কথা বলেন নি। তারপর তিনি বাতাসে মিশিয়ে গেলেন। বুঝেছিলাম গিরিশবাবু আর ইহজগতে নাই। জগৎটা যে তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ—এক কাণাকড়িও তার দাম নয়—এই ইঙ্গিতই তিনি 'থু থু' শব্দ ক'রে আমায় বুঝিয়েছিলেন'।[১]

১। প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত তীর্থরেণু'-তে (১ম সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠায়) এই প্রসঙ্গটি আছে।

॥ স্মৃতিঃ নয় ॥

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থাকা কালে সেখানকার বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র ঘটনার কথা অনেককে অনেকবার বলেছিলেন। আমরা সে' সবেরও সামান্য কিছু আভাস দেবার এখানে চেষ্টা করব।

আমরা তখন থেকে কলকাতায় ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নূতন স্থায়ী বাড়ীতে চলে এসেছি। রাত্রি ৮টা হবে। স্বামিজী মহারাজ আফিস-ঘরে এসে বসলেন। ঘরে আরো ছ'সাতজন বাইরের ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ কোন এক আগন্তুক ভদ্রোলোকের দিকে চেয়ে বল্লেনঃ 'এই যে, ক্যামন আছেন? এবার অনেক দিন পরে'।

ভদ্রলোক স্বামিজী মহারাজের একজন দীক্ষিত শিষ্য, জামসেদপুর থেকে এসেছেন দু'চারদিনের জন্য ছুটি নিয়ে। টাটা ওয়ার্কস্-সপে তিনি কাজ করেন। স্বামিজী মহারাজকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে শশব্যস্তে উত্তর দিলেনঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ছুটি পাওয়াই মুস্কিল। আপনার আশীর্বাদে ভাল আছি। আপনার শরীর ক্যামন এখন?'

স্বামিজী মহারাজঃ 'আমাদের আবার থাকা না-থাকা। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যেমন রাখেন আর কি। তন্ মন্ ধন্ সবই তো তাঁর চরণে সঁপে দিয়ে এখন বসে আছি পাড়ি দেবার জন্যে। বুড়ি ছুঁয়ে বসে আছি আর কি। এখন তাঁর যা ইচ্ছা, আমার নিজের কি আর বলুন'।

ভদ্রলোক নির্বাক। স্বামিজী মহারাজ আর একজনের দিকে.

চেয়ে বল্লেন: 'কি বলো, তাঁর ইচ্ছাই তো সব? আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র'।

'হ্যাঁ' বা 'না' কোন উত্তরই আমাদের মধ্যে থেকে এলো না দেখে স্বামিজী মহারাজ নিজেই অবশেষে বল্লেন: 'যতদিন না এই শরীরটা ভগবানকে দিতে পারো ততদিন 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী' এ'ভাব আসে না, আর এলেও তা' কথার কথাই হয়, অন্তরের নয়। জ্ঞানলাভ হ'লে এ' দেহটার ওপর থেকে যখন আমিত্ব বা মমত্ব বুদ্ধি চলে যায়, মিথ্যা মায়ার বাঁধন আল্‌গা হ'য়ে যায়, তখনই কেবল 'তুমি' 'তুমি' হয়, আর 'আমি' 'আমি' নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বল্‌তে গেলে এ' অবস্থার নাম— 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন বেরসিক তখন হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বস্‌লো: 'আজ্ঞে মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ তো আপনাকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য আমেরিকায় ডেকে পাঠালেন। তা' আপনি কিভাবে গিস্‌লেন?'

হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করায় আমরা বেশ একটু বিরক্তি বোধ করলাম। স্বামিজী মহারাজ কিন্তু সে'দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্‌লেন না। তিনি পূর্বপ্রসঙ্গের কথা ভুলে গিয়ে সরল শিশুর মতো স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) আহ্বানে তাঁর লণ্ডন ও আমেরিকায় যাওয়ার কাহিনী বল্‌তে শুরু ক'রে দিলেন। তিনি বল্লেন: 'হ্যাঁ, স্বামিজী আমায় ডেকে পাঠালেন লণ্ডনে যাবার জন্য। আমার কিন্তু এদেশে (ভারতে) থাকারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বামিজীর ইচ্ছাই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। তাঁর আহ্বানকে তাই মাথা পেতে নিয়েছিলাম'।

তারপর কিছুক্ষণ নির্বাক ও নিস্তব্ধ। দৃষ্টি অন্তর্মুখী। তাঁর সেই অবস্থা দেখে আমাদের কারু আর সাহস হ'ল না কোনো কথা বল্‌তে বা তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। প্রায় তিন চার মিনিট সে'ভাবেই কেটে গেল। তারপর তিনি আবার বল্লেন ঃ 'ইংরেজী ১৮৯৬ সালে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে রওনা হলাম কলকাতা আউটরাম ঘাট থেকে। এ'কথা অবশ্য তোমাদের আগেও বলেছি। রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি গুরুভাইরা সে'দিন আমায় বিদায় দিতে গিস্‌লেন। লণ্ডনে এক বছর থাকার পর ইংরেজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট শুক্রবার রওনা হলাম সাউদাম্‌পটন বন্দর থেকে নিউ ইয়র্ক বন্দরের দিকে। নিউ ইয়র্কে পৌঁছুলে ওখানকার সকলে আমায় reception (অভ্যর্থনা) দিয়েছিল বিপুলভাবে। কিন্তু হঠাৎ লণ্ডন থেকে আমেরিকায় চলে আসায় একটু বিপদে পড়েছিলাম। প্রথমে সেখানে একেবারে নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ অবস্থার ভেতর পড়তে হ'ল। ক্রমে নূতন নূতন বন্ধুরা হলেন আমার সাথী। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) তখন এদেশে (ভারতে)। একেবারে নূতন সঙ্গী ও নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়ে বেশ একটু অশ্বস্তি বোধ করেছিলাম। নানান রকম ভেবে একদিন সুদীর্ঘ একখানা চিঠিও লিখে ফেলেছিলাম স্বামিজীর নামে কলকাতায়। চিঠিটার মর্ম ছিল ঃ আমেরিকার মতো নূতন জায়গায় স্বামিজী যেন তাঁর পরিচিত বন্ধুদের চিঠিপত্র লেখেন আমাকে একটু সাহায্য করার জন্যে। কিছুদিন পরে তার উত্তরও পেয়েছিলাম। স্বামিজী লিখে পাঠিয়েছিলেন : You must stand on your own feet and struggle (তুমি তোমার নিজের

পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ কর)। উত্তর পেয়ে প্রথমের দিকে আশ্চর্য হয়েছিলাম ও শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা ও ভালবাসা সহায় সম্বল ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়ানোকে শ্রেয় মনে করেছিলাম। কৃতকার্যও হয়েছিলাম জীবনের প্রতিপদে'।

'নানান কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে গোটা ছু' মাস কেটে গিস্‌লো আমেরিকায়। হঠাৎ একদিন শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এসে হাজির হলেন আমায় দেখ্‌তে বোষ্টন থেকে নিউ ইয়র্কে। কলকাতা থেকে ওখানে আসার পর ছু'জনের ভেতর মিলন বোধহয় সেই প্রথম। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ছু'জনে কোলাকুলি করলাম আগে, তারপর ছু'জনেরই চোখে জল। আমেরিকার বন্ধুরা আমাদের ব্যাপার দেখে নির্বাক হ'য়ে গিস্‌লো'।

'শরৎ মহারাজকে বহুদিন পরে দেখে আমার পূর্বের সকল স্মৃতি তখন মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। একসঙ্গে ছু'জনে কতদিনই না আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে কাটিয়েছি! স্বামিজী আমাদের ছু'জনকে বল্‌তেন 'কালুয়া' ও 'ভুলুয়া'। শরৎ মহারাজ ও আমি একসঙ্গে পুরীতে গেছি[১] ও সেখানে এমার মঠে রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচারী বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রায় ছ'মাস কাটিয়েছি। কোনার্কের সূর্যমন্দির, চিল্কাহ্রদ, বৌদ্ধকীর্তি খণ্ডগিরি ও

১। এই ঘটনা ঘটে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে। সে' সময়ে স্বামী প্রেমানন্দও এঁদের সহযাত্রী ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 'জীবন-কথা', ৭৯ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার বর্ণনা আছে। তাছাড়া স্বামিজী মহারাজও এই ঘটনা অনেকবার আমাদের কাছে বলেছেন।

উদয়গিরি প্রভৃতি দেখতে আমরা একসঙ্গে গেছি। আর একটা মজার কথা, এখনো মনে হ'লে গা রোমাঞ্চ হ'য়ে ওঠে—আমরা একদিন যখন সম্রাট অশোকের ধৌলি-কীর্তিস্তম্ভ দেখে ফির্‌ছি, তখন একটা গভীর অরণ্যের ভেতর পড়্‌তে হয়েছিল। আমার যোগী খোঁজা বাই ছেলেবেলা থেকেই ছিল। শরৎ মহারাজকে আমি বল্লাম: চলো, এই জঙ্গলের ভেতর পাহাড়ের গুহায় নিশ্চয়ই কোন যোগী থাকতে পারেন। শরৎ মহারাজও ছিলেন আমার মতো। দু'জনে অরণ্যের ভেতর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হঠাৎ মস্ত একটা গুহার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। কৌতূহল হ'ল তার ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। কিন্তু দেখেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে বেশ মনের আনন্দে শুয়ে আছে। সে তখন ঘুমাচ্ছিল তাই রক্ষে, নইলে আমাদের দশা যে কি হ'ত তা' অনুমান করতে পারছ। দু'জনে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে চোঁচা দৌড় দিলাম একেবারে জঙ্গলের অন্যদিকে। কিছুদূর দৌড়োবার পর ওদেশের জঙ্‌লী একটি লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে লোকটা আমাদের মুখে ঘটনা শুনে বাঘিনীর একটু দুধ চাকৃতে দিয়েছিল। অতীতের কত ঘটনাই না তখন মনে হ'তে লাগল'!

আমরা অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছিলাম আর ভাবছিলাম গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের অপূর্ব ভালবাসার কথা! স্বামিজী মহারাজ চিরদিনই আপনভোলা লোক ছিলেন। বলার ভঙ্গীও ছিল তাঁর অদ্ভুত। সময়-জ্ঞানের ওপর নিষ্ঠা ছিল আবার প্রগাঢ়। তবে ব্যতিক্রমও হ'ত অনেক সময়'।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর স্বামিজী মহারাজ আমাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কিগো, এ'সব শুনতে তোমাদের ভাল লাগছে' ?

আমরা সকলে একবাক্যে বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, কষ্ট যদি আপনার না হয়, তবে—'।

স্বামিজী মহারাজ বাধা দিয়ে বল্লেন: 'না, কষ্ট আর কি বলো। এখন বলতেই কেবল ভালোলাগে। অতীত ঘটনার সবটাই যেন মিষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ আমাকে দিয়ে যতটুকু করাবার তা' প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। এখন pension (বৃত্তি) ভোগ করছি আর কি। বোধহয় সামান্য একটু বাকী আছে, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকলেই হলো।' কথাগুলির পর তিনি সরল শিশুর মতো হাসতে হাসতে আবার বললেন: 'শরৎ মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বোষ্টনে চলে গেলেন। কিন্তু তার ছ' সাত দিন পরে মিসেস হুইলার আবার মিস ওয়াল্‌ডোকে (যতীমাতা) নিয়ে তাঁর ওখানে যাবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানালেন। মিসেস হুইলার ছিলেন স্বামিজীর (বিবেকানন্দ) একজন পরমভক্ত। শরৎ মহারাজের সঙ্গেও আগে থেকে তাঁর জানাশোনা ছিল'।

'যতদূর মনে পড়ে—১১ই অক্টোবর (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ) আমরা মণ্টক্লেয়ারে মিসেস হুইলারের বাড়ীতে হাজির হলাম। শরৎ মহারাজ সেখানেই থাকতেন। মিস ওয়াল্‌ডো আমার সঙ্গে ছিলেন। ভারি আনন্দে সে'দিন সেখানে কাটলো। পরের দিন সকালে মিসেস হুইলার আমাকে ও শরৎ মহারাজকে নিয়ে মিষ্টার টমাস এডিসনের 'য়্যাম্পায়ার ইলেক্‌ট্রিক্যাল ওয়ার্কস্' দেখার

জন্ম নিয়ে গেলেন। টমাস এডিসন ইলেক্‌ট্রিক লাইট (বৈদ্যুতিক আলো), ইলেক্‌ট্রিক হিটার (বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র), ফ্যান (পাখা) ও গ্রামোফন প্রভৃতি আবিষ্কার ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। মনীষী এডিসনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন আবিষ্কারের কথা আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। সত্যই তিনি ঋষিতুল্য আপনভোলা লোক ছিলেন। খাওয়া, নাওয়া বা শোওয়ায় চিন্তা তাঁর কখনো ছিল না। নিজের ডেস্কে বসেই কাটাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো ছিল তাঁর অবস্থা। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র সমাহিত চিত্তে ডুবে থাকতেন গবেষণার কাজে। তাঁর চাকর বা বাড়ীর কোন লোক খাবার দিয়ে গেলে বেশীর ভাগ দিনই তা' ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত, হুঁস থাকতো না সময় কোথা দিয়ে চলে যেতো। একেই বলে সাধনা। কুশাসনে বা বাঘছালে বসে চোখ বুঁজলেই কি কেবল সাধনা হয়? আত্মসমাহিত চিত্তে যে-কোন বিষয়ের গভীর অনুশীলনের নামই সাধনা। ঐকান্তিক ও কঠোর সাধনা ছিল ব'লে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মনীষী এডিসন তাঁর মহিমময় জীবনে।'

টমাস এডিসনের নাম ও জীবনের কথা আমরা পড়েছি মাত্র কেতাবে, স্বামিজী মহারাজ সেই মহাযোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেছেন জেনে শোনার ও জানার কৌতুহল আমাদের আরো বেড়ে গেল। আমরা আগ্রহান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, আপনাদের দেখে তিনি আর কিছু বল্লেন না?'

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, বল্লেন বৈকি। মিসেস হুইলার

আমাদের দু'জনকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আদর-আপ্যায়ন ক'রে তিনি নিজের পাশের চেয়ারে আমাদের বসালেন। কাণে একটু কম শুনতেন বুঝলাম। তাঁর একান্ত অনুরোধে আমি 'বেদান্ত ফিলজফি' (বেদান্তদর্শন) সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বল্লাম। তিনি সবটুকু শুনলেন বেশ মনোনিবেশ সহকারে। শেষে তাঁর অমূল্য সময় আর নষ্ট করা উচিত নয় ভেবে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিসেস হুইলারের বাড়ী মণ্টক্লেয়ারে আবার ফিরে এলাম। পরের দিন বৈকালে শরৎ মহারাজ সেখানে concentration-এর (ধ্যানের) ওপর বক্তৃতা দিলেন। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) যাবার পর শরৎ মহারাজের ইংরেজী বক্তৃতা আমি সেই প্রথম শুনলাম। অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল তাঁর বক্তৃতা'।

আমরা নির্বাক হ'য়ে শুনছি দেখে তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন: 'তোমরা দেখছি একেবারে জমে গেছ। বেশ, ঐরকম জমাট বাঁধাটা ভাল। যেকোন একটা বিষয়ে এ'রকম ক'রে ডুবে যাবে, তাহলেই হ'ল। অন্তরের তন্ময় ভাবটা দরকার, তবেই ডুবতে পারবে। এ'রকম ক'রে ব্রহ্মসমুদ্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। এ'ধরণের যে কোন একটায় ডুবে পাকা হ'তে পারলে সব চুকে গেল। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়াই মুস্কিল'।

আমরা বল্লাম: 'আপনি আশীর্বাদ করুন—যেন আমরা পারি'। স্বামিজী মহারাজ: 'আশীর্বাদের দরকার হয় না, চাই তোমাদের মন। তোমরা যদি ডুবতে ইচ্ছা কর, তবেই পারবে? নচেৎ হাজারবার আমি আশীর্বাদ করলেই কি ফল হবে বলো? শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন 'তন্, মন্, ধন্ দিয়ে

ভগবানকে ডাকতে হয়'। শুধু ভগবানের বেলায় বা কেন, সকল জিনিসের বেলায়ই ঐ এক কথা। Where there is a demand, there is a supply। তোমরা যদি না চাও তো পাবে কোথা থেকে?'

আমরা: 'আপনি যখন কোন কথা বলেন, তখন আমাদের বেশ ভাল লাগে'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হাঁ, শুধু ওপর ওপর ভাল লাগলে হবে না, ডুবে যেতে হবে। যে কোন কথাই শুনবে, তাকে তলিয়ে ভেবে দেখবে, তাকে আপনার ক'রে নেবে—যাকে আত্মগত করা বলে। তার ছাঁচে নিজেকে গড়বে, তবেই শোনা সার্থক হবে। নইলে এই কাণ দিয়ে শুনলে, আর ঐ কাণ দিয়ে পরমুহূর্তে বেরিয়ে গেল। এ'রকম ভাসাভাসা শোনায় কোন ফল হয় না। তাই বলছি—ডুবতে অভ্যাস করো'।

আমরা সকলে চুপ ক'রে আছি। স্বামিজী মহারাজ আবার বললেন: 'আর একদিনের একটা আবিষ্কার দেখার কথা বলি শোন। ইংরেজী ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাস। তখন আমি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর মেম্বার মিষ্টার মিলারের সঙ্গে 'ন্যাচারল্ হিষ্ট্রি মিউজিয়ম'-এ সায়েন্স একাডেমির এ্যানুয়্যাল একজিভিশন (বার্ষিক প্রদর্শনী) দেখতে যাই। সেখানে সে'দিন লিকুইড এয়ারের (তরল বাতাসের) ডিমনষ্ট্রেসন (প্রমাণপদ্ধতির প্রদর্শন) দেখলাম। প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চে ১৪ টন হাই প্রেসার (বেশী চাপ) দিয়ে 300 degrees below zero low temperature-এ (শূন্যেরও ৩০০ ডিগ্রি নীচের কম উত্তাপে) এই সাধারণ বাতাসকে জলের মতো তরল ক'রে ফেলা হয়। সেটাই হ'ল লিকুইড এয়ার (তরল বাতাস)'।

'তারপর সেই লিকুইড এয়ারকে (তরল বাতাসকে) একটা টেবিল ক্লথে (টেবিলের ওপরে কাপড়ে) ফেলে দেওয়া হ'ল। কাপড় ভিজ্‌লো না, কিন্তু এয়ারটা (বাতাসটা) মেঘের মতো বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেল। তারপর একটা ডিম সেই লিকুইড এয়ারে (তরল বাতাসে) ফেলে দেওয়া হ'ল, ডিমটা লোহার হাতুড়ীর মতো এত শক্ত হ'য়ে গেল যে, তা' দিয়ে একটা টেবিলের বা দেওয়ালের ভেতর পেরেক মারা যায়'।

'তারপর ইস্পাতের এক টুক্‌রো ঘন বাট সেই লিকুইড এয়ারের (তরল বাতাসের) ভেতর ফেলে দেওয়া হ'ল। এক সেকেণ্ডের ভেতর সেই ইস্পাতের টুক্‌রোটা এমনই ব্রিট্‌ল (ভঙ্গপ্রবণ) হ'য়ে গেল যে, তখন একটা আঙুল দিয়েই সেই ইস্পাতের বাটটাকে টুক্‌রো ক'রে ফেলা যায়। তারপর একটা কেটলির ভেতর লিকুইড এয়ার (তরল বাতাস) দিয়ে একটা বরফের চাঁইয়ের ওপর সেটা রেখে দেওয়া হ'ল। রাখামাত্র লিকুইড এয়ারটা (তরল বাতাসটা) ফুটতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের আকারে শূন্যে মিশিয়ে গেল'।

'লিকুইড এয়ার (তরল বাতাস) কিরকম জানো? তোমাদের হাতের ওপর যদি একফোঁটা ফেলে দেওয়া হয় তবে তৎক্ষণাৎ হাতের চামড়া পুড়ে যাবে। এ'রকম কতশত আবিষ্কার বার হয়েছে, ভবিষ্যতেও বার হবে, সবই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু আসলে আশ্চর্যের বিষয় কোনটাই নয়। আমরা জানি না বলেই সে'টাকে অলৌকিক ও বিস্ময়কর বলি। আধুনিক বিজ্ঞান 'অলৌকিক'-কে লৌকিক ব'লে প্রমাণ করছে। আজ যা জানি না, বা আজ যাকে

অলৌকিক ব'লে মনে করি, কাল বা ভবিষ্যতে সেটাই আবার আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে এসে পৌঁছুবে। বিরাট প্রকৃতির বুকে এ'রকম কত শত রহস্য আছে, যে'গুলো আজ প্রকাশিত নয়, কাল হয়তো সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশ পাবে। সুদূর ভবিষ্যৎকে করবে বর্তমান, অসীমকে করবে সসীম, নূতন ও অজানাকে করবে পুরোতন ও জ্ঞানের বিষয়'।

ঠিক সে' সময়ে এক ভদ্রলোক এলেন স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি প্রণাম ক'রে বসলে স্বামিজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: 'এই যে ক্যামন আছেন? বহুদিন পরে আসা হ'ল'। জানলাম ভদ্রলোক স্বামিজী মহারাজের দীক্ষিত। দীক্ষা নিয়েছেন সাত আট বছর আগে, এই দ্বিতীয়বার তাঁর স্বামিজী মহারাজের কাছে আসা। ভদ্রলোক শশব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে, ভাল আছি, তবে কাজের ঝামেলায় এতদিন আসতে পারিনি। একটু ছুটি পেয়েছি, তাই এলাম আপনার চরণ দর্শন করতে'। স্বামিজী মহারাজ ঈষৎ হেসে বল্লেন: 'তা বেশ, বেশ, ভালই করেছেন। সময় পাওয়াই মুস্কিল, কেননা সময় আমাদের দাস নয়, সময়ের কাছেই আমাদের হাত পা বাঁধা, কাজেই সময়ের দয়া না হ'লে তো আর সময় পাওয়া মুস্কিল'।

ভদ্রলোক হাত জোড় ক'রে উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সময় করা বড় মুস্কিল'।

স্বামিজী মহারাজ বেশ একটু গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'কি জানেন, সময় পাওয়াটা মুস্কিল নয়, বরং মুস্কিল সময় পাওয়ার ইচ্ছাটাকে জাগিয়ে তোলা। Where there's a will, there's a

way, অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। আসলে সব-কিছু হওয়ার মূলে ইচ্ছাটা আগে জাগাতে হয়। সময়ই ইচ্ছার দাস। প্রবল ইচ্ছা হ'লে সময় নিজে পথ ছেড়ে দেয়। আমাদের ইচ্ছাই জাগে না তো ক্যামন ক'রে সময় হবে বলুন। অনিচ্ছার আলস্যই বরং সময় অসময়ের নানান অজুহাৎ দেখায়। জানবেন, যে যত বেশী কাজ করে তার ততো বেশী সময় হয়। সময় আমাদের দাস—না সময়ের আমরা দাস?'

দেখলাম ভদ্রলোক বেশ একটু অপ্রতিভ। তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। স্বামিজী মহারাজ একটু সকরুণ দৃষ্টি নিয়ে বল্লেন: 'আবার ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তো এখানে এলেন। আসল কথা কি জানেন, 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি'। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই আসল, তাঁর ইচ্ছা না হ'লে মানুষের সাধ্য কি ইচ্ছা করে। এ' হল' মানুষের উচ্চ অবস্থার কথা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয় এই ব'লে— 'মা আমায় অবসর দাও, সুযোগ-সুবিধা দাও ভাল কাজ করার জন্যে'। এই প্রার্থনা করা মানে আপনার পুরুষকার-রূপ শক্তির কাছে 'সাজেসশান্' (ইঙ্গিত বা প্রেরণা) পাঠানো। প্রার্থনা করা মানেই নিজের ইচ্ছার দ্বারে নক্ (knock— আঘাত) করা। যীশুখৃষ্ট বলেছেন: 'knock and the door shall be open unto you',—আঘাত করো, তাহলেই দরজা খুলবে। আঘাত থেকে ইচ্ছার স্পন্দন জাগে ও সেই স্পন্দন অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে। প্রেরণা থেকে হয় শক্তির স্ফুরণ ও শক্তির স্ফুরণে কর্মের স্পৃহা জাগে।

ব্যষ্টি ইচ্ছাকে মনে করবে সমষ্টি ইচ্ছারূপিণী বিশ্বপ্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি-সমুদ্রের আমরা ছোট ছোট এক একটি তরঙ্গ। আমাদের কর্তব্য হ'ল এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। এই তত্ত্ব বুঝলেই সময়-সুযোগ পাওয়ায় আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সমুদ্রের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দিলে ঢেউ আপনিই গন্তব্য পথে নিয়ে যায়'।

'কি জানো—ইচ্ছা থাকলে জীবনে বেশীর ভাগ সময় কৃতকার্যতা লাভ করা যায়। তবে প্রতিবন্ধকতা আসেই, কিন্তু তাই ব'লে ইচ্ছা বা কাজ থেকে সরে দাঁড়ালে চলবে না। প্রতিবন্ধকতা এলে তাকে জয় করার ইচ্ছা মনে জাগিয়ে তুলতে হয়। ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয় না। বাধাবিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার চেষ্টার নামই পুরুষকার। পুরুষকার কিনা পুরুষের নিজের প্রযত্ন বা একান্ত চেষ্টা। নিজে চেষ্টা না ক'রে আকাশে ভগবানের দিকে তাকানো হ'ল অদৃষ্টের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। এটা সব সময় ভাল নয়। জীবনে পুরুষকারের একটা স্থান আছে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) থাকার সময় ইচ্ছা করেছিলাম যে, ওদের সব-কিছু জানব ও শিখব। কৃতকার্যও হয়েছি জীবনে, শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সকল বাসনাই পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন'।

যে কোন দেশের প্রকৃতি, নিয়মকানুন, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিক জীবনকে জানতে গেলে সেই দেশের লোকদের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে হয়। একোলশেঁড়ে বা ঘরমুখো হ'য়ে বসে থাকলে হয় না। তুমি যদি নিজেরটি নিয়েই ব্যস্ত থাক,

অপরের সঙ্গে না মেশ, তবে অপরেই বা তোমার সঙ্গে প্রাণখুলে মিশবে কেন? আমি তাই ওদেশে সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশেছিলাম, ফলে ওরাও কোনদিন আমাকে বিদেশী বা অন্য জাতীয় লোক ব'লে মনে করতো না। ওরা ভাবত যে, আমি ওদেরই একজন। স্কুলে, কলেজে, ইউনিভারসিটিতে, ক্লাবে, সোসাইটীতে, থিয়েটারে, বাড়ীতে, দোকানে, গির্জায়, রেষ্টুরেণ্টে, ট্রামে, গাড়িতে, রাস্তায়—সব জায়গায়ই সকল সময় আমার বন্ধু জুটত, সঙ্গীহীন আমি কোনদিন ছিলাম না। ওদের সকল function-এ (অনুষ্ঠানে) আমার নিমন্ত্রণ হ'ত, আর সকল সমাজেই ছিল আমার অবাধ গতি'।

'আমেরিকায় ওরা আমাকে citizen (আমেরিকার নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত অধিবাসী) ক'রে নিতে চেয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম তা' আবার কি ক'রে হয়। ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার দেশ, ভারতবাসী ছাড়া অপর কোন দেশের লোক হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে আমি রাজী হবই বা কেন। সুতরাং citizenship-এর offer (আমেরিকার বাসিন্দা হওয়ার প্রস্তাব) আমি cancel (নাকচ) করেছিলাম'।

'ওদেশের (ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার) লোক যে আমায় ওদেরই একজন ব'লে মনে করত, তার নিদর্শন অনেক রকমভাবে অনেক সময় আমি পেয়েছি। এই দেখনা—কার marriage-ceremony (বিবাহ-উৎসব) হবে, আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালে। আমি তাদের বলতাম: আমি তো সন্ন্যিসি-মানুষ, বিয়ে-টিয়েতে আমাদের যেতে নেই। কিন্তু আমার কথা শোনে কে? অনেক সময় ওদের

অনুরোধ ও সম্মান রাখার জন্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমায় যেতে হ'ত'

'একবার হ'ল এক কাণ্ড। আমার বেদান্তক্লাসের এক ছেলের বিয়ে হবে। সে ধ'রে বসল আমায় যেতে হবে ও বিবাহ-উৎসবের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে হবে। আমি আপত্তি জানালাম, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। অবশেষে আমায় যেতে হ'ল তার ওখানে marriage ceremony (বিবাহ-উৎসব) অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ পরে। ওদের সকল function-এর (অনুষ্ঠানের) পোষাক-পরিচ্ছদ আবার এক রকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের পোষাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এমন কি—দৈনন্দিন ব্যাপারেও ওদের dress-এর (পোষাকের) রকমারি আছে। Morning dress-এর (সকালের পোষাকের) সঙ্গে evening বা night dress-এর (সন্ধ্যার বা রাত্রির পোষাকের) কোন মিল নেই। যাইহোক, আমি তো ছাত্রটির বিবাহ-উৎসবে গেলাম ও 'বিবাহের প্রকৃত আদর্শ' সম্বন্ধে ছোটখাট একটা lecture-ও (বক্তৃতাও) দিলাম'।

আমরা বল্লাম: 'মহারাজ, আপনি সেখানে যা বল্লেন নিশ্চয়ই তা' মনে আছে'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। আমি সহজে কোন জিনিস ভুলিনি জানবে। এখনো ছেলেবেলার প্রায় সব ঘটনাই আমার মনে আছে। আমি যাব ব'লে ছাত্রটি কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের মধ্যে পাঁচ ছ'জন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকও ছিলেন। আমি প্রথমে হিন্দুসমাজের বিবাহের আদর্শ

ও তারপর সকল বিবাহের আসল উদ্দেশ্য কি সে' সম্বন্ধে বল্লাম। হিন্দুরা যে বিবাহিতা পত্নীকে 'সহধর্মিণী' বলে, তার অর্থ ধর্মানুষ্ঠানে ও যজ্ঞে তারা নারীজাতির সমান অধিকার স্বীকার করত। হিন্দুনারী তার স্বামীর সঙ্গে একত্রে ধর্ম-আচরণ করার অধিকার পায় ব'লে নারীর নাম 'সহধর্মিণী'। বিবাহের উদ্দেশ্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সুখ-চরিতার্থ করা নয়। দু'টি আত্মার ভেতর চিরন্তন একটি পবিত্র বন্ধন বা সম্বন্ধ স্থাপন করাই হ'ল বিবাহের উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্র নারীজাতিকে জগন্মাতার প্রতিমূর্তি ব'লে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আপনাদের খৃষ্টানধর্মে কিন্তু ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা করার ঠিক ঠিক উপদেশ নেই ঈশ্বরকে মাতৃত্বের সম্মান ভারতবর্ষই প্রথম পৃথিবীতে দিয়েছে। হিন্দুরা নারীকে ঐশ্বরিক শক্তির জীবন্ত প্রতীক ও জগন্মতা ব'লে পূজো করে। নারীত্বের অবমাননাকে তারা জাতীয়তার অবমাননা বলে মনে করে। তারপর আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উদাহরণ দিলাম—তিনি কিভাবে শ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা-জ্ঞানে পূজো করেছিলেন। আমার বক্তৃতা সকলে বেশ appreciate (ভালভাবে গ্রহণ) করেছিল। বক্তৃতার শেষে সকলে—বিশেষ ক'রে অধ্যাপকরা এসে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সঙ্গে shakehand (করমর্দন) করলেন। বিবাহের কাজকর্ম শেষ হ'লে নবদম্পতী আমার সামনে নতজানু হ'য়ে বসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে। আমি হিন্দুরীতি অনুযায়ী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বল্লাম—তোমাদের উভয়ের জীবন কল্যাণময় হোক। তা' দেখ, খৃষ্টানদের

বিবাহ-অনুষ্ঠানেও আমাকে পুরোহিতের কাজ করতে হয়েছে'। এই ব'লে স্বামিজী মহারাজ উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন।

আমরাও হাসি চাপতে পারিনি। আমাদের হাসতে দেখে তিনি বল্লেনঃ 'কি বলো, স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে মানুষকে অনেক-কিছুই অনেক সময় করতে হয় বৈকি। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ',—যেদেশে যেমন আচার তা' মানতে হয়। আমেরিকায় থাকতে আমি গোড়ার দিকে pure vegetarian (পুরোদস্তুর নিরামিষাশী) ছিলাম। ক্রমাগত নিরামিষ খেতে খেতে পেটের অসুখ হ'ল, শরীর খারাপ হ'য়ে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে শ্রীমাকে (শ্রীসারদাদেবীকে) চিঠি লিখলাম। শ্রীমা তখন বাগবাজারে থাকেন। এ'সব কথা তো তোমাদের অনেকবারই বলেছি। শ্রীমা আমার চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ লিখলেনঃ 'বাবা, তুমি ওদেশের মতোই খাবে, নইলে শরীর খারাপ হবে'। সুতরাং ওদেশে (পাশ্চাত্যে) থাকতে গেলে ওদেশের সামাজিক আচারও অনেক সময় মেনে চলতে হয়'।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্বামিজী মহারাজ আবার বললেনঃ 'ওদের funeral service-এও (অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ানুষ্ঠানেও) আমি অনেকবার যোগ দিয়েছি। একবারের কথা, মিস ফিলিপ্স্ আমাকে মিষ্টার সিড্লের (Mr. Seidle) funeral service-এ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে) যোগ দেবার জন্য 'মেট্রোপলিটন অপেরা হাউস'-এ নিয়ে গেলেন। মিষ্টার সিড্ল ছিলেন রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টান ও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি তাঁর দেহটাকে কবর

না দিয়ে পোড়াবার জন্য ব'লে গিস্‌লেন। অথচ রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানদের এটা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। কোন খৃষ্টান priest-ই (পুরোহিতই) এতে যোগদান করেন নি। কাজেই ইউনিটেরিয়ান চার্চের মিনিষ্টার মিষ্টার হোয়াইট সেই service (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার-অনুষ্ঠান) পরিচালনা করেছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ ইউনিটেরিয়ান চার্চের নিয়মকানুন কি তাহ'লে রোমান-ক্যাথলিকদের সঙ্গে সমান নয়?'

স্বামিজী মহারাজ: না, ঠিক সমান নয়। ইউনিটেরিয়ান চার্চের খৃষ্টানরা একটু liberal minded (উদার মতাবলম্বী)। তাঁরা যীশুখৃষ্টকে অবতার ব'লে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, যীশুখৃষ্ট ছিলেন একজন অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন উন্নত পুরুষ। অবতার, নরক, সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ও নারী আদম ও ইভের পাপে নরনারী পাপী হয়—এ'সব মত ইউনিটেরিয়ান চার্চের খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে প্রত্যেক মানুষের ভেতর divine possiblities (দিব্যজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা) নিহিত আছে। ইচ্ছা করলে সে উন্নত হ'য়ে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। Blind faith বা অন্ধবিশ্বাস তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন—faith (বিশ্বাস) করি মানে মানুষ বা দেবতাকে প্রথমে দেখি, বুঝি ও তারপর তাদের বিশ্বাস করি। তাহলেই সকল ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিচারের প্রয়োজন হয়। ইউনিটেরিয়ান চার্চের খৃষ্টানরা তাই যুক্তি ও বিচারের পক্ষপাতী'।

'তোমরা উইলিয়াম এলারি চ্যানিঙের বোধহয় নাম

শুনেছ। আমেরিকানরা তাঁকে 'আমেরিকান লুথার' নাম দিয়েছে। চ্যানিঙ্‌ আমেরিকার (U. S. A.—United States of America) Rhode Island-এর (রোডে দ্বীপের) রাজধানী নিউপোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে calvinistic (ক্যাল্‌ভিনিষ্টিক) মত পরিত্যাগ ক'রে unitarianism (ইউনিটেরিয়ান মতবাদ) প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ বেশ উদার ছিল। আমেরিকার বোষ্টনে বোধহয় সর্বপ্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চের গোড়াপত্তন হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার নিউ ইয়র্ক সহরে ঐ চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজের হ'য়ে *World Religion Conference*-এ (বিশ্বধর্ম-সম্মিলনে) যোগদানের জন্য আমেরিকায় যান, তখন তিনি বোষ্টনের ঐ ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। ঐ চার্চেই তিনি তাঁর *Oriental Christ* (প্রাচ্যদেশীয় যীশুখৃষ্ট) নামে বক্তৃতা দিয়েছিলেন'।

এর মধ্যে মহারাজের সেবক এসে খবর দিলেন স্নানের জল দেওয়া হয়েছে। আমাদের তখন হুঁস হ'ল। বেলা প্রায় বারটা। আমাদেরও স্নান করা হয়নি অনেকের। কথায় কথায় সময়ের দিকে কারুরই হুঁস ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি ওঠবার উপক্রম করছি। সেবক তখনো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। স্বামিজী মহারাজ সেবকের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'যাচ্ছি, চল'। আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বল্লেন: আরে, বসো, হবে'খন স্নান। আমার এখনো স্নানের ঠিক সময় হয়নি। তবে তোমাদের অবশ্য দেরী হয়েছে। আর হলোই বা একদিন দেরী।

এ'দিনটা চলে গেলে একে তো আর ফিরিয়ে পাবে না। এ' রকম কত দিন কত কাজে তো চলে গেছে। আর একটা দিন না হয় ভাল কাজেই কেটে যাক। আর একটা কথা বলার পর আজকের দরবার আমাদের শেষ হবে'।

আনন্দে ও আগ্রহে আমাদের মন কিন্তু ভরে ছিল। স্বামিজী মহারাজের 'আর একটা কথা' শোনার জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব। তিনি বল্লেন: 'চার্চের মিনিষ্টারের কাজও আমাকে তু'একবার করতে হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা জানি না, কিন্তু বিচিত্র কাজ ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তিনি আমায় চালিয়ে নিয়ে গেছেন। তাতে সুবিধাও হয়েছিল অনেক। তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নাম ক'রে সকল সময় সকল কাজে লেগে যেতাম, পশ্চাদপদ কোন দিনই হই নি কখনো, বরং কৃতকার্য হয়েছি জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে'।

'আর একবারের কথা, আমেরিকা থেকে জাহাজে আমি আসছি। জাহাজে যেমন খাবার ও শোবার ঘর, আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবস্থা, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা, সাঁতার কাটার জন্য ছোট ছোট tank (চৌবাচ্চা) থাকে, তেমনি খৃষ্টানদের জন্য ছোট ছোট well-furnished (বেশ সাজানো-গুছানো) চার্চও থাকে। একদিন হ'ল কি—খৃষ্টান প্যাসেঞ্জারদের (যাত্রীদের) Service conduct (উপাসনা পরিচানা) করার জন্য মিনিষ্টার (আচার্য) উপস্থিত ছিলেন না। সে'দিন আবার রবিবার ছিল। ডেকের ওপর আমি পায়চারি করছি, এমন সময় একজন খৃষ্টান বন্ধু তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন: Swamiji, do you not know, you will have to

conduct the Service today ?' (স্বামিজী, আপনি কি জানেন না যে, আজ আপনাকে আমাদের উপাসনা পরিচালনা করতে হবে)। আমি বল্লাম : Is it ? But I do know nothing about it ! (তাই নাকি ? আমি কিন্তু এ' সম্বন্ধে কিছুই জানি না)। বন্ধু ভদ্রলোকটি বল্লেন : Yes Swamiji, your name has been given in the noticeboard (আজ্ঞে হ্যাঁ স্বামিজী, নোটিশবোর্ডে আপনার নাম দেওয়া হয়েছে)'।

'আমি তো শুনে অবাক। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি— সত্যই নোটিশবোর্ডে লেখা আছে : Rev. Swami Abhedananda will conduct the service today at 5 p. m. (শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ আজ বৈকাল ৫টায় উপাসনা পরিচালনা করবেন)। তখন Service (উপাসনা) আরম্ভ হবার মাত্র দশ মিনিট বাকী। আমি তাড়াতাড়ি আমার কেবিনে গেলাম ও Service-এর (উপাসনার) উপযোগী পোষাক পরে একেবারে Prayer-Hall-এ (উপাসনা-গৃহে) হাজির হলাম। হলে গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলে। অলটার-এর (altar— বেদীর) পাশে ছিল আমার চেয়ার। চেয়ারে বসতে সকলে বসলে। বেশীর ভাগই ছিল ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান সাহেব মেম। ঠিক পাঁচটায় Service (উপাসনা) আরম্ভ হ'ল। সমস্ত নিয়মকানুন আমার আগে থেকেই জানা ছিল। আগে কোন Service conduct (উপাসনা পরিচালনা) না করলেও Service-এর (উপাসনার) সময় বিভিন্ন চার্চে আমি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছি অনেকবার। প্রথমেই একটা গান করতে বল্লাম। একজন ইউরোপীয়ান

মহিলা অর্গ্যান বাজিয়ে Service-এর (উপাসনার) উদ্বোধন করলে। পরে বাইবেল থেকে কয়েকটা passage (অংশ) আমি আবৃত্তি করলাম। সকলে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেগুলো আবৃত্তি করলে। পরে হাত তুলে আমি সকলকে benediction (আশীর্বাদ) দিলাম, সকলে kneel-down হ'য়ে (হাঁটুগেড়ে) বসে আমার benediction (আশীর্বাদ) গ্রহণ করলে। তারপর 'বেদান্ত' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলাম। সকলে বেশ একাগ্রচিত্তে শুনলে। শেষে আর একটা গান হ'ল। আমি Service (উপাসনা) ভাঙবার আদেশ দিলাম। তখন সকলে উঠে দাঁড়ালে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি সকলেই আগ্রহান্বিত হ'য়ে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য এগিয়ে এলো। আমি সকলের সঙ্গে shakehand (করমর্দন) ক'রে আলাপ করলাম। এতদিন জাহাজে ছিলাম অপরিচিত, তখন থেকে সকলের সঙ্গেই বেশ পরিচয় হ'য়ে গেল। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। তিনি কখন কাকে দিয়ে কি করান তা' একমাত্র তিনিই জানেন। অনেক গণ্যমান্য য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকান ভদ্রলোক আমাকে অযাচিতভাবে বল্লেন: 'Swami, your process of conducting the Service is really good and new. We have not heard so learned a lecture before' (স্বামিজী, উপাসনায় আপনার পৌরহিত্য করার প্রণালী যথার্থই প্রকৃষ্ট ও অভিনব। আমরা এ'ধরণের শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাও এর আগে কখনো শুনিনি)। যাই হোক, নিজের সাফল্যের কথা শুনলে কে না আর তখন আনন্দিত হয় বলো।

'ওসব দেশে (ইংল্যাণ্ড, আমেরিকায়) কত বিচিত্র রকমের ঘটনার ভেতর দিয়েই না আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর সত্যিকারের বিশ্রাম ছিল মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা, বাকি সময় লেকচার (বক্তৃতা), ক্লাশ, লেখা, পড়া, আলাপ, আলোচনা এ'সবের ভেতর দিয়ে কেটে যেত। অসংখ্য কর্মপ্রবাহের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর আমার কেটে গেছে। কিন্তু এখন তোমাদের পাল্লায় পড়ে একেবারে অচল হ'য়ে পড়েছি। সকল বিষয় জানতে শুনতে ক'টা লোক চায় বলো ?'

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে স্বামিজী মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও একে একে তাঁকে প্রণাম ক'রে বাইরে এলাম।

* * * *

আর একদিনের কথা। আমরা পাঁচ ছ'জন ও বাইরের কয়েকজন ভক্ত তাঁর অফিসঘরে বসে আছি। তখন সকাল দশটা হবে। স্বামিজী মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। আমরা সকলে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের দেখে বল্লেন: 'আজ দিনটা ভাল। সকাল থেকে মেঘলা করায় বেশ ঠাণ্ডা'। তারপর তামাক দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে খেতে তিনি বল্লেন: 'দেখ, জীবনের অর্ধেকটা তো কেটে গেল ওদেশে (পাশ্চাত্যে)। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) জমী তৈরী ক'রে এলেন, আর আমি তাতে লাঙল দিয়ে চষে বীজ বুনে এলাম। এখন ফসল তৈরী করা তোমাদের হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর বোধহয় এ' শরীরটাকে ইস্পাত দিয়ে তৈরী

করেছিলেন, নইলে নানান ঝড়ঝাপ্টার ভেতর হাসিমুখে পঁচিশটা বছর কাটিয়ে আসা সম্ভব হ'ত না। এখন দেখ কত কি হচ্ছে ও হবে। সব তাঁরই ইচ্ছা। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র বৈ তো নয়'।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'সত্যই আমেরিকায় আপনার জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। আমাদের অনুরোধ মহারাজ, সেখানকার সব-কিছু ঘটনা আপনার লিখে রাখা ভাল, কারণ ভবিষ্যতে সে'গুলি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান হবে'।

স্বামিজী মহারাজ: 'তা তো বুঝি। কিন্তু একা আর কত করি বলো? আমার আমেরিকার নানান activities-এর (কাজকর্মের) কথা তোমাদের শুনতে তাহ'লে ভালোলাগে'।

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজ: 'ডায়েরীতে আমি সবই লিখে রেখেছি, তবে খুব short-এ (সংক্ষেপে)। আমেরিকায় থাকতে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অবাধভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। ডাঃ হিবার নিউটনের (Rev. Dr. Heber Newton D. D.) কথা তোমাদের বোধহয় আগেও বলেছি। তিনি বেশ পণ্ডিত ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মতবাদও উদার ছিল। নিউ ইয়র্কে এপিস্কোপাল ডিনোমিনেসানের (Episcopal Denomination) তিনি ছিলেন প্রধান পাদরী, আর All Soul's Church-এর ছিলেন মিনিষ্টার'।

'আমার ক্লাশে নিয়মিতভাবে রেভারেণ্ড মিঃ হাউইস (Rev. Mr. W. Hawies) আসতেন। তিনি আমায়

একটা introduction letter (পরিচয়-পত্র) দিয়েছিলেন ডাঃ হিবার নিউটনের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। আমি তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাতে তিনি পরম-সমাদরে আমায় receive (অভ্যর্থনা) করেছিলেন। কয়েক মাস তাঁর বাড়ীতে আমি অতিথিও হয়েছিলাম। স্বামিজীকে (বিবেকানন্দকে) তিনি ভ্যাখেন নি। নববিধানের রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্ম্মমত শুনে তিনি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রতি রবিবার চার্চে বক্তৃতা করতেন ও বক্তৃতার শেষে আমার ক্লাশে যাবার জন্য সকলকে অনুরোধ করতেন। নিউটনের ষ্টুডিওতে একদিন *Divinity of Jesus the Christ* সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলাম। তাঁর বন্ধু সেণ্ট বার্থোলোমিউ চার্চের (St. Bartholomew's Church) মিনিষ্টার রেভারেণ্ড ডাঃ গ্রিয়ার সেই বক্তৃতা শুনে শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। সে'সব কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে—ভুলিনি'।

'হিবার নিউটনের নিজের একটা বিরাট লাইব্রেরী ছিল। তাঁতে Christianity-র (খৃষ্টানধর্মের) বই বেশী ছিল। আমি তাঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে দিনের পর দিন ইক্লেসিয়েসটি-ক্যাল হিষ্ট্রি (Ecclesiastical History), বাইবেলের হায়ার ক্রিটিসিজম (Higher Criticism)—সব পড়তুম। ম্যাক্স-মূলারের-এর সম্পাদিত *Sacred Books of the East* সিরিজের সমস্ত ভলিউম (খণ্ড) ও সংস্কৃত ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতা তাঁর লাইব্রেরীতে রাখা ছিল। ডাঃ নিউটনের স্ত্রী আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন'।

'তোমরা অধ্যাপক জ্যাকসনের (Prof. W. Jackson) নাম আগেও শুনেছ। অধ্যাপক জ্যাকসন নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির সংস্কৃত ও ইরাণী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। একদিন মিঃ ভ্যান হ্যাগানের সঙ্গে *Brooklyn Institute of Arts and Science*-এর অধ্যাপক জ্যাকসনের লেকচার শুনতে যাই। তিনি 'বেদ' সম্বন্ধে সে'দিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। বেদ ও জেন্দাবেস্তা তিনি আগাগোড়া comparatively (তুলনা-মূলকভাবে) পড়েছিলেন। জোরোয়াষ্টারের একটা ভাল জীবনীও তিনি লিখেছিলেন। মিঃ ভ্যান হ্যাগান অধ্যাপক জ্যাকসনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, পরিশেষে বেদান্ত সোসাইটীর একজন মেম্বারও হয়েছিলেন। কলম্বিয়া ইউনিভারসিটিতে একদিন আমায় তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর ছাত্রদের সামনে আমি কালিদাসের 'শকুন্তলা' থেকে কতকগুলি শ্লোক পড়ে শোনাই। ইউনিভারসিটির প্রফেসাররা অনেকে সেখানে ছিলেন। আমার sweet intonation (মিষ্টি উচ্চারণ) শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন'।

স্বামিজী মহারাজ কি কাজের জন্য একবার হঠাৎ নিজের ঘরে গেলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে আবার ফিরে এসে বল্লেন: 'কি রকম শুনছ আমার সব বিজয়কাহিনী? কি আর করি বলো—নিজের ঢাক নিজেই বাজাচ্ছি'। তারপর হাসতে হাসতে বল্লেন: 'গরীয়সী দীনতার সঙ্গে প্রোপাগাণ্ডাও একটু ক'রে নেওয়া গেল। যাক্, শোন এখন। আমেরিকায় গ্রীণএকারে একটা বড় পাইনগাছের

তলায় বসে স্বামিজী (বিবেকানন্দ) ওদেশের শিষ্য ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেদান্তের ক্লাশ করতেন ও তাদের ধ্যান শেখাতেন। সকলে তাই সে' গাছটাকে 'Swamiji's Pine' ('স্বামিজীর পাইন') বলত। স্বামিজী এদেশে (ভারতে) ফিরে আসার পর আমিও সেই ধারা বজায় রেখেছিলাম। 'স্বামিজীর পাইন'-এর তলায় একদিন ক্লাস করছি, বিষয় ছিল *What is Vedanta* (বেদান্ত কাকে বলে), সে'দিন মিঃ রালফ ওয়াল্ডো ট্রাইন (Mr. Ralph Waldo Trine) এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন। *In Tune with the Infinite* বইখানা তাঁর লেখা। এমার্স'ন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যালয়ের (Mr. H. S. Malloy) সঙ্গেও আমার আলাপ হয়। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক এমার্স'নের (Ralph Waldo Emerson) শিষ্য ও বন্ধু। মিঃ ম্যালয় আমায় এমার্স'নের 'ব্রহ্ম' (Brahm) কবিতার কয়েকটি অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বল্লেন : আমি এই কবিতার ভাব ঠিক ধরতে পারি না। অংশটা হ'ল,

If the red slayer think he slays
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

'আমি বল্লাম, এটা ভগবদ্গীতার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এমার্স'ন লিখেছিলেন। এর অর্থ হ'ল :

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ '[১]

১। গীতা ২।১৯

তিনি শুনে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বল্লেন এতদিন পরে বুঝলাম কোথা থেকে এই মহান প্রেরণা তিনি (এমার্সন) পেয়েছিলেন'। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'এমার্সন ভালভাবে তাহ'লে গীতা পড়েছিলেন'?

স্বামিজী মহারাজ: 'পড়েছিলেন বৈকি? লণ্ডনে কার্লাইলের (Carlyle) সঙ্গে এমার্সন দেখা করতে গেলে কার্লাইল চার্লস উইলকিন্সের (Charles Wilkins) করা ইংরেজী অনুবাদ একখানা গীতা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। কার্লাইল তাঁকে বলেছিলেন: I have been inspired by the teachings of the *Bhagavat Gita*, and I hope that you will be similarly inspired by them. (ভগবদ্গীতার বাণীতে আমি সত্যই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আশা করি তুমিও এ'থেকে এ'রকম পবিত্র প্রেরণা পাবে)। গীতা পড়েই তো এমার্সন তাঁর '*Brahm*', ('ব্রহ্ম') কবিতাটি লিখেছিলেন'।

'শুধু তাই নয়, উপনিষৎও তিনি ভাল ক'রে পড়েছিলেন। তাঁর *Immortality*-রচনার ভেতর কঠ-উপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানটা প্রায় সমস্তই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। মিঃ ম্যালয় ও ডাঃ জেন্সের (Dr. L. Janes) সঙ্গে পরে যখন আমি এমার্সনের বাড়ী দেখতে যাই তখন তাঁর লাইব্রেরীতে মনুসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজী অনুবাদও দেখেছিলাম'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলে: 'অধ্যাপক রয়েস, প্রোঃ উইলিয়ম জেম্স ও প্রোঃ ল্যানম্যানের সঙ্গেও তো আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হয়েছিল বরং খুব বেশী রকমের।

অধ্যাপক রয়েসের (Prof. Royace) সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেন ডাঃ লুইস জেন্স (Dr. Lewis G. Janes)। ডাঃ জেন্স ছিলেন *Brooklyn Ethical Society*-র প্রেসিডেণ্ট ও *Cembridge Religious Conference*-এর ডিরেক্টর। ডাঃ জেন্স বোষ্টনের *Free Religious Association*-এ কিছু বলার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করেন। আমি পরের দিন সকালে *Free Riligious Association*-এ উপস্থিত হই। Hollis Street Theatre-এ আমেরিকার *Free Religious Association*-এর ৩২-তম বার্ষিক অধিবেশন ছিল। কন্টিনেণ্টের বিভিন্ন স্থান থেকে ডেলিগেটরা (সভ্যরা) তাতে যোগ দিয়েছিলেন। টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ হিগিনসন (Thomas Wentworth Higginson) তার সভাপতি ছিলেন। তিনি হঠাৎ সে'দিন অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। কাজেই ডাঃ লুইস জি. জেন্স তাঁর জায়গায় সভাপতি হন। সে'দিনের আলোচনার বিষয় ছিল *The Conception of Immortality*। হার্বার্ডের অধ্যাপক রয়েস ঐ প্রসঙ্গের প্রথম অবতারণা করেন। অধ্যাপক রয়েস এই ব'লে আরম্ভ করেনঃ 'We have no empirical foundation for a belief that so great an ill as death is to be compensated by a ressurrection'. তিনি বল্লেন Immortality-তে (আত্মার অমরত্বে) বিশ্বাস করার খুব একটা solid philosophical basis (সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি) আছে, তবে psychology (মনোবিজ্ঞান) তা' বিশ্বাস করে না। তারপরই *Psychical Research*-এর *American Society*-র অধ্যক্ষ ও কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জেম্‌স এইচ. হিসলপ (Prof. James H. Hyslop)

তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা ক'রে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ঃ 'দার্শনিক কাণ্টের (Emmanuel Kant) সময় থেকে দার্শনিকরা যে সব জিনিস experience (অনুভূতি) দিয়ে জানা বা বোঝা যায় না বিশ্বাস করতেন, *Physical Research Society* সেই সব experience (ধারণা বা অনুভূতি) এখন স্বীকার করছে। আমার মনে হয় সে'গুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে আরো ভাল হয়। তাতে আত্মার অমরত্ব-রূপ জটিল সমস্যাটিরও সমাধান হয়'।

'তারপর বক্তৃতা দিতে উঠলেন বোষ্টনের মিস এ্যানা বয়নটন টমসন (Miss Anna Boynton Thompson)। তিনি Immortality-র (অমরত্বের) ওপর transcendentalist-দের (বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের) মতবাদ উল্লেখ ক'রে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম ছিল ঃ যা দিয়ে সকল-কিছু ভাল ক'রে জানা যায় তা' হচ্ছে জ্ঞান (the consciousness as the gateway of knowledge)। ঈশ্বর uncaused First Cause (ঈশ্বর কারু দ্বারা উৎপন্ন না হ'লেও সবার কারণ) ও তিনিই সত্যকার freedom (মুক্তিস্বরূপ)।[১] ঈশ্বরকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, তিনিই একমাত্র immortal (অমর)। তাঁর মধ্যে যে সৃষ্টি করার ইচ্ছা আছে তার নাম divine vision (দিব্য-ঈক্ষণ)। সে' ইচ্ছাকে অপেক্ষা ক'রেই

১। অর্থাৎ ঈশ্বরকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই আছেন ও তিনি সকলেরই সৃষ্টির কারণ। তাঁর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করলে তবে মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন হয়।

তিনি (ঈশ্বর) বিশ্ব সৃষ্টি করেন। কাজেই be ye yourselves the Christ and ye are yourselves immortal life (তুমি নিজে খ্রীষ্টত্ব লাভ কর ও তাহলেই অমর জীবন লাভ করবে)'।

'বেশী দেরী হ'য়ে গিস্‌লো ব'লে অধ্যাপক টমসন আর বক্তৃতা দিলেন না। তিনি শ্রোতাদের সামনে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা আরম্ভ করলাম। প্রথমেই খৃষ্টানদের *Book of Ecclesiastes* থেকে প্রমাণ দিয়ে দেখলাম যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে এ'কথা খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন না। শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে আত্মাও মরে এই হ'ল তাঁদের ধারণা। কিন্তু হিন্দুরা এ'কথা স্বীকার করেন না। হিন্দুদের মতে আত্মা অজর ও অমর। স্থূল শরীরটাই ইহসর্বস্ব নয়। স্থূলের পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পর কারণশরীর। কিন্তু কারণশরীরও আত্মা নন, কারণের পর মহাকারণ। এই জড়শরীরকে যিনি অবলম্বন ক'রে আছেন তিনিই শরীরী—শাশ্বত আত্মা। তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ। It is like a circle whose centre is everywhere and its circumference nowhere[২] (আত্মা একটি বৃত্তস্বরূপ, তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত,

২। এ'কথাটি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি তাঁর *Spiritual Unfoldment* বইয়েও (পৃঃ ৬০) ঠিক এ'ভাবে উল্লেখ করেছেন: 'The soul in each individual is a centre of that circle whose circumference is nowhere but whose centre is everywhere'। অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এ'কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। নিও-প্লেটোনিক (Neo-Platonic) দার্শনিক ও মিষ্টিক সুসো (Suso) এ'

তিনি ছাড়া কোন জিনিসেরই সত্তা অনুভব করা যায় না)। ঈশ-উপনিষৎ যেমন বলেছে: 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। এই all-inclusive Spirit-ই হচ্ছেন the ultimate Reality and absolute God (এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই পরমসত্য ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম)। বিরাট বা বিশ্বচৈতন্যই জগতের সকল বস্তুকে ধারণ ক'রে সকলের কেন্দ্র-রূপে আছেন। পৃথিবীর সকল ধর্মের উদ্দেশ্য Immortality-কে (অমরত্বকে) লাভ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খ্রীষ্টানধর্ম এই পবিত্র দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত ও তার পরিবর্তে গ্রহণ করেছে কতকগুলি dogma ও belief (যুক্তিহীন অনুষ্ঠান ও অন্ধবিশ্বাস)'।

'দেখলাম অধ্যাপক রয়েস ও জেন্স আমার বক্তৃতা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। পরের দিন আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক কাগজ Boston Herald-এ (June 2, 1899) Session-র (অধিবেশনের) রিপোর্ট ও বক্তৃতার কিছু কিছু বার হয়েছে'।

'ডাঃ জেন্স আর একদিন আমায় হার্বার্ড ইউনিভারর্সিটিতে নিয়ে যান। সেখানে আমার সঙ্গে অধ্যাপক রয়েস ও

কথাই বলেছেন। মরমী সুসো কোন একটি প্রসঙ্গচ্ছলে বলেছেন: 'Sir', Suso was asked by his pupil, 'where is God? And his answer was, the Master say, God has nowhere.—God is like a circular ring, the ring's central point is everywhere, and its circumference nowhere.' (vide Dr. Hoffding: *Philosophy of Religion*, p. 45)। খৃষ্টান মরমী সেণ্ট বোনাভেনচারের (St. Bonaventure) কথায়ও পাওয়া যায়: 'God is all, and all is God. His centre is everywhere, and His circumference nowhere.' (vide W. R. Ing: *Christian Mysticism*, *p. 28*).

উইলিয়াম জেম্‌সের সঙ্গে আলাপাদি হ'ল। অধ্যাপক রয়েস ছিলেন Idealist (বিজ্ঞানবাদী) আর অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স ছিলেন Psychologist ও Pragmatist (মনোবৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষবাদী)। হার্বার্ড ইউনিভর্সিটিতে এ' ছু'জন অধ্যাপকের বেশ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ছিল। আমি যে'দিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই সে'দিনই তাঁদের আবার summer vacaction-এর (গ্রীষ্মাবকাশের) ছুটি হবে, সে'দিন তাঁদের last day of the session (ক্লাশের শেষ দিন)। আমি প্রায় একঘণ্টা অধ্যাপক রয়েসের ক্লাশ-লেকচার (ক্লাসের বক্তৃতা) শুনি ও তারপর জেম্‌সের ক্লাসে যাই। তাঁরা সারা বছরের course-টা (পাঠ) সে'দিন সংক্ষেপে ছাত্রদের কাছে আলোচনা করছিলেন। অধ্যাপক জেম্‌সের ক্লাসে যেতেই তিনি আমায় বসতে চেয়ার দিলেন। আমি সেখানেও প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। তাঁর ক্লাস শুনতে দেখে ইচ্ছা ক'রেই যেন প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক জেম্‌স অদ্বৈতবাদকে খণ্ড করতে লাগলেন। আমি তখন আর কিছু বললাম না, কেবল নোটবুকে ছু' চারটে পয়েণ্ট (বিষয়তথ্য) লিখে রাখলাম'।

'তারপর ক্লাসের শেষে অধ্যাপক জেম্‌স কাছে এসে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমায় অনুরোধ করলেন। আমি বল্লাম: আগামী রবিবার মিসেস ওলিবুলের বাড়ীতে আমি *Scriptures What do They Teach* (শাস্ত্র কি শিক্ষা দেয়) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেব। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে সে'দিন যান তবে আমার বক্তৃতার বিষয় পরিবর্তন ক'রে 'অদ্বৈতবাদ'-সম্বন্ধেই কিছু বলব।

জেম্‌স সানন্দে যেতে সম্মত হলেন। তারপর অধ্যাপক রয়েস ও অধ্যাপক জেম্‌সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ডাঃ জেন্সের সঙ্গে বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরী, ষ্টেট হাউস, কমন্স পার্ক এই সব দেখতে গেলাম'।

পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স ও অধ্যাপক জসিয়া রয়েস এ' দু'জন দার্শনিকের স্থান বেশ উচ্চে। অধ্যাপক জেম্‌স ছিলেন *Pluralism*-এর (বহুত্বের) পক্ষপাতী ও সে'দিক থেকে তিনি *Monism*-এর (একত্বের) বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা ক'রে অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু অধ্যাপক রয়েস ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদের লোক। ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও তিনি একত্বের পক্ষপাতী ছিলেন এ'কথা বলা যায়। ঐ দু'জন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের সঙ্গে স্বামিজী মহারাজের সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানার আগ্রহ আমাদের বেড়ে গেল। আমরা স্বামিজী মহারাজকে বল্লাম: 'আপনি তো অধ্যাপক জেম্‌সকে আপনার ক্লাশে আসার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন, তিনি কি এসেছিলেন ?'

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'শুধু তিনি নন, সে'দিন এসেছিলেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ল্যানম্যানও (Prof. Lanmann)। সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার বিষয়ের পরিবর্তন ক'রে *Unity in Variety* (বহুত্বের মধ্যে একত্ব) সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ডাঃ জেন্স (Dr. Janes) সে'দিন

ঐ সভার প্রেসিডেণ্ট (সভাপতি) ছিলেন। সকলকে rapt attention (সম্পূর্ণ মনোযোগ) দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনতে দেখলাম। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অধ্যাপক জেম্‌সের বক্তৃতার কথা আমার মনে ছিল। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমি একটার পর একটা প্রসঙ্গ তুলে logically (যুক্তি দেখিয়ে) তাঁর argument (বিচার) কত falacious (প্রমাদপূর্ণ) তা' প্রমাণ করেছিলাম'।

'বক্তৃতার পর আমার নির্দেশমত ডাঃ জেন্স সকলকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন: 'The Swami will be glad to answer questions if any' (যদি কারু কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে স্বামিজী সানন্দে তার উত্তর দেবেন)। অধ্যাপক জেম্‌স তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। দেখলাম তিনি তাঁর ছাত্রদের ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলছেন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। তাই তাঁর ছাত্ররাই আমাকে দু'চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর ডাঃ জেন্স হঠাৎ ব'লে উঠলেন: 'Swamiji will be very happy if Prof. James puts questions to him directly' (স্বামিজী খুব খুসী হবেন যদি অধ্যাপক জেম্‌স নিজে তাঁর প্রশ্নগুলি স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন)। তাতে অধ্যাপক জেম্‌স বল্লেন: 'This is not the place for me to ask question' (আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার স্থান এটা নয়)'।

'বক্তৃতা শেষ হবার পর অধ্যাপক জেম্‌স তাড়াতাড়ি এসে আমার সঙ্গে shakehand (করমর্দন) ক'রে বল্লেন: 'Swami, I am very glad to hear your lucid and

logical discourse on the subject of *Unity*' (স্বামিজী, আপনার একত্ববাদ সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শুনে আমি ভারি খুসী হয়েছি)। পরের দিন অপরাহ্ণে তিনি আমায় তাঁর বাড়ী যাবার জন্য আবার অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। তারপর তিনি বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন'।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'পরের দিন মিসেস ব্রকলেসবির (Mrs. Brocklesby) সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যাই। তাঁর বাড়ী ছিল নিউটনে। নিউটন বোষ্টনের একটা ছোটখাট সুন্দর গ্রাম। রাত্রিটা সেখানেই কাটালাম। তার পরের দিন' নিউটন থেকে কেম্ব্রিজে যাই। সকালে 'মট্ মেমোরিয়াল হল'-এ অধ্যাপক শেলারের (Prof Shaler) *Matter, Motion and Mind* (জড়বস্তু, তার গতি ও মন) সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। ডাঃ জেন্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমি অধ্যাপক শেলারের বক্তৃতা শুনতে যাই। অধ্যাপক শেলার ছিলেন আমেরিকার একজন বড় বৈজ্ঞানিক। দুপুরের আহারাদি সেরে ডাঃ জেন্সকে সঙ্গে নিয়ে অপরাহ্ণে অধ্যাপক জেম্সের বাড়ীতে হাজির হলাম। দেখি অধ্যাপক জেম্স অধ্যাপক শেলার, ল্যানম্যান ও রয়েসকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। ভাবলাম না জানি আজ কি বড় রকম একটা তর্কযুদ্ধই না হবে। যাহোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ ক'রে বসা গেল lunch-এ (আহারে)। অধ্যাপক জেম্স *Plurality of the Infinite*-এ (জগৎকারণ

১। ১৮৯৮ খৃঃ ৩০শে মে।

এক নয়, বহু—এই মতবাদ) বিশ্বাস করতেন তা' আগেই বলেছি। কাজেই *Unity*-র (ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এই ধারণার) বিরুদ্ধে তিনি নানান রকম যুক্তি ও বিচারের অবতারণা করতে লাগলেন। আমি অদ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁর সমস্ত যুক্তিই খণ্ডন করলাম। আমাদের আলোচনা চলেছিল প্রায় চার ঘণ্টা। চার ঘণ্টা ধ'রে অধ্যাপক জেম্‌স অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানান যুক্তির অবতারণা ক'রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর সবগুলিই আমি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন ক'রে অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করতে থাকলাম। অধ্যাপক রয়েস, ল্যানম্যান, শেলার ও ডাঃ জেন্‌স সকলেই প্রতিবারে আমার পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। অবশেষে অধ্যাপক জেম্‌স মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, অবশ্য বেদান্তসম্মত ব্রহ্ম এক, কিন্তু তিনি সে' সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করেন না'।

এই বিচারের প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের সঙ্গে অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌সের এই ধরণের একটি আলোচনার কথা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। শ্রদ্ধেয় বিনয়েন্দ্রনাথ হার্বার্ড ইউনিভার্সিতে অধ্যাপক জেম্‌সের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন জেম্‌স ক্লাসে বক্তৃতা করতে যাচ্ছিলেন। বিনয়েন্দ্রবাবুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

'You are a Monist, I daresay, because everyone from India, I take it, is; then you will be interested in what I am going to say, for I am going to criticise that position'; অর্থাৎ আপনি অদ্বৈতবাদী, এ'কথা আমি নিঃসঙ্কোচেই বলছি।

কেননা আমার ধারণা যে, ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা আসেন তাঁরাই ঐ মত পোষণ করেন। কাজেই যা আমি এখন বলতে যাচ্ছি তা অবশ্যই আপনি মন দিয়ে শুনবেন। আমি অদ্বৈত বা একত্ববাদেরই সমালোচনা করব'।

স্বামী অভেদানন্দের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী ও তাঁর বিচারের প্রণালী ছিল সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ। তাঁর *Leaves from My Diary*-তে (1898, May 30th তারিখ) তিনি এ' সম্বন্ধে লিখেছেন : 'Dr. Janes remarked to me after the discussion was over that he never heard such a learned and wonderful discussion before and that he wished that there were a stenographer to take the whole discussion in shorthand writing'.[৩]

অর্থাৎ 'অধ্যাপক জেম্‌স ও আমার ভেতর আলোচনা শেষ হ'য়ে গেলে ডাঃ জেন্স আমায় বল্লেন : এতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আশ্চর্য রকমের আলোচনা সত্যিই আমি এর আগে কখনো শুনিনি। যদি কোন ষ্টেনোগ্রাফার (সাংকেতিক লেখক) একজন এখানে আজ থাকতেন তাহ'লে সব আলোচনাটাই লিপিবদ্ধ হ'য়ে থাকত'। পরের দিন আমেরিকার বিখ্যাত কাগজ *Toronto Saturday Night*-এ এই ঘটনার সামান্য একটু বিবরণ যা প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেও আমরা জানতে পারি : 'Dr. Janes declared that he had never assisted in all his life as so

২। Vide সুরেন্দ্রনাথ দত্ত : *The Life of Benoyendra Nath Sen*, পৃঃ ১৪৬

৩। *Leaves from My Diary*, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

learned man, and brilliant and intellectual display as when after luncheon in the house of Professor James. Even Professor James was finally forced to admit that from the Swami's standpoint it was impossible to deny ultimate unity, but declared that he still could not believe it'.

অর্থাৎ 'ডাঃ জেন্স বলেছিলেন, অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌সের সঙ্গে জলযোগের সময় স্বামী অভেদানন্দ ও অধ্যাপক জেম্‌সের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, সে রকম পাণ্ডিত্য ও মনীষাপূর্ণ অনন্যসাধারণ আলোচনায় আমি এর আগে কখনো জীবনে যোগদান করিনি। * * এমন কি অধ্যাপক জেম্‌স পরিশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—যদিও এটা সত্য যে, স্বামিজীর অপূর্ব যুক্তিপ্রণালীর দিক থেকে বেদান্তে এক ও অদ্বিতীয়কে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়, তবুও আমি তা' বিশ্বাস করি না'।

স্বামিজী মহারাজ হাসতে হাসতে আমাদের দিকে চেয়ে আবার বল্লেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আমার জয়-জয়কার প'ড়ে গেল। অধ্যাপক জেম্‌স অদ্বৈতবাদ বিশ্বাস করতেন না বটে, কিন্তু তখনকার মতো আমার যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করতে পারেন নি, বরং প্রকান্তরে আমার মতকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। আসলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বোঝা ও বুঝে হজম করা বড়ই দুরূহ। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে তা' হয় না, উপলব্ধি চাই। উপলব্ধিকে বলা যেতে পারে 'চাবিকাটি'। এই 'চাবিকাটি' পেলে যে কোন দুরূহ বিষয়ই পড় না

কেন, সকলের রহস্যদ্বারই খোলা যাবে। চাবিকাটিকে standard বা গজকাটিও বলতে পার, কেননা গজকাটি হাতে থাকলে কোন জিনিস যত বড়ই হোক না কেন, তাকে ঠিক ঠিক মাপা যায়'।

স্বামিজী মহারাজ এর মধ্যে একবার তাঁর সেবককে ডেকে বল্লেন: 'ওরে, আর একটু তামাক নিয়ে আয়', (স্বামিজী মহারাজ কৌতুক ক'রে বল্লেন 'লিয়ে আয়'), বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া যাক, যা সব বড় বড় ফিলোজফারদের সঙ্গে আজ আলোচনা চলছে'। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'ছেলেবেলা থেকে আচার্য শংকরের ওপর আমার ক্যামন আকুল-করা একটা টান ও শ্রদ্ধা ছিল। এখনো সে'রকমটাই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম তাঁর নাম নিয়ে। আমি হৃষীকেশে কৈলাস-আশ্রমে গিয়ে তখনকার বিখ্যাত বেদান্তী স্বামী ধনরাজ গিরির কাছে 'শাঙ্কর দর্শন' পড়তে লাগলাম। সেটা হবে ১৮৮৯ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[৪] স্বামী ধনরাজ গিরি আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধা দেখে বলেছিলেন: 'স্বামী অভেদানন্দ? অলৌকিকী প্রজ্ঞা!' শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় যেমন বেদান্ত পড়েছি, তেমনি তা' হজমও করেছি। শুধুই মস্তিষ্ক চালনা করিনি'।

৪। ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সংকলিত 'স্বামী সারদানন্দ' পুস্তকে (পৃঃ ৫৪-৫৭) দেখা যায়, ঐ সময়ে স্বামী সারদানন্দ হৃষীকেশ থেকে কাশী চৌখাম্বায় বাবু প্রমদাদাস মিত্রকে দু'খানা পত্রে ঠিকানা দিয়েছিলেন; Swami Abhedananda, C/o Swami Dhanraj Giri, Hrisikesh,

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বল্লেন: 'ওদেশেও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে মিশলাম, কিন্তু অদ্বৈতবাদের ঠিক ঠিক ভাব উপলব্ধি করেছেন এ্যামন কাকেও দেখলাম না। অধ্যাপক ল্যানম্যান মস্ত বড় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। হুইটনীর অথর্ববেদের সমগ্র অনুবাদ উনিই edit (সম্পাদনা) ক'রে বার করেছেন। *Harvard Oriental Series*-এর ভাষ্যসহ পাতঞ্জলদর্শন, *Buddhism* প্রভৃতি গ্রন্থ তিনিই সম্পাদনা করেছেন। অধ্যাপক জেম্‌স ও ডাঃ জেন্সের সঙ্গে ল্যানম্যান একদিন তাঁর বাড়ীতে আমায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বিকালটা প্রায় সেখানেই কাটলো। তিনি তাঁর private library (ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার) আমাদের দেখালেন। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য, পুরাণ, মহাভারত, আচার্য শংকরের সমস্ত বই তাঁর লাইব্রেরীতে রাখা ছিল। তিনি আমাকে শাঙ্কর-ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্রও দেখালেন। সেই সবে মাত্র বোম্বে নির্ণয়-সাগর প্রেস থেকে নাকি বইখানা আনিয়েছেন, সোনার জলে নাম লেখা ঝক্ ঝক্ করছে দেখলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: 'Have you read them? (আপনি কি এগুলি পড়েছেন?)। আমি বল্লাম: Yes, (হাঁ, পড়েছি)। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'Can you understand *Sankara-Bhasya*' (আপনি শঙ্করভাষ্য বুঝতে পারেন)? I answered in the affirmative (আমি বল্লাম হাঁ,—পারি)'। তখন তিনি একটা অঙ্গুলির দ্বারা (তর্জনী) মাথার ওপর আঘাত করতে করতে বল্লেন: 'But my brain cannot understand it'.

(কিন্তু আমার মাথায় ওটা কিছুতেই প্রবেশ করে না)। আমি বল্লাম: 'You need a *Guru*—preceptor who would have given you the key to open the secret door of your *Buddhi*, the faculty of understanding, to realize the spiritual oneness of Vedanta' (আপনার একজন গুরু দরকার—যিনি আপনার বুদ্ধির ঐ গুপ্ত দরজা খুলে দেবার চাবিকাটি দিতে পারেন। বুদ্ধিই একমাত্র শক্তি যার সাহায্যে বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়)। হাজার হোক পণ্ডিত তো, আমার কথা অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে তিনি বল্লেন: 'You were lucky to get such a *Guru*' (আপনি ভাগ্যবান, কেননা এখন একজন ধর্মগুরু আপনি পেয়েছেন)। অধ্যাপক ল্যানম্যান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমার মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তারপর থেকে দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন'।

পরে নানান কথাবার্তার পর আমি হিতোপদেশের এই শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে শোনালাম। শ্লোকটি হ'ল,

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো
বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীর-
মিবাম্বুমধ্যম্ ॥

সংস্কৃত ভাষা বেশ বুঝতে পারতেন, আর ঐ শ্লোকটিও তিনি জানতেন। তিনি শুনে বল্লেন: 'How is it possible for a swan to drink the milk and

leave water as it is mentioned in that verse I cannot understand. What does it mean?' (দুধ আর জল একসঙ্গে মিশানো থাকলে একটা হাঁস জলটা ফেলে শুধু দুধটাই বা ক্যামন ক'রে খায় এ' অর্থটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না)। আমি বল্লাম: জলচর পক্ষীদের মুখে এক রকম acid (অম্ল) থাকে যাতে ক'রে দুধকে তারা জল থেকে আলাদা করতে পারে। অধ্যাপক ল্যানম্যান আমার ব্যাখ্যা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লেন: 'How corroct and wonderful the illustration is! (দেখছি উদাহরণটি কত সঠিক ও আশ্চর্য রকমের)। তারপর থেকে অধ্যাপক ল্যানম্যান আমার চিরদিনের বন্ধু হ'য়ে গিস্‌লেন। বোষ্টনের ক্লাশে (আলোচনা-সভায়) তিনি নিয়মিতভাবে আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন। বেদান্ত সোসাইটীর তিনি অনারারী মেম্বারও হয়েছিলেন'।

পরে স্বামিজী মহারাজের ডায়েরীতেও আমরা এ' ঘটনাটি লিপিবদ্ধ দেখেছি। ইংরেজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন মাসের *The Milk-drinking Hansa of Sanskrit Poetry* প্রবন্ধের প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যানম্যানও তাঁর ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন:

'Swami Abhedananda * * * calling at my study last week * * had explained the hansa-fable * * by saying * *. The Swami's theory seems to be essentially like that of Sayana' (গত সপ্তাহে স্বামী অভেদানন্দ আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি হংস সম্বন্ধে শ্লোকটি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

তাঁর ব্যাখ্যা ভাষ্যকার সায়ণের মতই সারবান ব'লে মনে হ'ল)। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর ডায়েরীতে এ'কথারও উল্লেখ করেছেন।

লণ্ডন ও আমেরিকার বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের প্রায় সকলের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। পঁচিশ বছর ওদেশে থাকার সময় বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্মকুশলতার প্রশাংসা নানাভাবে ছাপা হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত *Toronto Saturday Night* পত্রিকার সম্পাদক একবার লিখেছিলেনঃ '* * A noted Professor of Columbia University has said that he considers Abhedannda to have the most brilliant philosophical mind to be found anywhere in the world today. * * Swami Abhedananda has met in philosophical discussion, practically all of the most prominent men of America. He has lectured before the Universities of Columbia, Cornell, California and Harvard. * *'; অর্থাৎ কলম্বিয়া বিশ্ববিত্তালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন তিনি মনে করেন যে, বর্তমান জগতে স্বামী অভেদানন্দ একটি শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও বুদ্ধিমান মনের অধিকারী * * * স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার প্রায় সকল শ্রেণীর বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনের বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিচার করেছেন। কলম্বিয়া, কর্ণেল, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিত্তালয়েও তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন'।

স্বামী অভেদানন্দের অন্যতম বন্ধু ছিলেন জার্মান-মনীষী ম্যাক্স-মূলার। পল ডয়সন, ল্যানম্যান, রয়েস, উইলিয়াম জেম্‌স, জ্যাকসন, পার্কার, হাউইসন, ডাঃ জেন্স, রেভারেণ্ড হিবার নিউটন, রেভারেণ্ড বিশপ পটার, ডাঃ বেন্‌সফোর্ড, কর্ণেল হিগিনসন, শেলার, রাল্‌ফ ওয়াল্ডো ট্রাইন, এইচ. এস. ম্যালয়, ডাঃ রস্‌, রেভারেণ্ড ডাঃ গ্রিয়ার, ডাঃ বাটার, বিখ্যাত অভিনেতা জোসেফ জেফার্সন, মাদাম কাল্‌ভে, ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড পিৰ্ক, রাসেল, ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড রল্‌ডফ গ্রস্‌ম্যান, টেলর, ডাঃ স্মিথ প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গেও স্বামিজী মহারাজের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। স্বামিজী মহারাজের পূর্বেকার গল্প এখনো শেষ হয় নি, তাই তিনি বল্লেন: 'অধ্যাপক হার্সেল পার্কারের (Prof. Harshel C. Parkar) সঙ্গেও আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। একদিন সকালে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। ডাঃ সেথ্‌ লো (Dr. Seth Low) তখন ঐ ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেণ্ট। অধ্যাপক পার্কার প্রথমে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বিরাট লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেলেন। অসংখ্য রকমের বই দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। বেদ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ ও হিন্দুশাস্ত্রের সকল রকম বই লাইব্রেরীতে দেখলাম। অধ্যাপকরা সকলেই আমাকে তাঁদের সঙ্গে একদিন luncheon (জলযোগ) করার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি সাদরে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। লাইব্রেরীতে ডাঃ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন-চেয়ার সযত্নে রাখা ছিল দেখলাম। অধ্যাপক পার্কার আমায় সেই চেয়ারে বসার জন্য অনুরোধ

করলেন। এটি সভায় বিশিষ্ট অতিথির প্রতি বিশেষ সম্মানদর্শনের নিদর্শন। বাধ্য হ'য়ে তাঁর অনুরোধ আমায় রাখতে হ'ল। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিকের আসনে বসতে পেয়ে নিজেকে সত্যই সেদিন ধন্য মনে করেছিলাম'।

'অধ্যাপক হাউইসনের কথাও তাই। একদিন বিকালে ডাঃ লোগান্সের ভাইয়ের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হাউইসনের বক্তৃতা শুনতে গেলাম। সে'দিন আলোচনার বিষয় ছিল John Fiske's *Through Nature to God* (জন ফিস্কের 'প্রকৃতির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের পৌঁছানো')। বক্তৃতার পর তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। 'বেদান্ত' সম্বন্ধেও আলোচনা হ'ল। দেখলাম আলোচনার পর তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন ও আগামী বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির *Philosophical Union*-এ (দর্শন-সংস্থায়) 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমায় অনুরোধ করলেন। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম ও তাঁর অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহারে সে'দিন অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম'।

'প্রায় একমাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার) আমি ডাঃ রস্ ও ডাঃ লোগান্সের সঙ্গে *Fraternity Home*-এ (ভ্রাতৃসঙ্ঘে) আহারাদি সেরে সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত হলাম। যেতেই অধ্যাপক হাউইসন সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাত্রি ৮টার সময় আমি *Philosophical Union*-এ (দর্শনসঙ্ঘে) 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে

দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিলাম। সমস্ত লেকচার হল্ (Hall) শ্রোতায় packed up (ভর্তি) ছিল। বেশীর ভাগ ছিলেন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অধ্যাপকরা। বক্তৃতার শেষে অধ্যাপক হাউইসন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমার করমর্দন করলেন'।

উল্লেখযোগ্য বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির *Philosophical Union*-টি অধ্যাপক হাউইসনের কীর্তি-বিশেষ। ইংরেজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক রয়েস এই *Union*-এ তাঁর বিখ্যাত *The Religious Aspect of Philosophy* বিষয়ের বক্তৃতা দেন। পরে এ'টি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার তিন বছর পরে ইংরেজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স *Principle of Pragmatism* সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক প্রাইসের (Prof. Price) *Pragmatism* (বাস্তববাদ) অবলম্বন ক'রেই তিনি এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক প্রাইস্ কুড়িবছর আগে তাঁর মতবাদটি পাশ্চাত্য জগতের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। অধ্যাপক জেম্স প্রাইসের সেই মতবাদটি আবার নূতন ক'রে ব্যাখ্যা করেন। *Principle of Pragmatism* বক্তৃতাটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক জেম্সের বক্তৃতার তিন বছর পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক হাউইসনের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ *Vedanta Philosophy* (বেদান্ত-দর্শন) সম্বন্ধে প্রায় চারশত আমেরিকার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাসেবীদের সামনে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা দেন।[১]

১। এই ঘটনার সমর্থন পাই আমরা *Vedanta and the West.* (first published, January-February, 1956) পত্রিকায়
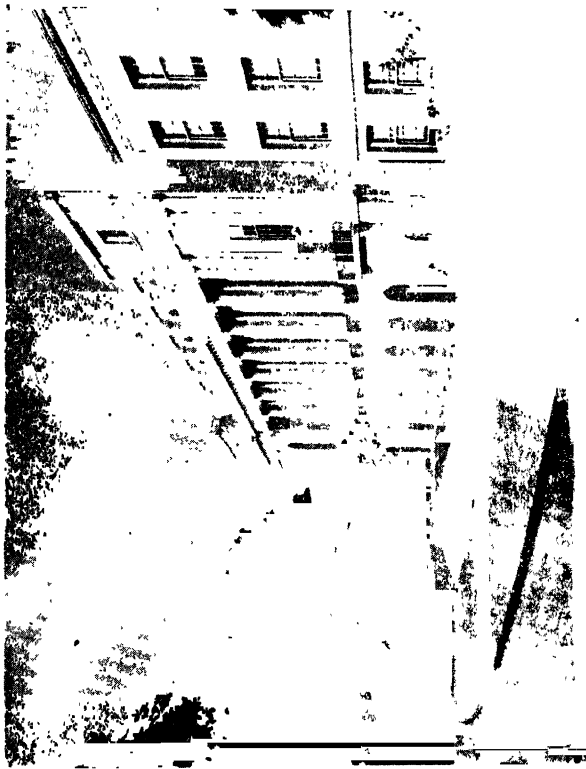
॥ হুইলার হল্ ॥ (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

। এখানে স্বামী অভেদানন্দ ফিলোজফিক্যাল ইউনিয়নে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্ত ফিলজফি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ।

অধ্যাপক হাউইসন ॥

॥ অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ ॥

॥ অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস ॥

॥ এ্যাপেলাচেন মাউন্টেন ক্লাবের সভ্যগণ ॥

ন : প্রোঃ পার্কার, স্বামী অভেদানন্দ, এইচ হো, লুইস জি জেনস্, জিগলার হোয়াইট, ক্রেঞ্চ, নিউহল, হাইন্স, মিসেস নাইলস, নিউকোম্ব, ব্রাউন, মিস সাণ্ডারসন, ফ্যানক্রেড, জিগলার, মিস জেনিসন, হুইটম্যান, মিস বিনল, মিসেস লুস, হোয়ে, জন্ রিচে প্রভৃতি।

স্বামিজী মহারাজ পূর্বপ্রসঙ্গ অনুসরণ ক'রে আবার বল্লেন: 'আমেরিকার কথায় আজ সকল ঘটনাই যেন স্মৃতিপথে ভেসে উঠছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে (বার্কলে) *Philosophical Union*-এ বক্তৃতার মতো আর একটি স্মরণীয় বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। তখন স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) দ্বিতীয়বার আমেরিকায় পদার্পণ করেন (সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে)। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে সে'দিন (ইংরেজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর, বুধবার) অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের *Memorial Meeting*-এ (স্মারক সভার অধিবেশন) ছিল।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ বেদান্ত প্রেস হলিউড ২৮, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে: 'The Professor Howison who appears to have been chairman of the meeting, at which the lecture was given, was G. H. Howison, who taught philosophy at the University of California from 1884 to 1909 and was a philosopher of note in his days Announcements from old newspapers indicate that the lecture was scheduled for a special meeting of the Philosophical Union in a lecture room of the Philosophy Building of the University of California at Berkeley at 8: 00 P.M. on September 6, 1901. No report of the lecture itself has been found, however, since it was on this same day that President William Mckinley was assassinated, the papers thereafter for some time being mostly given over to news of this event' (Vide pp.62-63)। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *Leaves from My Diary*-গ্রন্থেও এ'কথার উল্লেখ করেছেন।

ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু আমি সে' সভায় উপস্থিত ছিলাম। অধ্যাপক জ্যাকসন, অধ্যাপক বাটার ও অন্যান্য অধ্যাপকরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ সেথ লো প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার আগের দিন (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই নভেম্বর, মঙ্গলবার) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ছিল। নির্বাচনে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রিপাবলিক্যান (Republican) দলের নেতা উইলিয়াম ম্যাককিনলি ও ডেমোক্র্যাট দলের নেতা মিষ্টার ব্রায়ন। ম্যাককিনলিই জয়লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের স্মৃতিসভায় আমাকে ভারতের পক্ষ থেকে কিছু বলতে হয়েছিল। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলার যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এ'কথা ঐ সভায় আমি বল্লাম। আমার সে'দিনের বক্তৃতা অবশ্য খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ হয়েছিল'।

কোন একটি কাজের জন্য স্বামিজী মহারাজ একবার নিজের ঘরে গেলেন ও এক মিনিট পরেই ফিরে এসে হাসতে হাসতে আবার বল্লেন: 'তবে একবার বেশ মজা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক কনফারেন্সে (*N. Y. Conference of Religion*) 'ধর্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময়। কনফারেন্সটি হয়েছিল নিউ ইয়র্ক এ্যাসেমব্লি হলে (Assembly Hall)। বেলা এগারটা থেকে কনফারেন্স আরম্ভ হ'ল। কনফারেন্সের বিশেষ আয়োজন করেছিলেন খ্রীষ্টান পাদরী ও ক্লার্জিম্যানরা (Christian fathers and clergymen)। ইউনাটেড ষ্টেটের সমস্ত চার্চের বড় বড় নামকরা পাদরীরা সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভারতবর্ষীয় ধর্মযাজকদের

প্রতিনিধি হিসাবে। সকলে আমাকেই অধিবেশন open (আরম্ভ) করার জন্য অনুরোধ করলেন। কনফারেন্সে আলোচনার বিষয় ছিল *Religion is the Life of God in the Soul* ('আত্মার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর আত্মাই ধর্ম')। কতকগুলি central point (প্রধান বিষয়) নিয়ে আমি দশ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে আলোচনা open (আলোচনার অবতারণা) করলাম।[২] তারপর দেখি—সমস্ত চার্চের পাদরীরা একে একে আমার বক্তৃতার সূত্র ধরে আলোচনা করলেন। বলতে গেলে সে'দিন আমি prominent part (প্রধান ভূমিকা) play করেছিলাম আর কি। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা! ওদেশের পাদরীরা আমায় ওদেরই অন্তরঙ্গ একজন ব'লে মনে করতেন'।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারটা। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'এবার তোমরা এসো, এখানেই আজ সভা ভঙ্গ করা যাক'। আমরা প্রণাম ক'রে নীচে এলাম।

২। স্বামিজী মহারাজ তাঁর *Leaves from My Diary*-তে তদানীন্তন পত্রিকার মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন। তাতে উল্লেখ আছে: 'Date 21. 11. 1900. Place: Assembly Hall, 109E, 22nd Street, near Fourth Avenue, New York. New York Great Religious Conference. Present: Many eminent Clergymen and Ministers of New York and Swami Abhedananda. Subject: *The Religion is the Life of God In the Soul.* Swamiji was requested by all present to initiate the debate. He spoke for 10 minutes about the main theme'.

॥ স্মৃতি ঃ দশ ॥

যতদূর মনে পড়ে সে'দিন ছিল বৃহস্পতিবার, কিন্তু ইংরেজী বা বাংলা কোন সালের কথা মনে নেই। সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর আমরা কয়েকজন স্বামিজী মহারাজের আফিস-ঘরে গিয়ে বসলাম। আগন্তুক অনুরাগী ভদ্রলোকও দু'চারজন ছিলেন। রাত্রি তখন আটটা—কি সাড়ে আটটা হবে। স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ পরেই গায়ে চাদর দিয়ে অফিস-ঘরে প্রবেশ করলেন। মাথার টুপি ও কাপড়-চোপড় সব নূতন রঙ করা। খুব সাদাসিদে পোষাক হ'লেও সে'দিন তাঁকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা মনে মনে এ'কথাই চিন্তা করছিলাম। চেয়ারে বসার আগে তিনি সহাস্যে বল্লেনঃ 'দেখ দিখিনি, সেজেছি ক্যামন ? কি রকম মানাচ্ছে বলো' ?

আমরা বল্লামঃ 'মহারাজ, খুবই সুন্দর। আমরাও ঠিক এ'কথাই ভাবছিলাম এখুনি।

স্বামিজী মহারাজঃ 'ও, তাই নাকি ? তাহলে আমি thought reading (মনের কথা পড়তে) জানি বলো'।

পাশ থেকে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক ভক্তির আতিশয্যে ব'লে উঠলেনঃ 'তা আর হবে না মহারাজ, আপনারা যে অন্তর্যামী'।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী মহারাজের মধ্যে একটু ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি চিরদিনই ছিলেন স্পষ্টবক্তা। সোজাসুজিভাবে কথা কওয়াই ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস, ও তার জন্য অনেকে তাঁকে ভুলও বুঝেছেন অনেক দিন,

আবার অনুতপ্তও হয়েছেন অনেক সময় তাঁর প্রাণের সারল্য ও অকপট ভাব জানতে পেরে।

এবারেও হ'ল তাই। খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকার পর তিনি ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: 'আপনাদের ভক্তির ঠেলায় আমি আর বাঁচি না মশায়। আপনারা যুক্তি-বিচার জিনিসটাকে ভক্তির রাজত্ব থেকে একেবারে বাদ দিতে বসেছেন দেখছি—যেটা মোটেই ভাল নয়। আপনাদের বোঝা উচিত যে, সব কাজ ফেলে সারাদিন সমাধিস্থ হ'য়ে বসে থাকা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা কি গণক্কার (গণৎকার)—না বাজীকর যে আপনাদের অন্তরের কথা জানার জন্য সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকবো?' ভদ্রলোক বেশ অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে না মহারাজ, আপনারা যে মহাপুরুষ, তাই'।

স্বামিজী মহারাজ বালকের মতো হাসতে হাসতে বল্লেন: 'দেখুন, ওসব কথা রাখুন। মহাপুরুষ সকলেই। আপনিও কি কম? নিজেকে শক্তিহীন ভাবছেন কেন? নিজেদের শক্তিহীন ভেবেই তো সারা দেশটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। সমস্ত জাতিটা self-hypnotised (আত্ম-সম্মোহিত) হ'য়ে ক্রমাগত আপনাদের ভাবছে—আমরা কিছু নই, দুর্বল। আপনারা সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান, সকলের মধ্যে সেই এক অন্তর্যামী পুরুষ আছেন। 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব'—তিনি এক হ'য়েও বহুরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে প্রকাশ করছেন। নিজেকে কখনো দীন-হীন দুর্বল ভাববেন না। সকলেই অমৃতের সন্তান—এটা সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করুন। এই চেষ্টার নামই সাধনা'।

ভদ্রলোক ঃ 'তা আর বুঝতে পারি কই মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'বোঝবার চেষ্টাই বা কে ক'রে বলুন। চেষ্টা করলে ভগবানই সাহায্য করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—তুমি এক পা এগিয়ে গেলে ভগবান দশ পা এগিয়ে আসেন। নিশ্চেষ্ট লোকের ধর্ম হয় না, কর্ম বা সাধনও হয় না। 'তীব্রসম্বেগানং আসন্নঃ'—তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা থাকা চাই। আমি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এটা বুঝতে চায় ক'জন? ইন্দ্রিয়রা সাধারণতই বহির্মুখী। কিন্তু তাদের অন্তর্মুখী করা চাই। কঠোপনিষদে আছে,

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

ইন্দ্রিয়রা বাইরের বিষয়বস্তু নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা মেতে আছে, সুতরাং অন্তরাত্মাকে কখন আর দেখবে বলুন? রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ 'ঘুড়ি লক্ষের দু'টো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপাড়ি'। কথাটা খুবই সত্যি। কোন কোন ভাগ্যবান জ্ঞানী বাইরের চাকচিক্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অন্তরাত্মাকে জানেন ও শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন। ধ্যান ধারণা দ্বারা সমাহিত চিত্ত হ'লে তবে পরমাত্মাকে দর্শন কিনা উপলব্ধি করা যায়। দর্শন তো আর এই পার্থিব চক্ষু দিয়ে হয় না, জ্ঞানচক্ষু দরকার। জ্ঞানচক্ষু হ'লে সাধক নিজেই পরমাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মা ও তার মধ্যে কোন ভেদ নেই—এই তত্ত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারে। এর নামই আত্মাকে জানা কিনা আত্মজ্ঞান। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের মন পার্থিব

জিনিসের মায়াতে আবদ্ধ, ক্ষণিক ভোগের সুখকেই তারা বড় ব'লে মনে করে। তাই সাধন-ভজনে নিষ্ঠা চাই, ভগবৎপ্রেম যাতে আসে তার চেষ্টা করতে হয়। মীরাবাঈ বলেছেন: 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা'। নন্দলালা প্রেমস্বরূপ ভগবান। তাঁকে পেতে, জানতে বা বুঝতে গেলে নিজেকে প্রেমিক নয়—প্রেমময় হ'তে হয়। নইলে আপনি অন্তর্যামী বা মহাপুরুষ বল্লে কি হবে। নিজে কিছু করুন, তবে তো সত্যকার অন্তর্যামী বা মহাপুরুষ কাকে বলে জানতে পারবেন। নিজে কিছু করবো না, কেবল মুখে দু'চারটে ভক্তি বা জ্ঞানের বুলি আওড়াব—তাতে কি হয়?'

তিনি পুনরায় বল্লেন: 'অন্য পরে কা কথা, এই সব সাধু-ব্রহ্মচারীদেরই কি কম কঠোরতা করতে হয়! শুধু গেরুয়া পরলেই তো সাধু হওয়া যায় না, সাধন-ভজন চাই, নিষ্কামভাবে লোকের কল্যাণের জন্য কর্ম করা চাই, তীব্র ব্যাকুলতা চাই। পাছে ভোগে আসক্তি আসে ও ভগবানের ওপর বিশ্বাস ভক্তির অভাব হয়, তার জন্য শাস্ত্র সন্ন্যাসীদের তীর্থভ্রমণের উপদেশ দিয়েছে। 'রমতা সাধু বহতা পানি, না মৈল লখানি'—যে জল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, চলমান হয়, সে জলে কখনো ময়লা থাকে না। সাধুদের বেলায়ও তাই। যে সব সাধু দেশ-বিদেশে নানান তীর্থে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মনে আত্মনির্ভরতা আসে, মন নির্মল হয়। তাছাড়া দেশভ্রমণের আর একটা উপকারিতা হ'ল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'লে নিজের মনের মধ্যে compare (তুলনা) করার একটা শক্তি বা প্রবৃত্তি জাগে।

Comparative (তুলনামূলক) জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান পাকা হয় না। কিন্তু তাই ব'লে তীর্থভ্রমণের নেশা আবার ভাল নয়। কোন কাজ করবো না, তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের নাম ক'রে সারাজীবন এখানে-সেখানে কেবল ঘু'রে বেড়াব—এটা মোটেই ভাল নয়। এজন্য সাধক কমলাকান্ত বলেছেন:

তীর্থভ্রমণ দুঃখ-গমন, মন-উচাটন হয়ো নারে,
আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।'

১। 'আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে শীতল হও না মূলাধারে' অংশটির অর্থ দু'রকম ভাবে হ'তে পারে: (৩) প্রথম অর্থ—সঙ্গীত-রচয়িতা সাধক কমলাকান্ত নিজেই দিয়েছেন যে, ত্রিবেণী-স্নান মূলাধারপদ্মে হয়। মূলাধারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না তিনটি নাড়ি একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। মধ্যে সুষুম্না—সরস্বতী-নদী হিসাবে কল্পিত, বামে ইড়া—যমুনা ও দক্ষিণে পিঙ্গলা—গঙ্গা। এই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম বা মিলনস্থল মূলাধার। যোগশাস্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলাকে চন্দ্র ও সূর্য রূপেও কল্পনা করা হয়। ইড়া ও পিঙ্গলায় মনের সঙ্গে প্রাণ বা প্রাণবায়ুর দিবানিশি যাতায়াত। কিন্তু এই যাতায়াত বন্ধ হয় মন ও প্রাণবায়ুকে যখন সাধনপ্রণালীর সাহায্যে সুষুম্নার ছিদ্রপথে প্রবাহিত ও সমস্ত-চক্রভেদ ক'রে সহস্রার পদ্মে পরমশিবে মিলিত করা হয়। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন: 'অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে। ওরে, কোটার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে' প্রভৃতি। এই শশী বা চন্দ্র ইড়া ও সূর্য পিঙ্গলা নাড়ী। 'শশী' অর্থে আবার মন। মন সর্বদাই চঞ্চল। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা'। তাই মনকে স্থির না করলে সুষুম্নায় মন প্রবেশ করতে পারে না। সুষুম্নাই সহস্রারপদ্মে মনকে পরমশিবে মগ্ন করে। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ, তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন'। সহস্রার সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম। সেই পদ্মে হংস অর্থাৎ

নিজে হাতেনাথে কিছু করা দরকার। উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালে হবে কেন। তাই ভবঘুরে হওয়া যেমন ভাল নয়, তেমনি একটা জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকাও আবার ভাল নয়, তাতে মনে আসক্তির ময়লা জমতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরও বহূদক ও কুটিচকের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বহূদকের চেয়ে কুটিচকেরই প্রশংসা করেছেন। কুটিচক অর্থে সকল জায়গা বা তীর্থ ঘুরে ঘুরে শেষে যখন দেখে কোথাও কিছু নেই, নিজের মধ্যেই সব, তখনি সে একটা জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসে যায়, আর সাধন-ভজন ক'রে সত্যবস্তু লাভ করে। বস্তু লাভ করাটাই আসল, তা যে'রকম ক'রেই হোক। উপায় বড় নয়, লক্ষ্যই বড়। লক্ষ্য হ'ল যেটাকে তুমি জীবনে চরমবস্তু ব'লে লাভ করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্তুলের পাখীর উদাহরণ দিয়েছেন। চারদিক ঘুরে এসে শেষে নিশ্চিন্ত মনে পাখী মাস্তুলে বসে।

শিব ও হংসী বা শক্তি পরস্পরে মিথুন বা চনকাকারে থাকে। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা, তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা'। ব্রহ্মসনাতনী শ্যামা শিব-রূপে সহস্রারে ও কুণ্ডলিনীশক্তি-রূপে মূলাধারে অবস্থিত। (২) দ্বিতীয় অর্থ —মূলাধার ছাড়াও সহস্রারপদ্ম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার আর একটি মিলনস্থল। সহস্রারে পরমাত্মারূপী পরমশিবে সুপ্তা শক্তিরূপী জীবাত্মাকে মিলিত করলে সাধক অপার্থিব শান্তি লাভ করেন। তাই মূলাধার ও সহস্রার এই দু'জায়গাই ত্রিবেণী-সঙ্গমের স্নান কল্পনা করা হয়। তবে কমলাকান্ত মূলাধারকে প্রাধান্য দিয়েছেন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার জন্য। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে সাধকের জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয়। ত্রিবেণীস্নানের অর্থ নিদ্রিতা শক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ। কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যৌগিক বা তন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনার ইঙ্গিত।

আমরা ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, কাজে কিছু কর। শুধু কথায় যেমন পেট ভরে না, তেমনি কেবল শাস্ত্রপাঠ, উদ্দেশ্যবিহীন হ'য়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো বা কেবলই কাজের নেশায় কাজ ক'রে যাওয়াও ভাল নয়। সকল জিনিসকেই ভগবান-লাভের উপায় বলে মনে করতে হয়, তবেই শাস্ত্রপাঠ বলো, তীর্থভ্রমণ বলো, কাজ বলো সবই সার্থক হয়।

রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। এক মিনিটের জন্য ভিতরে গিয়ে তিনি আবার ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন ও হাসতে হাসতে বল্লেন ঃ 'কি বলো, আসলে ভাব নিয়েই তো কথা'।

আমরা ঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। আপনিও তো ভারতের অনেক দেশ ঘুরেছেন খালি পায়ে ও কারু কাছ থেকে কোন কিছু না নিয়ে'।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'হ্যাঁ, পরিব্রাজক-জীবনের ঐ কালী-তপস্বী ছবিটা দেখেছ? ঐ দেখ'। এই ব'লে তিনি অফিস-ঘরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে টাঙানো কালী-তপস্বী ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখালেন। তারপর বল্লেন ঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাবার পর স্বামিজী (বিবেকানন্দ) ও আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর নাম নিয়ে—এ'কথা তো তোমাদের অনেকবার বলেছি। স্বামিজী গেলেন একদিকে, আর আমি গেলাম অন্যদিকে। নানান জায়গা নানান দেশ ঘুরে শেষে এলাহাবাদে যাই। এলাহাবাদে ঝুঁসিতে দিনকতক কাটাই তা' তো শুনেছ। সেখান থেকে সদানন্দকে (গুপ্ত মহারাজ)

নিয়ে কাশী যাই। কাশীতে অসিঘাটের কাছে একটা বাগানবাড়ীতে থাকতাম, দুপুরে মাধুকরী করতাম, আর বাকী সময় কাটাতাম শাস্ত্রপাঠে আর অনবরত ধ্যান-ধারণায়। তখন সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতাম। পাণিনির ব্যাকরণ অর্থাৎ সিদ্ধান্তকৌমুদীটা আমার একরকম কণ্ঠস্থই ছিল। এলাহাবাদে থাকতে শিশির বসু প্রভৃতি যখন পাণিনির (পাণিনি-ব্যাকরণের) ইংরেজী অনুবাদ করেন তখন সে'কাজেও আমি তাঁদের অনেক সাহায্য করেছিলাম'।

'কাশীতে থাকতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দের নাম শুনি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একদিন দেখতে যাই। সত্যই যেন কাশীর জীবন্ত শিব। যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ। বালকের স্বভাব ও নির্বিকারচিত্ত। তারপর যাই ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখতে। ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে আমার খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর বেদান্ত নিয়ে বিচারও হ'ল। সবই সংস্কৃতে। সে'সময় প্রমদাদাস মিত্রও ঐ বাগানবাড়ীতে আমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে আসতেন। দীনু (দীননাথ বা স্বামী সচ্চিদানন্দ) আমার সঙ্গে ছিল। পদব্রজে কাশী পরিক্রমা করি। তারপর কিছুদিন পরে হেঁটে কলকাতায় বরাহনগর মঠে ফিরে আসি'।

আমরা: 'তাহ'লে তখন থাকতেই বোধহয় বরাহনগর মঠে আপনি থেকে গেলেন? স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) লণ্ডনে যাবার আগে আর কখনো সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি'।

স্বামিজী মহারাজ: 'তার আগে স্বামিজীর সঙ্গে আমার জুনাগড়ে একবার দেখা হয়েছিল। বরাহনগর মঠে নানান কারণে বেশীদিন আমি থাকতে পারিনি। তখন

শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ) বরাহনগর মঠের সব দেখাশোনা করতেন। শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) ও লাটুর (অদ্ভুতানন্দ) যত্ন ভালবাসার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। বরাহনগর মঠে দিনকতক থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে আবার পদব্রজে বেরিয়ে পড়লাম। সে'দিন একটু মেঘলা ও জল-ঝড়ের আকাশ ছিল। বৃষ্টিও হচ্ছিল সামান্য। লাটু মহারাজ অনুরোধ করেছিল সে'দিন বার না হবার জন্য, আমি কিন্তু তাঁর নিষেধ রাখতে পারিনি। সে চোখ ছলছল করতে করতে আমার দিকে চেয়ে ছিল, আমি বিদায় নিয়ে সে' দুর্যোগেই বেরিয়ে পড়লাম'।

'গঙ্গা পার হ'য়ে বালি-ষ্টেশনে কাশী যাবার গাড়ী ধরি ও তার পরের দিন কাশী পৌঁছুই। কাশী থেকে যাই প্রয়াগ, দিল্লী, তারপর আগ্রা হ'য়ে চিত্রকূট। সেখান থেকে যাই জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গিরনার ইত্যাদি স্থানে। সবই খালি পায়ে। ঐ যে কালী-তপস্বী ছবি দেখছ ঠিক ওভাবেই ভারতের চতুর্দিক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তখন স্বামিজীকে দেখার ভারি ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ঠিকানা মোটেই জানা ছিল না। নর্মদা পার হ'য়ে ক্রমশঃ জুনাগড়ে গিয়ে পৌঁছুলাম। পথে পোরবন্দরের (গুজরাট) বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর-পণ্ডুরাঙের অতিথি হলাম। শঙ্কর-পাণ্ডুরাঙ বল্লেন: 'এই সে'দিন স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে ইংরেজী-জানা একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এসেছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক'। আমি চেহারা ও কথাবার্তার description (বিবরণ) শুনে অনুমান করলাম সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আমাদের স্বামিজী হবেন, সম্ভবতঃ ছদ্মবেশে তিনি

গুজরাট প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শঙ্কর-পাণ্ডুরাঙ খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। সে' সময়ে তিনি অথর্ববেদ সংকলন ক'রে সংস্কৃতে ছাপাবার বন্দোবস্ত করছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ হ'তে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর বাড়ীতে দিনকতক থাকার জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধও করলেন। কিন্তু বেশীদিন থাকার সেখানে ইচ্ছা হ'ল না। আমি মনে মনে বুঝলাম স্বামী সচ্চিদানন্দ আর কেউ নন, আমাদের বিবেকানন্দই। তাঁকে দেখার জন্য তখন আমার মন আরো চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। শঙ্কর-পাণ্ডুরাঙ বল্লেন তিনি (বিবেকানন্দ) জুনাগড়ের দিকে গেছেন। আমি তু'দিন মাত্র পোরবন্দরে থেকে জুনাগড়ের দিকে রওয়ানা হলাম। জুনাগড়ে অনেক খোঁজাখুজি ক'রে সেখানকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মন্সুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়ীতে হাজির হলাম। ত্রিপাঠী মশায় একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি আমাদের স্বামিজী বসে আছেন। ত্রিপাঠী মশায়ের সঙ্গে তিনি তখন সংস্কৃতে বেদান্তের বিচার করছিলেন। আমায় অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে তিনি আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন ও আমাকে দেখিয়ে ত্রিপাঠী মহাশয়কে বল্লেন: 'ইনি আমার গুরুভাই, একজন অদ্বিতীয় বেদান্তী। আপনি এঁর সঙ্গে বেদান্তের বিচার করুন'। আমি ধুলো-পায়েই বসে গেলাম বিচার করতে। অনেক দিন পরে স্বামিজীকে দেখে মনে কি যে আনন্দ হ'ল তা' আর ব'লে বোঝাবার নয়। স্বামিজী হাসিমুখে একপাশে বসে আমাদের বিচার শুনছিলেন। ত্রিপাঠি মহাশয়ের সঙ্গে

আমি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের নানান জটিল বিষয় নিয়ে বিচার করতে লাগলাম। স্বামিজীর মুখে আনন্দ আর ধরে না। ত্রিপাঠী মহাশয়ও খুব খুসী হ'য়ে আমাদের আদর-যত্ন করেছিলেন। জুনাগড়ে অনেক দিন পরে স্বামিজীর সঙ্গে আবার নানান কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ল। তিনি বরাহনগর মঠের কথাও জিজ্ঞাসা করলেন। কোনও একটি কারণে খুব দুঃখ করলেন। দু' চার দিন পরে স্বামিজী আবার বোম্বাইয়ের দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও ত্রিপাঠী মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকার দিকে যাত্রা করলাম। অনেকদিন পরে মিলনের পর আবার আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'ল।

আমরা : 'দ্বারকা থেকেই ফিরেছিলেন, না—আর কোথাও গিস্‌লেন' ?

স্বামিজী মহারাজ : 'ফিরব কেন? দ্বারকার মন্দির প্রভৃতি দেখে প্রভাসতীর্থে গেলাম। ওখান থেকে জাহাজে ক'রে বোম্বাই, তারপর মহাবালেশ্বর যাই। মহাবালেশ্বর নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের বাড়ীতে উঠে দেখি বসে আছেন আমাদের স্বামিজী—সেই নরেন্দ্রনাথ। খুব তো একচোট হাসাহাসি হ'ল। তারপর স্বামিজী বল্লেন: 'বেশ বাবা, তুমি আমার পিছু নিয়েছ দেখছি'। আমি বল্লাম: 'তা কেন? আমি আমার মতো চলেছি, তুমি তোমার মতো চলেছ। কিন্তু তুমি যে আবার এখানে এসে হাজির হবে তা' আমি ক্যামন ক'রে জানব বলো? সে'দিনটা সেখানে কাটিয়ে তার পরের দিন আমি পুণার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। স্বামিজী সেখানেই থেকে গেলেন। তখনও তিনি নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ' নামেই পরিচয় দেন'।

'আমি পুণা হ'য়ে বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণ্য যাই। সেখান থেকে তাপ্তী, গোদাবরী ও কাবেরী ইত্যাদি তীর্থ দর্শন ক'রে মাধুকরী করতে করতে পদব্রজে অগ্রসর হ'তে থাকি। মাঝে মাঝে রেলেও গেছি। তবে পয়সা ছুঁতাম না, কেউ যদি টিকিট ক'রে গাড়ীতে চড়িয়ে দিত তো গাড়ীতে যেতাম। ক্রমশ উত্তরের দিক থেকে একেবারে দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গিয়ে হাজির হলাম। সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে স্নান ক'রে রামেশ্বর-শিব দর্শন করলাম। তারপর তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি দর্শন ক'রে কলকাতায় ফিরে আসব ঠিক করলাম। একজন আমার সংকল্প জেনে জাহাজের টিকিট কিনে দিলে। ফোর্থ-ক্লাশের ডেক-প্যাসেঞ্জার হ'য়ে জাহাজে উঠলাম। কাপড়ের খুঁটে দু'টি চিঁড়ে বাঁধা ছিল, তাই সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে নিয়ে প্রায় তিন দিন কাটালাম। কিন্তু সে' কি আর খাওয়া যায়, সমুদ্রের লোনা জলে চিড়ে অখাদ্য হ'য়ে গিস্‌লো। কিছুদিন পরে কলকাতায় এসে শুনলাম বরানগরে মঠ নাই, আলমবাজারে উঠে গেছে। আলমবাজার মঠে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছুতে শশী, লাটু, শরৎ, নিরঞ্জন এরা খুব আনন্দিত হ'ল'।

আমরা : 'ফিরে এসে আর কোথাও বোধহয় বার হলেন না?'

স্বামিজী মহারাজ : 'আলমবাজার মঠেই তখন থাকলাম। কিন্তু খালিপায়ে সারাটা দেশ ঘোরার জন্য কিছুদিন পরে পায়ে থে্‌ডওয়ার্ম (নাহারু) দেখা দিল। একদিন দু'দিন নয়, প্রায় তিনমাস শয্যাগত হ'য়ে পড়ে থাকলাম। নড়বার শক্তি ছিল না। জুনাগড়ে স্বামিজীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হ'লে তিনি আমায় বলেছিলেন :

'এদেশে খালি পায়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু ভুগতে হবে'। মহাপুরুষের বাক্য বৃথা যাবার নয়, সত্য হয়েছিল। অসুখের সময় শরৎ, লাটু ও নিরঞ্জন এরা খুব সেবা যত্ন করেছিল। তাদের যত্ন ও ভালবাসা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। অসুখ সেরে গেলে শরতের কাঁধে ভর দিয়ে কতদিন ছোট ছেলেদের মতো এক পা দু'পা ক'রে চলা অভ্যাস করেছি, তবে তো ভাল ক'রে চলতে পারি'।

'সারা ভারতবর্ষটা নিঃসম্বলেই ঘুরে বেড়িয়েছি। কত ঝড়-ঝাপ্টা মাথার ওপর দিয়ে গেছে, সবই অবলীলাক্রমে সহ্য করেছি। অবশ্য ফলও তার পেয়েছি। এখন পেনসেন ভোগ করছি আর কি'। এই ব'লে স্বামিজী মহারাজ হাসতে লাগলেন। আমরাও হাসি চাপতে পারিনি। এর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে: মহারাজ, আপনি কি গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী গিস্‌লেন ?'।

স্বামিজী মহারাজ: 'গিস্‌লাম বৈকি ? হিমালয়ের শেষ থেকে আরম্ভ ক'রে কুমারিকা পর্যন্ত কোথাও আর বাকি রাখিনি বাবা। গঙ্গোত্রী যেতে দেবপ্রয়াগ থেকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেছে: একটা গঙ্গার ধার দিয়ে গঙ্গোত্রীর দিকে, আর অপরটা কেদার-বদরীর দিকে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী হ'য়েও কেদার-বদরী যাওয়া যায়। ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে একটা রাস্তা আছে। আমি প্রথমে বদরিকাশ্রম যাই, সেখান থেকে যাই উখীমঠে ও গুপ্তকাশী হ'য়ে কেদারনাথে। তারপর ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তা ধ'রে গঙ্গোত্রীর দিকে রওয়ানা হই। উত্তরকাশী হ'য়েও গঙ্গোত্রী যাওয়া যায়। গঙ্গোত্রীর দু'ধারে সিদ্ধিগাছের জঙ্গল। আমার সঙ্গে যারা ছিল সকলেই মুঠো মুঠো সিদ্ধি তুলতে লাগলো। গঙ্গোত্রী যেখান

থেকে বেরিয়েছে সে'টার নাম গোমুখী। একটা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরণার মতো গঙ্গার ধারা নামছে। আমরা তারই কিছু দূরে রাত্রি কাটালাম। সামনে একটা উচু কুণ্ড ছিল। সঙ্গে সামান্য চালও ছিল। একটা গামছার খুঁটে চাল বেঁধে খানিকক্ষণ কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে রেখে তুলতেই দেখি চাল সিদ্ধ হ'য়ে ভাত হ'য়ে গেছে। তবে ভাতে গন্ধকের খুব গন্ধ ছাড়ছিল। কাছে বোধহয় গন্ধকের কোন পাহাড়-টাহাড় ছিল, তাই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যেও বারমাস জল গরম থাকে। গরম মানে কি—যেন ফুটছে! আমরা সেখানেই রাত্রি কাটালাম। নানকপন্থী একজন উদাসী সাধু আমার সঙ্গে ছিল। রাত্রে কাঠ জোগাড় ক'রে সারারাত্রি আগুন জ্বালিয়ে কাটালাম। তারপর পালা ক'রে রাত্রি জাগলাম, নইলে বাঘ আসবে। শুনলাম চিতাবাঘের সেখানে ভারি উপদ্রব। প্রথমের দিকে নানকপন্থী সাধু জেগে থাকলো, আমি ঘুমালাম। শেষরাত্রে আমি জাগলাম। বরফের নদী থেকে সাতটি ধারা একসঙ্গে হ'য়ে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে। গঙ্গোত্রী দেখে উত্তরকাশী হ'য়ে দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যমুনোত্রীতে উপস্থিত হই। সেখানেও একটা গরম জলের কুণ্ড ছিল। তাতে চাল সিদ্ধ ক'রে খেয়ে একটা গুহার ভেতর রাত্রি কাটালাম। পরের দিন যমুনার ধার দিয়ে নীচে নামতে নামতে দেরাদুন হ'য়ে আবার হৃষীকেশে ফিরি'।

আমরা সকলে চুপ ক'রে বসে স্বামিজী মহারাজের কথা শুনছি। তিনি এমনিভাবে তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন যেন আমাদের সামনে তাদের ছবি স্পষ্টই ভেসে উঠতে লাগল।

॥ স্মৃতি ঃ এগারো ॥

আমরা তখন দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। একদিন রাত্রি দুটো আড়াইটা হবে। স্বামিজী মহারাজ রাত্রের আহার শেষ ক'রে শোবার ঘরের সামনের ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে বসতেই তিনি বল্লেন ঃ 'আরে এসো এসো, এত রাত্রে ঘুম ছেড়ে যে ?' আমরা বল্লাম ঃ 'কেন মহারাজ, এ'রকম তো প্রায়ই আসি, আজ তো আর নূতন নয়'। তিনি বল্লেন ঃ "হ্যাঁ, তা তো বটেই, তবে কি বলে আর কথাবার্তাটা আরম্ভ করি বলো —তাই'।

আমরা অনেকবার উল্লেখ করেছি যে, স্বামিজী মহারাজের আলোচনা করার নির্দিষ্ট কোন বিষয় ও সময় ছিল না। কারু ভেতর জানার বা শোনার আগ্রহ আকুলতা দেখলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নানান প্রসঙ্গ শুরু ক'রে দিতেন। কর্ম্মময় ছিল তাঁর জীবন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কর্ম্মের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগসূত্র বাঁধা। তাঁর কর্ম্মের ধারা বা পদ্ধতিও ছিল কর্মযোগীর মতো, তবে কর্ম্মের নেশা কোনদিন তাঁকে পেয়ে বসেনি, বরং কর্মই তাঁর হাতের খেলার জিনিস হয়েছিল।

দিনে বা রাত্রে খাওয়ার পরে অনেকেই আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌তাম তা' আগেও বলেছি। সে'দিনও তাই রাত্রে আহারের পর তাঁর বিশ্রামের ঘরে গিয়ে বস্‌লাম। স্বামিজী মহারাজ একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে বল্লেন ঃ 'কি জানো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো কাটলো মানুষের অর্ধেকটা জীবন, আর অর্ধেক কাট্‌বে নানান অংশে ভাগ হ'য়ে'।

আমরা ঃ 'সে কি রকম মহারাজ ?'

স্বামিজী মহারাজঃ 'এই দেখ না, যখন বিয়ে হয়নি তখন স্বাধীন বিহঙ্গের মতো নিজের চিন্তাই থাকে, অপর চিন্তা থাকলেও তা' গৌণভাবে থাকে। বিয়ে হলেই অর্ধেক জীবনটা বিলিয়ে দিতে হয় স্ত্রীকে। ছেলেপুলে হ'লে তাদের দিতে হয় তার অর্ধেক। তারপর আবার জামাই, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়্শী, অসুখ-বিসুখ, ডাক্তার-বদ্যি মাম্লা-মকদ্দমা ইত্যাদির চিন্তা। তখন নিজের বলতে আর কি থাকে বলো? অবশ্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের কথা আলাদা, তারা সারা জীবনটা সাধন-ভজন ও ভগবচ্চিন্তা ক'রে কাটিয়ে দিতে পারে। তবে সকল রকম জীবনেই সংযম, নিষ্ঠা ও অভ্যাস থাকা চাই। অভ্যাস করলে কি বনবাসী—কি গৃহবাসী সকলের জীবনেই শান্তি আসে। দেখনা—অভ্যাস করেছিলাম বলেই তো ঘুমটা একরকম জয় ক'রে ফেলেছি। ওদেশে (পাশ্চাত্য) যখন ছিলাম তখনো ঘুমাতাম চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তিন চার ঘণ্টার বেশী নয়'।

আমরা: 'আপনাদের কথা স্বতন্ত্র মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'কেন, আমরা বুঝি মানুষ নই, আকাশের দেবতা। আর তাই যদি হয়, তবে জানবে দেবতারাও মানুষ। সাধনা ও সৎকর্মের ভেতর দিয়ে মানুষই দেবতা হয়। জীবনে যত্ন ও অভ্যাস চাই। পতঞ্জলি বলেছেনঃ 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'। বারবার যত্ন করার নাম অভ্যাস। কিছুই করবো না, কেবল কুঁড়েমি করবো আর প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুবো, এ'সব করলে কি আর জীবনে উন্নতি হয় বাপু। স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আজীবন কি কঠোর তপস্যাই না করেছিলেন! কাশীপুরের বাগানে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) একবার

রাত্রে ধ্যান করছিলেন, অসংখ্য মশা বসে সর্বাঙ্গ কালো হ'য়ে গিস্লো, মনে হয়েছিল যেন একটা কালো কম্বল তাঁর গায়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। দুপুরের প্রখর রৌদ্রের ভেতর বরাহনগর মঠে শুয়ে আমিও ধ্যান করতাম। মহিম বাবু (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) একদিন দেখে বল্লেন: 'কালী ম'রে কাঠ হ'য়ে গেছে'। যোগানন্দ শুনে বলেছিল: 'আরে ও মরে নি, ও শালা মড়ার মতো শুয়ে শুয়ে ঐরকম ক'রেই ধ্যান করে'।

নিঃশব্দে আমরা শুনে যাচ্ছি। ঘড়িতে ক্রমশঃ তিনটে বাজলো। আমরা ওঠার উপক্রম করছি দেখে স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'আরে এসেছ যখন আরো কিছুক্ষণ না হয় বসো। ঘুমতো মাটি হয়েছেই, সুতরাং ঘুমের জন্যে ভেবে আর লাভ কি'।

সত্যই তখন আমাদের চোখ ঢুলু ঢুলু করছিল, লজ্জার খাতিরে কেবল জোর ক'রে চোখের পাতা-দুটো কোন রকমে টানাটানি করছিলাম। আর সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলাম হাইতোলার ব্যাপারেও।

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'দেখ, আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক ঠিক উন্নতি না করলে সাধুজীবন নিয়ে আর কি হ'ল বলো। নিজেদের স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়া-পরা নিয়ে কেবল গতানুগতিকভাবে ধ্যান-জপ করলেও কোন ফল হবে না। ব্যাগার খাটার জন্য সাধুজীবন নয়। জীবনে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় চাই, বিবেক বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা চাই। স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে নিউ ইয়র্কে আমার এই সব নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম: 'মঠ মিশন করলে, কিন্তু তার মধ্যে সবার জন্য অবারিত

প্রবেশাধিকার রাখা কি ভাল। সত্যকার বিবেক-বৈরাগ্যবান ছেলে দরকার, নইলে যাকে তাকে সাধু-সন্ন্যাসী করলে সঙ্ঘের পরিণাম বিশেষ ভাল হয় না'।[১] স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) শুনে বলেছিলেন: 'কথাটা সত্য। তবে কি জানো, আমার উদ্দেশ্য হ'ল সকলকে জীবনে একটা chance (সুযোগ) দেওয়া। সুযোগ-সুবিধা পেলে একশোটার ভেতর একটাও হয়তো ভাল হ'তে পারে'। একথা আগেও তোমাদের আমি বলেছি'।

আমরা: 'মহারাজ, সাধুজীবনের উদ্দেশ্য যখন ভগবান লাভ করা, তখন সেই ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্য সৎই হয়, আর সেজন্য তাঁরা ভাল আধার হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এতে chance-এর (সুযোগের) প্রশ্নই বা ওঠে কি ক'রে।'

স্বামিজী মহারাজ: 'সুযোগ-সুবিধা তো বটেই। সত্যকারের বিবেক-বৈরাগ্যবান ছেলেই বা ক'জন আসে। সকলেই তো আর ভগবান লাভ করবো ব'লে আসে না। গোড়ার দিকে বেশ বিবেক-বৈরাগ্য ভক্তি নিষ্ঠা নিয়ে এলো, তারপরই হয়তো আস্তে আস্তে সে'সব কমে যেতে লাগলো। এরই জন্য সাধন-ভজন দরকার। ঠিক-ঠিকভাবে সাধন-ভজন করলে জীবনে chance (সুযোগ) আসে'।

আমরা: 'মহারাজ, সাধন-ভজন বলতে ঠিক ঠিক কি বুঝায়?'

স্বামিজী মহারাজ: 'ভাল প্রশ্নই করেছ, কেননা সাধন-

১। এ' আলোচনা হয়েছিল শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে মঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) তখন।

ভজন বলতে বেশীর ভাগ লোকের ধারণা যে ঠাকুর-ঘরে বা কোন নির্জন জায়গায় বসে একটু আধটু জপ ধ্যান করা। জপ ধ্যান তো চাইই, কিন্তু জপ ধ্যান ক্যামন ক'রে করতে হয় তাই তো অনেকে জানে না। গুরু বা আচার্য ব'লে দিলেই তা শোনে আর মানেই বা ক'জন। পতঞ্জলি বলেছেন জপ মানে যে মন্ত্র জপ করবে তার অর্থ ভাবনা করা ঃ 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। মালায় বা করে (অঙ্গুলিতে) সংখ্যা রাখাটা বাইরের জিনিস, ওটাই সব-কিছু নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছে ইষ্টচিন্তা বা মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাটা গৌণ হ'য়ে দাঁড়ায়, মুখ্য কাজ হয় করে (অঙ্গুলিতে) সংখ্যা রাখা বা মালা ঘোরানো। এদের রহস্য গুরুর কাছ থেকে ভাল ক'রে জেনে নিতে হয়, নইলে জপই বলো আর ধ্যানই বলো সবই ক্রমশ mechanical (কলের মতো উদ্দেশ্যহীন) হ'য়ে দাঁড়ায়'।

একথা ব'লে স্বামিজী মহারাজ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকলেন। প্রায় তিন চার মিনিট পরে আমাদের দিকে চেয়ে আবার বল্লেন ঃ 'ধ্যান কি আর সহজে হয়? ধ্যান হ'লে তো হয়েই গেল। সমাধির ঠিক পূর্ব-অবস্থার নাম ধ্যান। নইলে তাড়াতাড়ি ক'রে আসনে বসে চোখ বুঁজলেই আর ধ্যান হয় না। সে' রকম ধ্যানের নাম হ'ল 'মর্কট ধ্যান'। মর্কট-ধ্যানে গতানুগতিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থাকে, আন্তরিকতা থাকে না, লক্ষ্যও স্থির থাকে না। তাই জপ ধ্যান করার সময় সাবধান হ'তে হয়, সাবধান হতে হয় মন যাতে আজে-বাজে বিষয় চিন্তা না করে। সাবধান হওয়ার জন্যই তো জ্ঞানী গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ দরকার। সকলেরই তো আর ঠিক ধ্যান জপ হয় না বা সকলেই

তো ভগবান লাভ করে না। আমরা তাই সকলকে একটা ক'রে chance (সুযোগ) দিই—যদি কেউ নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিবেক-বৈরাগ্যবান হ'তে পারে। বিবেক-বৈরাগ্য এলেই তো হ'য়ে গেল। পতঞ্জলি বলেছেন ঃ 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ'। 'তন্নিরোধঃ' কিনা মনের নিরোধ। বৃত্তি থাকে বলেই তো মন। সংকল্প-বিকল্প হ'ল বৃত্তি। বিবেক-বৈরাগ্য এলে চাঞ্চল্য দূর হ'য়ে মন স্থির হয়। গীতায় আছে ঃ 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'। নিজের চেষ্টা ও সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কৃপা না হ'লে বৈরাগ্য আসে না। গীতায় আছে,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

হাজারের ভেতর কেউ সিদ্ধি লাভের বা ভগবানকে পাবার জন্য ইচ্ছা ও যত্ন করে, আবার যত্ন ও চেষ্টা করছে বা একান্ত মন নিয়ে সাধন-ভজন করছে এ'রকম হাজার লোকের মধ্যে হয়তো একজন যথার্থভাবে সিদ্ধি লাভ করে—ভগবানকে পেয়ে ধন্য হয়। তাও হাজারের মধ্যে যে একজনই সিদ্ধি লাভ করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই'।

আমরা ঃ 'মহারাজ, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার কি কোন direct method (সোজাসুজি উপায়) নেই ?'

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'Direct method মানে made easy (সহজ করা) পন্থা। দেখ বাপু, সিদ্ধি লাভ করার কোন direct বা indirect (সোজা বা বাঁকা) পথ নেই। সব সাধনাই direct (সোজা), আবার indirect (বাঁকা বা পরোক্ষ)। নিষ্ঠা, আকুলতা ও ঐকান্তিকতাই আসল। যে-কোন সাধন মন-মুখ এক ক'রে যদি আন্তরিকতার সঙ্গে আচরণ কর,

তাই সিদ্ধি লাভ করার পক্ষে direct method (সোজা উপায়), আর লোকদেখানো বা ফাঁকি দেওয়ার মতলব নিয়ে করলে direct (সোজা) পথও indirect (বাঁকা) হ'য়ে দাঁড়ায়'।

'আসলে কি জানো, যে কোন সাধনই কর না কেন, তার সম্বন্ধে তোমার পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই—যাকে বলে clear conception (স্বচ্ছ ধারণা)। সিদ্ধিলাভের জন্য সাধন-ভজন করছ অথচ কেন করছ ও করার উদ্দেশ্য কি তাদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, daily routine (দৈনন্দিন ধারা) অনুযায়ী ক'রে যাচ্ছ, এটা ঠিক নয়। তাই সাধন-ভজনের আগে clarity of thought, অর্থাৎ clear conception about the aim and object of concentration and meditation (ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে চিন্তার স্বচ্ছতা, অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য ও প্রাপ্তব্য বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা) থাকা চাই, নইলে আগেই বলেছি সাধন-ভজনও কার্যতঃ stereotyped (গতানুগতিক) ও mechanical (যন্ত্রচালিতের মতো) হ'য়ে দাঁড়ায়'।

'শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন: 'যার পেটে যা সয়'। সকল ধর্ম বা সকল পথই সত্য। সত্য মানে direct (সোজা)। Indirect বা পরোক্ষ কোনটাই নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবন দিয়ে দেখালেন: 'যত মত তত পথ'। সকল পথ—সকল রকম সাধন-ভজনই সত্য, তবে যেটা তোমার সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য সেটাই তোমার পক্ষে direct বা সোজা। অপরের পক্ষে হয়তো তা' indirect (সোজা না) হ'তে পারে। পথ বা সাধনপ্রণালী তো অসংখ্য, তাই যে-কোন একটা পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

রাজযোগ বা ধ্যান-ধারণা, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ বা আত্মতত্ত্ববিচার এ'সবই পথ বা উপায়। আবার মতও বটে। তাই আসনে বসে প্রাণায়াম আর ধ্যান-জপ করাটাই একমাত্র সাধন নয়। ভগবানের সেবা অর্থাৎ পূজার ভাব নিয়ে কাজ করা, অন্তরের টান দিয়ে ভক্তি করা অথবা সদসদ্‌-বিচার করাও সাধন। যে-কোন অবস্থায় যে-কোন ভাব নিয়ে ভগবানকে পাবার অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা করার নাম সাধনা।

আমরা: 'কেউ সাধন-ভজন ক'রে যাচ্ছে—বিরাম নেই, কিন্তু ক্যামন ক'রে বুঝবে যে সে কখন্‌ সিদ্ধি লাভ করবে?'

স্বামিজী মহারাজ: 'তাতে আর বোঝাবুঝি কি। বুঝ্‌বেই বা কাকে আর বোঝাবেই বা কে? বুঝবে যা দিয়ে তাই তো তুমি। You cannot get behind consciousness (তুমি জ্ঞানের বাইরে বা জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে যেতে পার না)। জ্ঞানকে জ্ঞান দিয়েই তো বুঝবে বা লাভ করবে। জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে বা বাদ দিয়ে কোনদিনই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। তিনি (ব্রহ্ম বা ভগবান) জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য-কিছু সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে এ'রকম ক'রে ক্ষতিয়ে দেখতে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু-বেগুনের ব্যবসা নয় যে ক্ষতিয়ে দেখবে লাভ হ'ল—কি লোকসান হ'ল। সাধন-ভজনের বেলায় লাভ লোকসান যদি হয়তো তা একমাত্র সাধকের নিজের দোষের বা গুণের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর

লোকদেখানো জপ-ধ্যান করতো নিজে ফাঁকিতে পড়বে। আসলে সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয় কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণের দিকে তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও কামভাব তোমার ভেতর থেকে দূর হ'য়ে গেছে—এই সব। এগুলোই তো খতিয়ে দেখার ও বিচার করার জিনিস। নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়েও রাখছ, এতে কিছু হবে না। তাই সাধন-ভজন করার সময় একান্তই যদি জানতে চাও যে কবে তোমার সিদ্ধি লাভ হবে, তাহলে একথাই মনে রাখবে যে, মনের সকল সংস্কার যেদিন দূর হবে সে'দিনই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। মনে সঙ্কীর্ণতা থাকবে আর ভগবান লাভ করবে—এতো আর হয় না। শঙ্করাচার্য ঠিক এ'ধরণের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করা মানে অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞান-রূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেমনি সাধন-ভজন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিচার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো। যা নেই তাকে পাবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাবার জন্য কি আর চেষ্টা করবে বলো। অজ্ঞান-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়'।

আমরা: 'ওসবের ধারণা করা বড় শক্ত মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'শক্ত তো বটেই, সহজ আর কোন্ জিনিসটা বলো? একমাত্র ফাঁকি দেওয়াটাই সহজ, নইলে মন-মুখ এক ক'রে কাজ করাই উচিত। কি জানো, এ'সবের ঠিকঠিক ধারণা ক'রতে গেলে চাবিকাটি দরকার'।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী মহারাজের ভেতর আমরা একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। তিনি ক্যামন একটু গম্ভীর ও আনমনা হলেন। গভীর রাত্রের নীরবতায় চারদিক বেশ থমথম করছিল। স্বামিজী মহারাজের গাম্ভীর্য ঘরের পরিবেশকে যেন আরো গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ক'রে তুললো। আমরা সকলে নির্বাক ও নিস্তব্ধ। দু' তিন মিনিট সে'ভাবেই কাটলো। তারপর আমাদেরই একজন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেঃ 'চাবিকাটির কথা যে বলছেন, চাবিকাটি কি মহারাজ?' এই চাবিকাটির কথা স্বামিজী মহারাজ কিন্তু আগেও দু'একবার বলেছেন। তিনি আনমনাভাবে বল্লেনঃ হাঁ, চাবিকাটি। অধ্যাত্ম-জীবনের রহস্যভেদ করতে গেলে এই চাবিকাটি না হ'লে হয় না'।

তাঁকে পুনরায় অন্যমনস্ক দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমাদের ভরসা হ'ল না, কেবল আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম চাবিকাটি কথাটার অর্থ কি। কথার ভেতর নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য লুকোনো আছে। নানান চিন্তার আলোড়নে আমাদের ঘুমের নেশা তখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে। ভাবলাম স্বামিজী মহারাজ বোধহয় এতদিন কোন নূতন সাধনার কৌশল গোপন রেখেছিলেন, আজ তার সন্ধান দেবেন। সে'কথা জানার আকুলতায় আমরা অস্থির, অথচ কারু মধ্যে জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল না।

মনের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে যেন যুগ-যুগান্তরের কত ধারণার স্রোত—কত অতীতের স্মৃতি !

কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী মহারাজ নিজেই মৌন নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্লেন: 'বুঝলে—চাবিকাটি কাকে বলে ?'

আমরা: 'কিছুই বুঝলাম না মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজ: 'ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠা ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাটি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের one-pointedness (একমুখিতা) থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে, দুনিয়ার আর কিছু চাইবে না। পার্থিব সব-কিছু পড়ে থাকবে মনের বাইরে, তোমার মন থাকবে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তখন আর আলাদা অস্তিত্ব কিছুই থাকবে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নামই চাবিকাটি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং'—আত্মা হৃদয়গুহায় অবরুদ্ধ কিনা লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাটি চাই। রুমীর মসনবীতে একটা গল্প আছে বলি শোন'।

একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দরজায় আঘাত করলে। বন্ধু তার ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করলে: 'Who is there ?' (বাইরে কে ?)। সুফী বন্ধু বল্লে: 'I am' (আমি, তোমার বন্ধু)। বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে: 'Begone, at my table there is no place for the two' (যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না)। সুফী বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফিরতে বাধ্য হ'ল, কিন্তু বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফিরল, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত করলে। ভেতর থেকে আগের

মতোই উত্তর এলো : 'Who is there ?' (বাইরে কে ?)। এবার সুফী বন্ধু উত্তর দিলে : 'Thou beloved, thou' (হে প্রিয়তম, তুমি)। তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বল্লে : 'Since thou art I, come in, there is no room for two Is in this room' (তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভেতরে এসো. কেননা আমার ঘরে তু'জন আমির স্থান নেই)'।[২]

দেখ, there is no room for two 'I's,—ভগবানের রাজ্যে যেতে গেলে আমিত্ব অর্থাৎ ভগবান থেকে তোমার সত্তা আলাদা এই বোধ থাকলে চলবে না। আমিত্বই অহংকার বা অজ্ঞান। অন্ধকার থাকলে যেমন আলো থাকে না, অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত তেমনি জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। জ্ঞান তখন অভিভূত হ'য়ে থাকে। জ্ঞানের প্রকাশের জন্য তাই অজ্ঞান দূর করতে হ'য়, আর তার জন্য চাই সদসদ্‌বিচার। নিজের সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের ভোগের ইচ্ছা এই সব ত্যাগ না করলে আমিত্ব দূর হয় না, আর আমিত্ব থাকা পর্যন্ত যত ধ্যান-জপই কর, যত কেতাবই পড়, সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হয়। Full resignation to the will of God (ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হয়)। বলবে : Thy will be done, not mine. (হে ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমার নয়)। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরমসখা হ'লেও যতক্ষণ না 'শিষ্যস্তেঽহম্‌' ব'লে নিজেকে আত্মসমর্পণ

২। গল্পটি 'মস্‌নবী'-র ১ম ভাগে ৩০৫৬ সংখ্যক কবিতায় (Book I, Verse 3056) বর্ণিত আছে। অধ্যাপক নিকোলসন (Prof. R. A. Nicholson) তাঁর *Tales of Mystic Meaning*-গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৮) মস্‌নবীর এই গল্পটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন।

করলে ততক্ষণ অর্জুনের অজ্ঞান যায় নি। আত্মসমর্পণ করা ও আত্মস্থ হওয়া একই কথা। এ'সব অভ্যাস করতে হয়। নইলে কেবল বেদান্ত-বিচার করলে পাণ্ডিত্য বাড়ে, কিন্তু আত্মানুভূতি বা ভগবান লাভ হয় না'।

'আরো একটা মজার গল্প বলি শোন। শ্রীশ্রীঠাকুরও এ' গল্পটা খুব বলতেন। বৃন্দাবনে গোপীদের মনে একবার ভারি অভিমান হ'ল শ্রীকৃষ্ণ নাকি শ্রীরাধাকে বেশী ভালবাসেন, তাদের তত বাসেন না। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তা' জানতে পারলেন। তিনি একবার অসুখের ভাণ করলেন। কঠিন অসুখ, বাঁচার আশা খুবই কম। গোপীরা ভেবে আকুল—শ্রীকৃষ্ণকে কি ক'রে বাঁচানো যায়। ডাক্তার বৈদ্য এলো, সবাই হার মান্‌লে, উপায় কি। চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অসুখ আর সারবে না। গোপীরা তখন কেঁদেই আকুল। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন তবে একটা উপায় আছে। গোপীরা বল্লে—কি? শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন তোমাদের কারু পায়ের একটু ধূলো যদি আমার মাথায় দাও তবেই অসুখ সারতে পারে, নচেৎ নয়। গোপীরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে বল্লে—তাও কি কখনো হয়? কৃষ্ণ, তুমি বাঁচ আর মর, আমরা কিন্তু কেউই তোমার মাথায় পায়ের ধূলো দিতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—তা হ'লে আর কোন উপায় নেই। শ্রীরাধা ছিলেন কাছে বসে, তিনি শুনে বল্লেন—সে কি, এই কথা? তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের পায়ের ধূলো নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাল হ'য়ে গেলেন। গোপীরা দেখে অবাক। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—কি গো গোপীরা, বুঝলে তো কেন রাধাকে আমি বেশী ভালবাসি? গোপীরা বুঝে লজ্জায় মাথা হেট ক'রে রইলো'।

'গল্পটার ভেতর কি গভীর অর্থ আছে বলো দিখিনি? শ্রীরাধা নিজেকে ভুলে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণই তখন তাঁর সব, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর ধ্যান জ্ঞান জীবন! এরই নাম শুদ্ধপ্রেম ও অনন্যাভক্তি। শুদ্ধপ্রেম, শুদ্ধাভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান সব এক। শ্রীকৃষ্ণ না বাঁচলে শ্রীরাধার জীবন বাঁচে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে সকল ভেদভাব দূর হ'য়ে গেছে। প্রত্যেক সাধকের পক্ষেও তাই! শ্রীরাধার মতো ভগবানের প্রতি আত্মভোলা ভালবাসা চাই। নিজের 'আমি'-ভাব মরে গিয়ে সব 'তুমি'-ময় না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ভগবানের জন্য এ'রকম আকুলতা চাই'।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। আমাদের রকমখানা দেখে স্বামিজী মহারাজ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন ও বল্লেন: 'শুধু আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, জীবনে কিছু করা চাই। নাহং নাহং—তুহুঁ তুহুঁ এই ভাব না এলে জীবনে কি আর করলে বলো?' আমরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে নীচের বস্তিগুলিতে কোথাও কোথাও দু' একটি আলো তখনো মিটিমিটি ক'রে জ্বলছে। অবশ্য সহরময় বিজলি আলোর ঔজ্জ্বল্য তখনো অটুট ছিল। স্বামিজী মহারাজ সহাস্যে বল্লেন: 'কি বাবা, ঘুমকে আজ হজম ক'রে ফেলেছ দেখছি। বেশ বেশ, 'তোর ঘুম তোরে দিয়ে মা, আমি ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি'। এ'রকমটাই চাই। কি বলো? ঘুম যখন জয় করেছ তখন কথার পালা এখুনি শেষ ক'রে লাভ কি'।

আমরা বল্লাম: আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ'।

স্বামিজী মহারাজ: 'প্রথম জীবনের সকল কথা বলতে এখন

বেশ ভাললাগে। ছেলেবেলা থেকে যোগশিক্ষা করবো এই ছিল একান্ত ইচ্ছা। এখন যে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর এলবার্ট হল্ দেখ, ওখানে আগে একটা ছোট ধরণের এলবার্ট হল্ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ওখানে ব্রাহ্মসমাজের (নববিধান) একটা স্কুল (আলবার্ট ইনিষ্টিটিউসন) করেছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এলবার্ট হলের ঐ স্কুলে তখন সাংখ্যদর্শনের ক্রমবিকাশ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের *Evolution Theory* (ক্রম-বিকাশবাদ) এই ছু'টি বিষয় নিয়ে তুলনামূলকভাবে বক্তৃতা করতেন। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের ভেতর বেশ একটা সাড়া পড়ে গিস্‌লো। একদিনের কথা, বঙ্কিম বাবু (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) একটি আলোচনা-সভার সভাপতি ছিলেন। তর্কচূড়ামণি ঐ সভায় সংখ্যদর্শনের বক্তৃতা শেষ ক'রে পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হ'ত। তাঁর মুখে সে'দিন পাতঞ্জলযোগদর্শনের ব্যাখ্যা শুনে আমার মনে যোগাভ্যাস করার ইচ্ছা আরো প্রবল হ'য়ে উঠল। পাতঞ্জল বই কিনে পড়ার ইচ্ছাও সঙ্গে সঙ্গে জাগলো। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা পাতঞ্জলদর্শন কিনলাম। কিন্তু পড়াবে কে? কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ভট্টিকাব্য, ছন্দোমঞ্জরী এ'সব আগেই পড়েছিলাম। কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞান দিয়ে তো আর পাতঞ্জল-দর্শনের মতো বই বোঝা যায় না। কাজেই মনে মনে ঠিক করলাম তর্কচূড়ামণি মশায়ের কাছে গিয়ে আমার মনের আকাঙ্খা জানাবো'।

'তর্কচূড়ামণি মশায় তখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর ওপর তালায় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে থাকতেন। ঠিকানা নিয়ে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তর্কচূড়ামণি মশায় আমার সব কথা আগ্রহ নিয়ে শুনলেন, যথেষ্ট যত্ন করলেন, আমার আগ্রহের প্রশংসাও করলেন। তিনি বল্লেন: 'বাবা, আমার তো এক মুহূর্ত অবসর নেই যে তোমায় পড়াই। আজকাল আবার নানান জায়গায় নানান বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি। তবে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কাছে যদি যেতে পার, তিনি নিশ্চয়ই পড়াবেন। তোমাকে আমিই পাঠাচ্ছি—এ'কথা তাঁকে বলবে। তিনি একজন বেশ বড় পণ্ডিত'।

'অগত্যা তথাস্তু ব'লে ঠিকানা নিয়ে তখনি কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা বলাতে তিনি বল্লেন: 'বাবা, আমারও সময় অত্যন্ত কম। তবে এখন আমি পাতঞ্জলদর্শনের বাংলা অনুবাদ করছি। তুমি সকাল আটটা নটার সময় আসবে, আমার সেবক তখন গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়, আমি সে' সময়েই তোমায় সূত্রের অর্থ ব'লে দিতে পারব'। আমি তাতেই রাজী হ'য়ে তাঁর কাছে পড়া আরম্ভ ক'রে দিলাম'।

'পাতঞ্জলদর্শন শেষ ক'রে নিজেই গীতা পড়লাম। যোগ-শিক্ষা করার ইচ্ছা আমার ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগলো। একখানা শিবসংহিতা কিনে পড়লাম। হঠযোগ, কুণ্ডলিনীযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের সব রকম সাধনপ্রণালী তাতে দেওয়া আছে। শুধু পড়া নিয়ে তখন আর প্রাণে শান্তি পেলাম না। হাতেনাতে যোগসাধন করার

বাসনাই আমায় পাগল ক'রে তুললো। খেচরীমুদ্রা অভ্যাস ক'রে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে থাকব এই ইচ্ছা তখন মনের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠলো'।

'কিন্তু শিক্ষাগুরু চাই। গুরুই বা পাব কোথা? আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম একজন হঠযোগীর কথা। হঠযোগী ছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে। খিদিরপুরে ভূকৈলাসের রাজকর্মচারীরা তাঁকে সমাধিস্থ অবস্থায় ভূকৈলাসে নিয়ে আসে। যোগী তাঁর জিবটা টাক্‌রায় উল্টে দিয়ে সর্বদা সমাধিস্থ ছিল। আমি শুনে দিনকতক পদ্মাসন ক'রে বসে জিবটা ওলটাবার চেষ্টা করেছিলাম। বাড়ীর সকলকে সে'কথা বলতামও। শুনে সবাই হাসতো, ঠাট্টাও করতো'।

'কিন্তু আমার মনের তীব্র আকুলতা অন্যে কি ক'রে বুঝবে বলো? ঘটনাচক্রে আমার ছেলেবেলার সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) একদিন বল্লেঃ 'ভাই, দক্ষিণেশ্বরে একজন অদ্ভুত যোগী পরমহংস আছেন, রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে তিনি থাকেন। লোকে বলে পাগল, কিন্তু আসলে তিনি একজন মহাযোগী। অনেক বড় বড় লোক কলকাতা থেকে তাঁকে দেখতে যায়। তুমি তাঁর কাছে যেতে পার, তিনি তোমায় যোগ শেখাতে পারেন'। শুনে আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। মনের কথা তার কাছে কিছু গোপন করতে পারলাম না। আমার যোগশিক্ষার ইচ্ছা তাকে খুলে বল্লাম। সে শুনে বল্লেঃ 'বেশতো, আমি তোমায় একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাব'। আমার মনের ভেতর সে'দিন কি যে আনন্দ হয়েছিল তা' আর কি বলবো'।

'দক্ষিণেশ্বরের যোগী পরমহংসকে দেখার ইচ্ছা আমার তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠলো। যজ্ঞেশ্বর থাকত বাগবাজারে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে। কিন্তু তার বাড়ীর নম্বর (৫৭) আ'ম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করলাম দক্ষিণেশ্বরের কথা। দেখলাম তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না। কাজেই একদিন রবিবার সকালে বেরিয়ে পড়লাম কাকেও কিছু না ব'লে। চিৎপুর রোড ধ'রে হাটতে হাটতে বাগবাজারে পৌঁছুলাম। রামাকান্ত বসু ষ্ট্রীটে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের বাড়ীর কোন হদিস করতে পারলাম না। মন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো তখন। পরিশেষে ঠিক করলাম নিজেই জিজ্ঞাসা করতে করতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওয়ানা হবো।

'করলামও তাই। বাগবাজার পোলের ওপর দিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা চলতে লাগলাম। মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ্দুর। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। অনেকখানি চলার পর একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম রাণী রাসমণির কালীবাড়ী কতদূর : লোকটি আমায় গঙ্গার ধার দিয়ে সোজা হেঁটে যেতে বল্লে। অগত্যা তাই করলাম। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে আড়িয়াদহ গ্রামে হাজির হলাম। সেখানে জিজ্ঞাসা করতে একজন আমায় পথ দেখিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ চলার পর কালীবাড়ীর উত্তর দিকে গেটের ধারে হাজির হলাম। বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়ে কালীমন্দিরে গেলাম। খালি পা। অতো সুদীর্ঘ পথ চলা জীবনে আমার সেই প্রথম। একজন কর্মচারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম পরমহংস মশায়ের কথা। সে' লোকটি পরমহংস মশায়ের ঘরটা দেখিয়ে বল্লেঃ 'তিনি থাকেন

ওই ঘরটায়। আজ কলকাতায় গেছেন'। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ঘরে চাবি দেওয়া। আশা ছিল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংস মশায়কে দেখতে পাব। কিন্তু তিনি নাই দেখে একটা সিঁড়ির ওপর হতাশ হ'য়ে বসে পড়লাম। দারুণ পিপাসায় ও ক্ষুধায় আমার সর্বশরীর তখন অবসন্ন। হাতে একটাও পয়সা নেই। কি করব ঠিক করতে পারলাম না। ত্বঃখে চোখে জল এলো'।

'তারপর দেখি একটি যুবক, হাতে ছাতা, গেট দিয়ে প্রবেশ ক'রে আমার দিকে আসতে লাগলো। আমিও তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে ছিলাম। যুবক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেঃ 'পরমহংসদেব আছেন?' আমি বল্লামঃ 'না, তিনি কলকাতায় গেছেন'। যুবকও একটু হতাশ হ'য়ে আমার পাশে এসে বসলো। ত্ব'জনের মধ্যে তখন কিছুক্ষণ আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে পরমহংস মশায়ের দেখা হ'ল না, বাড়ী ফিরতে হবে শুনে সে আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লেঃ 'সে কি, ফিরবে কেন? এসেছ যখন, দেখা ক'রে তবে যাবে'। আমি বল্লামঃ 'বাড়ীতে কাকেও বোলে আসিনি, সকলে চিন্তা করবে'। যুবক বল্লেঃ 'আমিও তাই। বাপ-মাকে না ব'লে পায়ে হেঁটে সোজাসুজি কলকাতা থেকে আসছি। বাপ-মা একদিন একটু ভাবলে তো আর কি হ'ল। গঙ্গায় স্নান-টান সেরে মা-কালীর প্রসাদ পাবে চলো'।

'কথায় কথায় যুবকের নাম জানলাম শশিভূষণ চক্রবর্তী, কলকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা গলিতে তার বাড়ী। যুবক তার আগে আরো ত্ব'একবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। পরমহংসদেবের ভাইপো রামলাল দাদা ও পূজারীদের সঙ্গে তার বেশ

আলাপ-পরিচয় ছিল, কাজেই স্নান-আহারের জন্য কোন অসুবিধা হ'ল না। যুবক খুঁজে-পেতে একখানা কাপড় জোগাড় করলে। পালা ক'রে সেই কাপড় পরে দু'জনে গঙ্গায় স্নান করলাম। পরে মা-কালীর প্রসাদ পাওয়া গেল। মা-কালীর প্রসাদ লাভ আমার জীবনে সেই প্রথম'।

'আহারের পর বিশ্রাম ক'রে কলকাতায় ফিরব কিনা চিন্তা করতে লাগলাম। যুবক আমায় চিন্তিত দেখে বল্লে: 'ভাবছ কি?' আমি বল্লাম: 'বাড়ী ফিরব কিনা ভাবছি'। যুবক বল্লে: 'তাও কি কখনো হয়? বাপ-মা ভাববে? ভাবুক না। আজ একটু ভাববে, কাল আবার তোমাকে দেখলে আনন্দে সব ভুলে যাবে। তোমার মতো আমারও তো ঐ এক দশা। আমিও বাপ-মাকে ব'লে কোনদিন আসিনি। আজ রাত্রিটা এখানে থাকো। রাত্রেই পরমহংসদেব আসবেন। তাঁকে দর্শন ক'রে কাল সকালে একসঙ্গে কলকাতা ফেরা যাবে'।

'যুবকের কথা শুনে মনে বল এলো। শেষে ঠিকই করলাম— যা আছে কপালে, পরমহংসদেবকে দর্শন ক'রে তবে বাড়ী ফিরবো'।

'ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। মা-কালীর মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি যুবকের সঙ্গে গিয়ে মা-কালীর মন্দিরে আরতি দেখলাম। আরতি দেখে হৃদয় এক অব্যক্ত ভাবে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। আরতি শেষ হ'ল। আমরা পরমহংসদেবের ঘরের সামনে বারান্দাটায় বসে আবার বিশ্রাম করতে লাগলাম। শশিভূষণের সঙ্গে তখন বেশী রকমভাবেই আলাপ জমে উঠলো। ব্যথার ব্যথী হিসাবে পরস্পরের মধ্যে টানও হয়েছিল যথেষ্ট। দু'জনে

নানান রকম আলোচনা ক'রে সময় কাটাতে লাগলাম, বাড়ীর কথা বিন্দু-বিসর্গ আর মনে ছিল না। কিছুক্ষণ পরে রামলাল দাদা শীতলভোগের প্রসাদী দু'খানা লুচি ও একটু চিনি এনে শশী ও আমাকে ভাগ ক'রে দিলেন। আমরা সেই প্রসাদী লুচি চিনি দিয়ে খেয়ে একটা মাদুর বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। রামলাল দাদা কাছেই ছিলেন। তারপর কি হ'ল শুনলে তোমরা নিশ্চয়ই হাসবে'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'কি মহারাজ ?'

স্বামিজী মহারাজ : 'সে সময়ের আমার মনের চিন্তার কথা। বারান্দায় শুতে না শুতেই শশী একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রামলাল দাদাও তাই। আমার চোখের পাতায় কিন্তু একটুও ঘুম এলো না, কেবলই মনে হ'তে লাগলো পরমহংসদেবের কথা। ভাবলাম জটাজুট-কৌপীনধারী, আপাদমস্তকে ভস্মমাখা, হাতে চিম্‌টে, রক্তচক্ষু এই রকমই বোধহয় হবেন পরমহংস মশায়। কত কথাই না তখন মনে হ'তে লাগলো পরমহংসদেব সম্বন্ধে। চিমটে হাতে নিয়ে তাড়া করার ভয়ও যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল না তা' নয়। ভাবলাম তাড়িয়েও তো তিনি দিতে পারেন। এম্‌নি নানান রকমের উদ্ভট চিন্তায় চোখে আর ঘুম এলো না, জেগে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কাটলো। এমন সময় একটা গাড়ীর চাকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা গেল। রামলাল দাদা শুনেই ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়লেন। শশীও তাই। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। রামলাল দাদা আমাদের বল্লেন : 'এই পরমহংসদেব আসছেন'। কি জানি কেন, পরমহংসদেব আসছেন শুনে আমার হৃদয়ের ভেতরটা ভয়ে ক্যামন গুর গুর

ক'রে উঠলো। আমি পরমহংসদেবের প্রতীক্ষায় বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম'।

'সকলেই নির্বাক্। দেখলাম পরমহংসদেব গাড়ী থেকে নেমে উত্তর বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার সময় গুরু গম্ভীর স্বরে তিনবার ব'লে উঠলেন—কালী, কালী, কালী। দক্ষিণেশ্বরের বিস্তৃত উঠান, বাগান ও চারিদিক তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠলো। ঘরে প্রবেশ ক'রে তিনি ছোট তক্তাপোষটির ওপর বসলেন। পেছনে একজন বালক সেবক তাঁর গামছা ও এলাচি প্রভৃতি মুখশুদ্ধির বেটুয়াটি নিয়ে প্রবেশ করল। পরে জেনেছিলাম তার নাম লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), পশ্চিমদেশে (ছাপরায়) বাড়ী, পরমহংসদেবের সেবা করে। রামলাল দাদা ও শশী ঘরে প্রবেশ ক'রে পরমহংসদেবকে প্রণাম করলে। আমি তখনো বারান্দার একপাশে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে। রামলাল দাদা আমার কথা পরমহংসদেবকে বল্লেন। পরমহংসদেব শুনে বল্লেন : 'বেশ তো, নিয়ে এসো'। রামলাল দাদা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন। আমি তাঁর পা-দু'খানির ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলাম। হৃদয়ের সমস্ত ভয়—সমস্ত জড়তা যেন চোখের নিমিষে তখুনি দূর হ'য়ে গেল, শান্তির তরঙ্গ সারা দেহের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। সে যে কি আনন্দ তা' ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। সে' সব কথা এখন সত্যিই যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কি যে তাঁর ভালবাসা'।

স্বামিজী মহারাজ নীরব ও গম্ভীর। কিছুক্ষণ সে'ভাবে থাকার পর স্মিতহাস্যে তিনি আবার বল্লেন :

'তারপর পরমহংসদেব একসঙ্গে অনেকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করলেন: কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথা? তোমার নাম কি? কি জন্যে এসেছ? কি চাও? আমি আমার নাম, ধাম, মনের ইচ্ছা সবই তাঁকে একে একে নিবেদন করলাম। শেষে বল্লাম: 'আমি যোগ শিখতে চাই। আপনি কি আমায় যোগ শেখাবেন?'

'পরমহংসদেব কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। আমিও নির্বাক। শরীরবোধ তখন যেন একরকম লোপ পেয়ে গিস্‌লো। কতক্ষণ পরে তিনি আবার বল্লেন: 'যোগ শিখবে? বেশ তো। তুমি পূর্বজন্মে একজন বড় যোগী ছিলে। একটু বাকি ছিল—তাই। এই তোমার শেষ জন্ম। আজ রাত্রে এখানে থাকো, কাল সকালে এসো'।

'আমি শুনে আশ্বস্ত হলাম। পরমহংসদেবকে প্রণাম ক'রে বাইরের বারান্দায় এসে আবার শুলাম। চোখে ঘুম এলো না, শুয়ে শুয়ে পরমহংসদেবের কথাই কেবল ভাবতে লাগলাম। ভাবলাম—কই জটা, চিমটে, কমুণ্ডলু, গায়ে ছাইমাখা ওসব কিছুই তো নাই। মাথাও কামানো নয়, অল্প অল্প বরং দাড়ি আছে। পরণে গেরুয়া নয়, লালপেড়ে সাদা ধুতি, পায়ে চটি জুতো, গায়ে জামা, আর কোঁচার খুঁট্‌টা কাঁধে ফেলা। ঘরে শোবার তক্তাপোষ, তার ওপর ছোটখাট গদি দেখলাম, তাকিয়াও আছে। আশ্চর্য এই সাধু, আশ্চর্য এই পরমহংস। এই সব কত চিন্তাই না তখন মনের মধ্যে আসতে লাগলো। আর মনের মধ্যে অপূর্ব একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। শশীভূষণ ইতিমধ্যে পরমহংসদেবের কাছ থেকে ফিরে এসে আবার

আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি কিন্তু জেগে থাকলাম, চোখে একটু মাত্র ঘুম এলো না। সারাটি ক্ষণ পরমহংসদেবের কথা চিন্তা করতে করতে অব্যক্ত এক আনন্দের স্রোতে ডুবে সারা রাত্রি প্রায় জেগেই কাটালাম। ভোর হ'তে না হতে বিছানা থেকে উঠে গঙ্গায় স্নান সেরে নিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুম না হ'লেও শরীরে কোন গ্লানি বোধ করলাম না। তারপর উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন আবার পরমহংসদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়'।

'সূর্য তখন উঠেছে। নহবৎখানার সানাইয়ের শব্দ গঙ্গার তরঙ্গের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছিল। অন্তরের আবেগ ও আকুলতা ক্রমশই আমাকে পাগল ক'রে তুলছিল। এমন সময় রামলাল দাদা এসে বল্লেন: 'পরমহংসদেব তোমায় ডাকছেন'। আমি আগে থাকতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি পরমহংসদেব আপনভাবে ছোট্ট ছেলেটির মতো তক্তাপোষের ওপর বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। তিনি স্নেহভরে বল্লেন: 'এই মাদুরটায় বসো'। আমি বসলে তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি কতদূর পড়েছ?'

'আমি বল্লাম আমি এখনো এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি'।

'তুমি সংস্কৃত জানো? শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড়েছ?'

'বল্লাম—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য, গীতা, পাতঞ্জলদর্শন, শিবসংহিতা এ'সব পড়েছি'।

'পরমহংসদেব আমার কথা শুনে ভারি খুসী হ'য়ে বল্লেন: 'বেশ, বেশ'। তারপর তক্তাপোষ থেকে উঠে তিনি আমাকে

উত্তর দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানেও একখানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। বসার জন্য আমায় ইঙ্গিত করলেন। আমি বসলে তিনি আমায় জিব (জিহ্বা) বার করতে বল্লেন। তিনি তাঁর ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে জিবের ওপর কি একটি মূলমন্ত্র লিখে দিলেন.। আনন্দধারায় সমস্ত শরীর যেন আপ্লুত হ'য়ে গেল। ডান হাতখানি আমার বুকে দিয়ে তিনি নাভি থেকে কুণ্ডলিনীশক্তি ওপর দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। আমি তখন একরকম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি আমায় মা কালীর ধ্যান করতে বল্লেন। আমি ধ্যান করতে করতে অপার আনন্দসাগরে ডুবে স্থির হ'য়ে গেলাম, বাইরের কোন জ্ঞানই আর তখন থাকলো না। কতক্ষণ যে সেই রকমভাবে কেটেছিল তা বলতে পারিনি, তবে জ্ঞান হ'লে দেখলাম পরমহংসদেব আমায় স্পর্শ ক'রে আছেন। তিনি আমার ঊর্ধ্বগতি কুণ্ডলিনীশক্তিকে বুকে হাত দিয়ে আবার নীচে নাভিতে নামিয়ে আনলেন। সহজ অবস্থায় ফিরে এলে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কি দে্খলি গভীর ধ্যানে?' যে'সব অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল ধ্যানে, তাই তাঁকে বল্লাম। তিনি শুনে খুসি হ'য়ে বল্লেনঃ 'তোর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই তো?' আমি বল্লামঃ 'না।' তিনি বল্লেনঃ 'হ্যাঁ, বিয়ে করিস নি'।

তারপর স্বামিজী মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেনঃ 'তারপর তো তোমরা সবই জানো। আমায় তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) দিব্যভাবের শিক্ষা দিয়ে বল্লেনঃ

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি।
তুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥

'তারপর প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে শোবার আগে বিছানায় বসে ধ্যান করার জন্য উপদেশ দিলেন ও বল্লেন: 'এখন ধ্যানে যা-যা দর্শন করবি সব এখানে এসে বলবি'। তিনি কালীমন্দিরে গিয়ে আবার আমায় ধ্যান করতে বল্লেন। তাই করলাম। কালীমন্দির থেকে ফিরে এলে তিনি সস্নেহে আমার হাতে মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে বল্লেনঃ 'খা'। আমি প্রসাদ খেলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে কলকাতা ফেরার জন্য বিদায় প্রার্থনা করলাম। তিনি স্নেহমাখা স্বরে বল্লেন: 'আবার আসিস। শেয়ারের নৌকো কিংবা গাড়ী ক'রে এখানে এলে সুবিধে হবে'। আমি বল্লামঃ 'যদি ভাড়া যোগাড় করতে না পারি?' তিনি বল্লেন: 'আস্‌বি। তার আর কি, আমি যোগাড় ক'রে দেবো'।

'এরই ভেতর দেখি কলকাতা থেকে একজন বড়লোক ভক্ত ঘোড়ার গাড়ী ক'রে পরমহংসদেবের কাছে এসে উপস্থিত। তিনি প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে পরমহংসদেব আমার দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বল্লেনঃ 'তুমি এই ছেলেটিকে কলকাতা পৌঁছে দিও তো'। তিনি হাতজোড় ক'রে বল্লেনঃ 'জিয়াজ্ঞে'। তারপর পরমহংসদেবকে প্রণাম ক'রে আমি বিদায় নিলাম ও সেই ভদ্রলোকটির গাড়ীর ওপরে কোচবাক্সে বসে কলকাতা রওহনা হলাম। আসার সময় সারাটা রাস্তা কেবল ভাবতে লাগলাম পরমহংসদেবের কথা, আর তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা ও করুণার কথা!'

স্বামিজী মহারাজ কথাগুলি বলতে বলতে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজেছে। আমরা শশব্যস্তে উঠে বল্লামঃ 'মহারাজ, সাড়ে তিনটে প্রায় বাজে, আপনি বিশ্রাম করুন আজ'।

তিনি হাসেত হাসতে বল্লেন: 'হ্যাঁ, শুধু আমি কেন, তোমরাও বিশ্রাম করগে এবার। রাত্রি অনেক হ'ল, কাল তো আবার সকাল সকাল উঠতে হবে'। তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও আমাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে গাইতে লাগলেন,

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে-যাগে জেগে আছি,
তোর ঘুম তোরে দিয়ে মা,
আমি ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

'বুঝলে তো? ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি'। আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ'। সমস্ত ঘর যেন গানের সুরে ভরে উঠেছিল। স্বামিজী মহারাজ তাঁর শোবার ঘরে গেলেন। অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দ ও উন্মাদনা নিয়ে আমরা নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে নীচে নেমে এলাম। ঘড়িতে তখন টুঙ্ টুঙ্ ক'রে চারটে বেজে উঠলো!

॥ স্মৃতি ঃ বারো ॥

সে'দিন বুধবার। সকাল সাড়ে আটটা কি ন'টা হবে। স্বামিজী মহারাজ তখন কলকাতার মঠে (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে গেছি। প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই তিনি হাতে একখানি সবুজ মলাটের বাঁধানো খাতা দিয়ে বল্লেন ঃ 'কপি (copy) ক'রে দেবে তো এটা'।

আমরা বল্লাম ঃ 'এটা কি মহারাজ?'

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'আমার জীবনকথা। দার্জিলিঙে (বেদান্ত আশ্রমে) থাকতে (১৯৩৬ খ্রীঃ) সময় পেলেই বসে বসে সাদাসিদে বাংলায় আমার ছেলেবেলা থেকে জীবনের সব ঘটনা লিখে রাখতাম। সময়ই বা কোথা বলো? এই দুটোমাত্র খাতা হয়েছে'।

আমরা ঃ 'কতটুকু লিখেছেন?'

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'বাল্যজীবন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাওয়া পর্যন্ত। তারপর পরিব্রাজক অবস্থায় সারা ভারতের নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি সে-সবের খানিকটা পর্যন্ত ঘটনা'।

আমরা ঃ 'মহারাজ, সবটাই লিখে শেষ করুন·· না কেন?'

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'সময় কই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ থেকে পেনসন ভোগ ক'রেও তো কাজের আর অন্ত নেই! এখন জীবনের শেষ কাজ হ'ল সোসাইটিকে দেবোত্তর ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সঁপে দেওয়া। সে' কাজটাই যা এখন

বাকী'। অবশ্য এই শেষ কাজও স্বামিজী মহারাজের পূর্ণ হয়েছিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী (৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৫, (মঙ্গলবার), যখন ট্রাষ্ট-ডিড রেজেষ্ট্রী ক'রে তিনি সোসাইটীর নবরূপ দিলেন তাকে 'মঠ' নামাঙ্কিত ক'রে। কলিকাতায় ১৯নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নিজস্ব জমি ও কতকগুলি ঘর-বাড়ী তখন হয়েছে। এতদিন ছিল বরাবরই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মঠ বা আশ্রম (তখন নাম ছিল রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামিজী মহারাজ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে প্রথমে বেলুড় মঠে ওঠেন। তারপর কাশ্মীর ও তিব্বতের নানান স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর তিব্বতে ভ্রমণ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিমিস গুম্ফায় (মঠে) যাওয়া। রুশ-পর্যটক নিকোলাস নোটোভিচ (Nicolas Notovitch)-লিখিত 'আন্‌নোন্ লাইফ অফ যীশাস ক্রাইষ্ট' (*Unknown Lile of Jesus Christ*) বইয়ে তিনি পড়েছিলেন যীশুখৃষ্ট ভারতে এসেছিলেন। নিকোলাস নোটিভিচ হিমিস মঠের গ্রন্থাগারে একটি পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাতে যীশুখৃষ্টের ভারতে আসার ও ভারতে শিক্ষা-দীক্ষার কথা লেখা ছিল। নোটোভিচের বইখানি স্বামিজী মহারাজ আমেরিকা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন।

রুশ-পর্যটক নোটোভিচ ঠিক তুর্ক-রুশীয় যুদ্ধের (১৮৬৭—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) পরই তাঁর প্রাচ্যদেশে ভ্রমণের অভিযান শুরু করেন। বল্কান পেনিনসুলার বিভিন্ন স্থানগুলি পর্যটন ও ককেশীয়-পর্বত অতিক্রম ক'রে তিনি মধ্য-এসিয়ায় ও পারস্যে যান ও পরিশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে

আসেন। তিনি আফগানিস্থানের সুরম্য বোলান ও গুরনাই গিরিপথের (Pass) ভেতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ ক'রে সিন্ধুদেশ থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ও পাঞ্জাবে যান। তারপর রওহনা হন কাশ্মীর ও পরে লাডাকের (Ladak) ভেতর দিয়ে তিব্বতের দিকে। তিব্বতের কোন একটি বৌদ্ধমঠের প্রধান লামার কাছে হিমিসগুম্ফায় রক্ষিত একটি পুঁথির কথা তিনি জানতে পারেন। পুঁথিতে ছিল যীশুখৃষ্টের ভারতে আসার কথা। তাঁর ভ্রমণ ও পুঁথির প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন : 'In course of one of my visits to a Buddhist convent, I learned from the chief Lama that there existed very ancient memoris, treating of the life of Christ and of the nations of the Occident, in the archives of Lassa, * *. During my sojourn in Leh, the capital of Ladak, I visited Himis, a large convent in the outskirts of the city, where I was informed by the Lama that the monastic libraries contained a few copies of the manuscript in question. * * * And I took advantage of my short stay among these monks to obtain the privilege of seeing the manuscripts relating to Christ. With the aid of my interpreter who translated from the Thibetan tongue, I carefully transcribed the verses as they were read by the Lama.'

২। *Cf. The Unknown Life of Jesus Christ* (4th edition, Chicago, 1916), Preface, pp. 8-9.

তখন লাডাক পাস (Pass) দিয়ে য়ুরোপ থেকে ভারতে প্রবেশ করার একটি মাত্র পথ বা যোগসূত্র ছিল। ঐ পথ দিয়ে যীশুখৃষ্ট ভারতে এসেছিলেন। জেরুজালেম ত্যাগ ক'রে একদল সাওদাগরের সঙ্গে তিনি নাকি সিন্ধুদেশে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। পঞ্চনদের দেশ অতিক্রম ক'রে তিনি একাকী পদব্রজে নানান দেশ ঘুরতে ঘুরতে পরিশেষে জগন্নাথধাম পুরীতে, রাজগৃহে, কাশীতীর্থে ও গয়ায় যান। সেখান থেকে যান বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু-নগরে। সেখানে ছ' বছর পালিভাষা শিক্ষা ক'রে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নেপাল ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন। 'তারিখ-ই-আঝাম' নামক আরবি গ্রন্থে এই ধরণের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যীশু কাবুলের কাছে পথের পাশে একটি পুষ্করিণীতে হাত পা ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। এখনও ঐ পুষ্করিণীটির নাম নাকি 'ঈশা-তালাও' ও ঐ স্মৃতির উপলক্ষে এখনও ওখানে প্রতি বছর একটি মেলা বসে। হিমালয়-প্রদেশগুলিতে ভ্রমণ ক'রে যীশুখৃষ্ট আবার পারস্যদেশে যান। তাছাড়া একটি প্রবাদ যে, যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পর তাঁর শিষ্য-সেবকরা যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে পুনর্জীবন দান করেন তখন আত্মগোপনের জন্য তিনি লাডাক পাশ অতিক্রম ক'রে কাশ্মীরে আসেন ও সেখানেই কিছুদিন পরে তাঁর দেহাবসান ঘটে। বিশেষ ক'রে বৌদ্ধলামাদের ভেতর এই বিশ্বাস প্রবল। কিন্তু এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু তা' নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খানাইয়ারীতে এখনও যীশুখৃষ্টের একটি সমাধিস্থান পাওয়া যায়। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' তার একটি ছবিও দিয়েছেন।

নিকোলাস নোটোভিচ তাঁর *The Unknown Life of Jesus Christ* বইয়ে হিমিস-মঠে রক্ষিত পুঁথি থেকে যীশুখৃষ্টের ভারতে আসার বিবরণের অনুবাদ দিয়েছেন, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু জানি না। স্বামী অভেদানন্দ হিমিস মঠে গিয়ে প্রধান লামার কাছে ঐ পুঁথির অনুসন্ধান করেছিলেন। যে লামা স্বামিজী মহারাজকে হিমিস-মঠটি তন্ন তন্ন ক'রে দেখিয়েছিলেন, তিনি গ্রন্থাগারের তাক থেকে একখানি পুঁথি পেড়ে বলেছিলেন যে সে'টি নকল পুঁথি,আসলখানি লাসার নিকটবর্তী 'মারবুর' নামক বৌদ্ধমঠে রাখা আছে। আসল পুঁথিটি পালিভাষায় লেখা, কিন্তু নকলখানি ছিল তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করা। নকলটিতে ১৪টী পরিচ্ছেদ ও ২৪৪টী শ্লোক ছিল। স্বামিজী মহারাজ সেই লামার সাহায্য নিয়ে শ্লোকের অধিকাংশ বাংলায় অনুবাদ ক'রে নিয়েছিলেন এবং তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' (পৃঃ ২৮৩—৩৮৫) বইখানিতে কতকাংশ প্রকাশও করেছেন। নিকালাস নোটোভিচ পুঁথিখানির যে অনুবাদ করেছিলেন তার সারাংশ হ'ল :

"10" When Issa had attained the age of thirteen, when an Israelite should take a wife, * * 12. It was then that Issa clandestinely left his father's house, went out of Jerusalem, and, in company with some merchants, travelled toward Sindhu. * * (Ch-V) 1. In the course of his fourteenth year, young Issa, blessed by God, journeyed beyond the Sindh and settled among the Aryas in the beloved country of God. 2. * * When

he passed through the country of the five rivers and the Radjipoutan, the worshipers of the god Djaine begged him to remain in their midst. * * 5. He spent six years in Juggarnaut, Sajegriha, Benares, and the other holy cities ; * * (ch. VI). 2. * * and took refuge in the Gothamide Country, the birth-place of the great Buddha Cakeya-Mouni, * * 3. Having perfectly earned the Pali tongue, the just Issa applied himself to the study of the sacred rolls of Soutras. * * 5. He then left Nepal and the Himalaya Mountains. descended into the valley of Rajipoutan and went westward, * * (ch. VIII). 1. The fame of Issa's sermons spread to the neighbouring countries, and, when he reached Persia, * *'[৩]

যীশুখৃষ্ট এসেনী-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন। আর্থার লিলি (Arther Lillie) তাঁর *India in Primitive Christianity* বইয়ে (পৃঃ ২০০) একথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and 'the gifts of the Spirit' by solitary reverie in retired spots'। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : 'এসেনী' নামটি ভারতীয় 'ঈশান' শব্দ থেকে এসেছে বোলে

৩। (ক) Cf *The Unknown Life of Jesus Christ* (1916), pp. 106-113, 119.

(খ) স্বামী অভেদানন্দ ; কাশ্মীর ও তিব্বতে, পৃঃ ২৮৩—২৮৫

বোধ হয়। ঈশান শিবের বোধক, শিবই বিশেষভাবে যোগের দেবতা। 'Essene' নামটি তাহা হইলে ঈশান বা শিবেরই উপাসক অর্থে 'ঈশানী' নামের রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। 'ঈশ'-ও শিবের বিশেষ নাম। 'ঈশাই নাথ' নামও ঈশের উপাসক অর্থ প্রকাশ করে। 'নাথ' শব্দটি পৃথকভাবে শিবের জ্ঞাপক। যোগীসম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়া 'নাথ' নামের যোগের দ্বারা 'নাথযোগী' বলিয়া অভিহিত। যীশুখৃষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগী-সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাস্য দেবতার নামে 'ঈশাই নাথ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্যালেস্তাইনে 'ঈশানী যোগী-সম্প্রদায়' থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপে শিক্ষার জন্য যীশুখৃষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব নহে'।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন যীশুখৃষ্টের জীবনচরিতকার ষ্ট্রাসের (D. F. Strauss) অনুরাগী ছিলেন, স্বামিজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) তেমনি আর্ণেষ্ট রেনাঁর (Ernest Renan) গুণগ্রাহী ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ যীশুখৃষ্টের ভারতে আসার কথা বিশ্বাস করতেন। যীশুখৃষ্ট যে এসেনী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং এসেনী-সম্প্রদায়ের ধর্মমত নিছক বৌদ্ধ শ্রমণদের সংস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছিল একথা তিনি তাঁর *India and Her People* বইয়ে (২২৭—২২৮) স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'Philosophers like Schelling and Schopenhauer, and Christian thinkers like Dean Mansel and D. Millman, admit that the sect of the Essenes arose through the influence of the Buddhist missionaries

who came from India. Moreover, it is a well-known fact that John the Baptist was an Essene'। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালও যীশুখৃষ্টের ভারতে আসার কথা বিশ্বাস করতেন। তিনি 'সত্তর বৎসর' নামক আত্মজীবনীর একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: 'বাইবেলে যীশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎবর্ষ পর্যন্ত এই ১৮ (?) বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ-খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই নাথযোগী-সম্প্রদায়ের এই ঈশাইনাথ।'[৫]

নিকোলাস নোটোভিচ যীশুখৃষ্টের ভারত-ভ্রমণের কাহিনীকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর ভারতে আসার দু'টি কারণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'It is to be supposed that Jesus Christ choose India, first, because Egypt made part of the Roman possessions at that period, and then because an active trade with India had spread marvellous reports in regard to the majestic character and inconceivable riches of art and science in that wonderful country, where the aspirations of civilized nations still tend in our own age'.[৬]

তিনি আরও বলেছেন বাইবেলের প্রবক্তারাও যীশুখৃষ্টের

৪। *India and Her People*, (1905-6) p 227:

৫। 'প্রবাসী' পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৩ সাল।

৬। Cf. *The Unknown Life of Jesus Christ*, pp. 161-162

জীবনের ঠিক ধারাবাহিক যোগসূত্র খুঁজে পান নি, কেননা সেণ্ট লিউক নাকি বলেছেন : 'He was in the desert till the day of his shewing unto Israel'। এ'থেকে প্রমাণ হয় যে, যীশুখৃষ্টের ১৬ বছরের, অর্থাৎ ১৩ থেকে ২৯ বছর বয়সের ঘটনার কোন খোঁজ-খবর কেউ জানতেন না। ('Here the Evangelists again lose the thread of the terrestrial life of Jesus. * * which conclusively proves that no one knew where the young man had gone, to so suddenly reappear sixteen years later', p. 162)। সেণ্ট লিউক এ'কথারও উল্লেখ করেছেন : 'Jesus was about thirty years of age when he began to exercise his ministry' (p. 173)। তাছাড়া বৌদ্ধপ্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় যীশুখৃষ্ট ২৯ বছর বয়সে ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করেন ('commenced to prcach in his twenty-ninth year'), সুতরাং যীশুখৃষ্ট দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেছিলেন বিভিন্ন দেশে ও তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও ধর্মসাধন ক'রে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক রোরিক (Prof. Roorich) যখন আমেরিকার পক্ষ থেকে মধ্য-এসিয়ায় ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন তখন তিনিও তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে যীশুখৃষ্টের ভারতভ্রমণ-সংবলিত পুঁথি দেখেছিলেন। তাঁরও অভিমত হ'ল : 'Jesus Christ travelled through India preaching, and returned to Jerusalem when he was 29 years of age'.

হিমিস-গুম্ফা লে গ্রাম থেকে চব্বিশ মাইল পূর্বদিকে। তার কাছে স্তোকগ্রাম। স্বামিজী মহারাজ হিমস মঠে

উপস্থিত হ'লে সেখানকার লামারা তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁরা অনুরোধ করলে মঠের ভিজিটার্স বইয়ে (*Visitor's Book*) তিনি লিখেছেন: 'Swami Abhedananda, Vice-President of the Ramakrishna Mission, Belur Math, near Calcutta'.

ইংরেজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তিনি বেলুড় মঠ থেকে তিব্বত ভ্রমণের জন্য বার হয়েছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। হিমিস মঠে প্রবেশ ক'রে নানান বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তি দেখতে দেখতে তিনি একটি অন্ধকার কক্ষে উপস্থিত হন। সেখানে ছিল লামাগুরু স্তাগ-সা-রাস্-চেনের প্রতিমূর্তি। সকল মূর্তিই প্রায় সোনা-রূপোয় মোড়া ছিল। দেবী মন্দরা বা কুমারী-দেবীর মূর্তিও মঠের একটি পাশে ছিল। পদ্মসম্ভব বা গুরু রিন্-পোচের ইনি পত্নী ও শান্তিরক্ষিতের ভগ্নী। শান্তিরক্ষিতের প্রতিমূর্তি ছিল অন্য একদিকে। স্বামিজী মহারাজ মঠের ভিতর ঘুরে ঘুরে সকল মূর্তি দেখেছিলেন। বৌদ্ধযুগের স্বর্ণময় স্মৃতি সারা মঠকে যেন ঘিরে রেখেছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমন, বোধিলাভ, মারের মায়াজাল বিস্তার, পরিনির্বাণ ও পরবর্তী বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বর দেবদেবীর মূর্তি ও প্রাচীরগাত্রে তৈলচিত্র দিয়ে হিমিস মঠের অভ্যন্তর সুশোভিত ছিল। হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ধীরে ধীরে রূপ ও বেশ পরিবর্তন ক'রে বৌদ্ধ দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। এই রূপায়ণের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রামাণ্য নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ভেতর বেশ একটা মনকষাকষির

কাহিনীও জড়িত দেখা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ দেবদেবীরাই ছদ্মবেশ নিয়ে হিন্দু দেব-দেবীতে পরিণত হয়েছেন, আবার বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মত যে, হিন্দু দেবদেবীরাই বেশভূষা পরিবর্তন ক'রে বৌদ্ধ দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য এ-সব হ'ল নিছক ইতিহাস ও বিচারের কথা, তাই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে আমাদের আসল প্রসঙ্গে এখন ফিরে আসা যাক'।

স্বামিজী মহারাজ কথায় কথায় আবার বল্লেন: 'আমার জীবনকথার ঘটনা এতই বিচিত্র ও বিপুল যে, তার খুঁটিনাটি সব-কিছু লিখতে গেলে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু আমার সময় কই বলো! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি লেখো তো আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। আমেরিকায় থাকতে প্রত্যেক দিনের ডায়েরী (*Diary*—'রোজনামচা') লিখে রাখতাম। ইংরেজীতে *Leaves from My Diary* লিখতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু শেষ করতে পারবো কিনা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যেমন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজের হাত থেকে রেহাই পাননি, আমার ভাগ্যেও তাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করার মতো ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সে'রকম ছেলেই বা আসছে কই? নূতন ক'রে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে হবে, পুরোতন সমাজের বুকে নবচেতনার সঞ্চার করা দরকার। তবে নূতন জাগরণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জাগরণ যাতে আরও প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে এটাই রামকৃষ্ণসঙ্ঘের তোমরা এখন করবে। তোমাদের কর্তব্য

নিজেদের তৈরী করা ও সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও দশকে যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করা। 'আত্মনো-মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—এই হ'ল সন্ন্যাস-জীবনের ব্রত। পলিটিক্যাল ফিল্ডে (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) ঝাঁপিয়ে না পড়েও দেশ উদ্ধার করা যায়। স্বার্থত্যাগ, সেবাধর্ম, শিক্ষা, ভালবাসা, পরোপকার, ক্ষমা, মৈত্রী এ'সকল ব্রত নিজেদের জীবনে আচরণ ক'রে দেশ ও দশকে সেই আদর্শ শেখানোই সন্ন্যাসী-জীবনের কর্তব্য। চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার ছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিখায়' এই প্রেম ও ক্ষমাধর্ম নিজের জীবনে আচরণ ক'রে তিনি নির্বিচারে আপামর সকলকে ভালবেসেছিলেন, অসংখ্য লাঞ্ছনা ও নানান দুঃখ-কষ্ট ভোগ ক'রেও অকাতরে সকলকে কোল দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই মহান আদর্শ সন্ন্যাসীমাত্রের বরণীয়, তবেই মনুষ্য-জীবনে ত্যাগ-তপস্যার সার্থকতা থাকে। নিজের লোটা-কম্বল ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যদি সারাটা জীবন কেবল কাটে, তা হ'লে আর হ'ল কি বলো! শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেছিলেন: 'জীবে দয়া কিরে, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) তাই রামকৃষ্ণসঙ্ঘে সেবাব্রতের প্রবর্তন করলেন। তোমাদের জীবনের তাই উদ্দেশ্য হবে আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়। এটাই আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতকে শিখিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম living (জীবন্ত) ও practical (ব্যবহারিক), কেবল মুখে কতকগুলো শাস্ত্রের বাঁধাবুলি আওড়ানো নয়। মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও বর্তমান কালের উপযোগী এই

স্বামিজী মহারাজ আবার তাঁর কাশ্মীর ও তিব্বতে ভ্রমণ-কাহিনী নিয়ে বল্লেন: 'সারা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াবো এই ছিল আমার মনের বাসনা। শ্রীশ্রীঠাকুর সে' সাধ আমার পূর্ণ করেছিলেন'।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ, দেশভ্রমণে কি মনের সত্যিকারের কিছু উন্নতি হয়?'

স্বামিজী মহারাজ: 'হয় বৈকি, আর সে'কথা তো আমি আগেও অনেকবার বলেছি। বইয়ের পাতায় কাশীর বর্ণনা পড়া, আর নিজের চোখে কাশী দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এক রকম কথা নয়। তেমনি শাস্ত্রে ভগবানের কথা পড়া ও নিজে ভগবানকে দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সংসারের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। দেশভ্রমণের দ্বারাও অনেক উপকার হয়। তাছাড়া দেশভ্রমণে মনের বা চিত্তের প্রসারতা বাড়ে। একটা জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা মোটেই ক্ষতিকর নয়—যদি তুমি ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধন-ভজন করো, কিংবা জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যানুশীলন করো। কিন্তু কেবলই বিচারবিহীন কাজের মধ্যে কিংবা সংসারের জঞ্জালের ভেতর ডুবে থাকলে একটা জায়গায় পড়ে থাকা ভাল নয়, তাতে মনে ময়লা জমে। সংকীর্ণতা ও পরের দোষদৃষ্টি হ'ল সেই ময়লা। দেশভ্রমণে নানান লোকের ও নানান দেশের আচার-ব্যবহার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয় ও তাই থেকে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তাতে মনের সংকীর্ণ ভাব কমে যায়। আবার তা' একেবারে দূর হয়ে যায়—যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভগবানের ওপর যথার্থ মতি থাকে। কাজেই দেশভ্রমণ করা ভাল

বৈকি। তা'ছাড়া ভগবানের সৃষ্টি কত বিরাট, কত বিচিত্র এটা প্রত্যক্ষ করাও কি কম ভাগ্যের কথা! এই পৃথিবী ছাড়া ঈশ্বর তো আরও কত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন: চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, অনন্ত আকাশমণ্ডল—কত কি। তাঁর সৃষ্টি অনন্ত! অনন্তের ধারণা কি সহজে হয়! বিশ্বচরাচর, পশুপক্ষী, গাছপালা, বিশাল সমুদ্র, নদ-নদী আরো কত কিছু—তার কি আর ইয়ত্তা আছে। এ' সকলের জ্ঞান এক জীবনে হয় না। তবে সব-কিছু জানবো, সব জিনিস শিখবো—এ'ধরণের ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকা ভাল। বড় হবার ইচ্ছা সর্বদাই ভাল। তাতে মনের পরিধি বেড়ে যায়। Individual mind-কে (ব্যক্তিগত মনকে) cosmic mind-এ (বিরাট মনে) পরিণত করার নামই সাধনা। নইলে আসনে একটু বস্‌লে—কি চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ মালা জপ করলে—এটাই কেবল সাধনা নয়। মনের পরিধিকে বড় করতে হবে, individual mind-কে cosmic mind-এ পরিণত হবে—তবেই না। নিজের ছেলেপুলে, ভাই-বন্ধুদের যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসো, দুনিয়ার সকল মানুষকে শুধু নয়—জীবজন্তু বৃক্ষলতা সকলকেই তেমনি প্রাণঢালা ভালবাসতে হবে। তবেই মন হবে বিরাট। সংকীর্ণ মন নিয়ে যতই সাধন-ভজন, দেশভ্রমণ বা শাস্ত্রপাঠ করনা কেন, সব পণ্ডশ্রম হবে, আসল কাজ কিছুই হবে না'।

ঠিক সে' সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করলেন। স্বামিজী মহারাজ ভদ্রলোককে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'রে তাঁর কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে স্বামিজী মহারাজকে তাঁর

কুশলাদি দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'আমি মনে হয়, আপনাদের কথাপ্রসঙ্গের কিছুটা বিঘ্ন ঘটালাম'। আমরা সে' কথার উত্তরে কিছু বলার আগেই স্বামিজী মহারাজ নিজেই বল্লেন: 'না, না, সেকি কথা, কথা তো আমাদের দিনরাত্তিরই চলছে। আপনি এলেন এতদূর থেকে, একটু-আধটু কথায় বাধা এলো তো কি এসে গেল। আপনিও আমাদের সভার এখন একজন শ্রোতা হলেন। ভালই হ'ল, শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে বক্তার মনেও আনন্দ আসে'। তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন: 'কি বলো গো তোমরা, আমি সত্যিই তো বলছি?' আমরা শশব্যস্তে সকলে একসঙ্গে বললাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি'।

স্বামিজী মহারাজ আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'তাহ'লে আবার পূর্বপ্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। শ্রোতৃবর্গের নিশ্চয় এতে সম্মতি আছে, কি বলেন আপনারা?'

হঠাৎ স্বামিজী মহারাজের এ'ধরণের রসিকতায় আমরা প্রথমে একটু অপ্রতিভ হলাম। কিন্তু অবশেষে কেউ আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আমাদের হাসির সঙ্গে স্বামিজী মহারাজও যোগ দিলেন। কেবল আগন্তুক ভদ্রলোককে একটু গম্ভীর দেখলাম। আমরা মনে মনে তাই তাঁকে বেরসিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এরপর সেবক তামাক নিয়ে এলে স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'ভালই করেছিস, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক'। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'কি বলো তোমরা?' আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'আজ্ঞে হ্যাঁ বলা ছাড়া আর উপায় কি তোমাদের। তোমরা তো এ' রসে বঞ্চিত'। আমরা নির্বাক, স্বামিজী মহারাজের মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। প্রায় একমিনিট পরে আগের মতো তিনি আবার বল্লেনঃ 'আমেরিকা থেকে ফিরে গ্রীষ্মের দু'মাস আমি শিলঙে কাটাই। শিলঙ থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আসি। তারপর সম্ভবতঃ ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে আবার কাশ্মীর রওহনা হই। তার পরের দিন সকাল দশটায় বেনারস ষ্টেশনে পৌঁছোই। সেখান থেকে যাই কাশী সেবাশ্রমে। হরিভাই (স্বামী তূরীয়ানন্দ) তখন অসুস্থ হ'য়ে সেখানে ছিলেন। দেখি পৃষ্ঠব্রণরোগে তিনি শয্যাগত। অনেক দিন পরে হরিভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে'দিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তা' বলতে পারিনি। হরিভাই মহাজ্ঞানী—নির্লিপ্তচিত্ত ছিলেন। পৃষ্ঠব্রণের কোন কষ্টই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সর্বদাই হাসিমুখ। আমাকে দেখে তিনি আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন'।

'কাশী থেকে সারনাথ, হিন্দু ইউনিভার্সিটী প্রভৃতি দেখলাম। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে ইউনিভারর্সিটীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখালেন। পরিশেষে বল্লেনঃ 'স্বামিজী, আপনি তো প্রায় ২৫ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এলেন, এখন ২৫ দিন অন্ততঃ কাশীতে কাটান। আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু বেদান্তের কথা শুনি'। পণ্ডিতজী অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন। পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর অসাধারণ। পণ্ডিতজীকে আমি জানালাম যে,

অমরনাথ-দর্শনের সময় অত্যন্ত নিকট, কাজেই শীঘ্র কাশ্মীর রওহনা হ'তে হবে। অন্য সময়ে কাশী এলে নিশ্চয়ই তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করব'।

'কাশী থেকে পাঞ্জাব মেল ধ'রে লাহোর রওহনা হলাম। লাহোরের সুশীলকুমার মুখার্জীর বাড়ীতে উঠব আগে থেকে ঠিক ছিল। লাহোরে তখন অত্যন্ত গরম। মোটামুটী দ্রষ্টব্য স্থান—জুম্মা-মসজিদ, সালেমারবাগ, ঠাণ্ডি-সড়ক, সাহদারা প্রভৃতি দেখে পরের দিন রাওলপিণ্ডি রওহনা হলাম। সেখান থেকে মোটরবাসে কাশ্মীর যেতে হয়। ২২৲ টাকা দিয়ে ফ্রণ্ট্ সিট্ (seat) রিজার্ভ ক'রে বাসে ওঠা গেল। আমাদের গাড়ীতে ২০ জন উদাসী সাধু ছিল। তাদের গাঁজার ধোঁয়ায় গাড়ীর ভেতরটা অন্ধকার হ'য়ে গিস্‌লো। গাঁজার কল্‌কে টানার শব্দ ও সঙ্গে-সঙ্গে উদাসীদের মুহুর্মুহু হরিধ্বনির মধ্যে আমাদের বাস ছেড়ে চল্লো রাওলপিণ্ডি থেকে বার্‌কাও-এর দিকে। বার্‌কাও রাওলপিণ্ডি থেকে তের মাইল দূরে। তারপর ছত্তরগ্রাম। সেখানে পথ বেশ সমতল ছিল ও প্রাকৃতিক শোভাও অত্যন্ত সুন্দর। চড়াই-উৎরাইয়ের পথ অতিক্রম করতে করতে মারি বা কুমারী পার্বত্য সহর পার হ'য়ে ক্রমশঃ আমরা ব্রিটিশ ভারতের সীমানা কোহলায় উপস্থিত হলাম। সেখানে বিতস্তানদীর ওপর একটি ঝোলানো লোহার সেঁতু ছিল। নদীর অপর পারে ছিল ছোট একটি বাজার ও ডাকবাংলো। আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে কখনোও বা জঙ্গল অতিক্রম ক'রে আমাদের বাস ছত্তর নামক স্থানে উপস্থিত হ'ল। ছত্তর থেকে ক্রমাগতই উৎরাই, নীচের দিকে নামতে হয়। ঢালু পথ পেয়ে বাস তো গড়্‌গড়্ ক'রে নীচের

দিকে নামতে লাগল। ড্রাইভার বাসের ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিল। ক্রমশঃ আমরা ৭॥০ মাইল দূরে তুলাই নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানেও একটি সুন্দর ডাকবাংলো ছিল। সেখান থেকে পাহাড়ের ধার কেটে রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। মুজাফরাবাদের কাছে কার্‌নাল নামক একটি পাহাড়ের মাথায় বরফ জমা হ'য়ে ছিল দেখতে পেলাম। কার্‌নাল পাহাড়টি বোধহয় ১৪০০০ হাজার ফিট উঁচু। আমরা ক্রমে দোয়েল-এ গিয়ে পৌঁছালাম। বৈকাল তখন ৪॥০টা হবে। সেখানেও একটি ডাকবাংলো ছিল। সেখানে নেমে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে চা-পান শেষ করলাম। জায়গাটি ছিল ২১৭১ ফিট উঁচু। সেখানেও একটি ডাকঘর, চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী ও বাজার ছিল। তার কিছু দূরে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা নদী-দু'টি মিলেছিল। সেই জায়গাটাকেই দোয়েল বলা হত'।

'সেখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আবার আমাদের বাস ছেড়ে চল্লো কাশ্মীরের পথে। মোটামুটি ঘণ্টায় ১২ মাইল ক'রে বাস ছুটে চলছিলো। নানান স্থান অতিক্রম ক'রে আমরা গারি নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালাম। দোমেল থেকে গারি ১৪ মাইল ও ২৬২৮ ফিট উঁচু। গারিতে গিয়ে আমরা রাত্রি কাটালাম। গারি ছিল খুব ঠাণ্ডা জায়গা। গ্রীষ্মকালে সেখানে নাকি মশার উপদ্রব ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়'।

'সকালে চা-পান সেরে আবার আমরা রওহনা হলাম। কখনো নদীতীর, কখনো বা ছোট ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে পথ অতিক্রম ক'রে আমরা হাতিয়ান নামক গ্রামে পৌঁছালাম। এদিকে সেদিকে দু' একটা চানার গাছ দেখলাম।

সেখানে পাথরে মাটি মেশানো, ছোট বড় নুড়ি চারদিকে ছড়ানো ছিল। কিছুদূরে কার্‌নাল উপত্যকায় যাবার একটি পথ দিয়ে আমাদের বাস ছুটতে লাগলো। সেখানে ছোট একটি ঝোলানো সেতু ছিল। চারদিকে অসংখ্য চীড় ও দেবদারু গাছ জন্মেছিল। নদীর অপর পারে একটি শিখদুর্গের ভগ্নাবশেষ আমাদের চোখে পড়লো। সেই দুর্গ নিয়ে পার্বত্যবাসীদের সঙ্গে শিখেদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। শত সহস্র শিখের দেহ-শোণিতে একসময় সেখানে রক্তগঙ্গা বয়েছিল। কিছুদূরে চেনারির একটি ছোট্ট বাজার ও তার এক মাইল দূরে একটি জলপ্রপাত ছিল। চেনারিগ্রাম গারি থেকে ১৬ মাইল দূরে'।

'বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমাদের বাস ছুটে চলছিল। ক্রমে উরিগ্রামে আমাদের বাস গিয়ে পৌঁছালো। সেখানেও একটি পুরোতন দুর্গ দেখলাম। স্থানটি ছিল সৌন্দর্যে অতুলনীয়। উরির উচ্চতা ছিল ৪৩৭০ ফিট। 'উরি' নামে একজন মুসলমান রাজা সেখানে নাকি রাজত্ব করতেন, তাঁর নামানুসারেই জায়গাটার নাম হয়েছিল উরি। ক্রমে হাজিপীর নামক একটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে পুঞ্চরাজ্যের পথে গিয়ে পৌঁছালাম। পথটি ছিল অত্যন্ত সরু। সেই রাস্তা অতিক্রম ক'রে ব্রাণকুত্রি গ্রামে পৌঁছালাম। সেখানে প্রাচীন মন্দিরের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। তার চারদিকে ছিল নানারকম ফুলের গাছ। উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় ঘন বরফ জমে ছিল, তাদের ওপর সূর্যকিরণ পড়ে কিযে এক অপূর্ব শোভা হয়েছিল তা' বর্ণনা করা যায় না। কাছেই ছিল একটা ইলেকট্রিক পাওয়ার-হউস (বিজলী-ঘর)। তখন সেই পাওয়ার-হাউস থেকেই সারা কাশ্মীররাজ্যে

আলো সরবাহ করা হ'ত। তার কিছুদূরে রামপুর-বস্তি দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র থেকে থেকে তার উচ্চতা হবে ৪৮৪২ ফিট। উরি থেকে গ্রামটার দূরত্ব ছিল ১৩ মাইল উত্তরে। গ্রামটি সমতল জায়গার ওপর ছিল। ক্রমশঃ রামপুর-বস্তি ছাড়িয়ে আমরা বানিয়ার-নদী অতিক্রম করলাম। কাছে ছিল একটা ছোট রকমের বাজার ও করাতের কারখানা। বাস আগেকার মতো ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছিল। ক্রমে নওসেরা গ্রামে হাজির হলাম। সেখানে একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। রাস্তার একদিকে উঁচু পাহাড় আর অন্যদিকে ছিল গভীর খাদ। খাদের নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত। নীচেকার বড় বড় গাছগুলোও দেখাচ্ছিলো ছোট ঝোপের মতো। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে দেবদারুর জঙ্গল। মাঝে মাঝে বাগান, বাগানের ভেতর সব পাহাড়ী গ্রাম। দু'এক জায়গায় ঝরণাও দেখেছিলাম। ক্রমে কতকগুলো বরফে ঢাকা পাহাড় আমাদের চোখে পড়লো। সেই পাহাড়গুলোর মাঝখানের উপত্যকাতে নাকি কাশ্মীরের প্রধান সহর শ্রীনগর। আমরা যতই শ্রীনগরের দিকে যেতে থাকলাম, ততই উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগলো। দূরে তুষারধবল নাংগা ও হরমুখ পর্বত-দু'টি দেখা যাচ্ছিল। নাংগা-পর্বতের উচ্চতা ২৬৯০০ ও হরমুখ-পর্বতের ৬৯০০ ফিট। তাদের দক্ষিণে গুলমার্গের অভ্রভেদী চূড়াগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূরে কোলোহাই পর্বতকে যেন একটা বৃহৎ সিংহ দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছিল। কোলোহাই-পর্বতের উচ্চতা ১৮০০০ হাজার ফিট। কোলোহাইয়ের আশেপাশে ছিল ছোট ছোট পর্বতশ্রেণী।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন সেখানে ভেঙে পড়েছিল। আমাদের বাস সে'সব জায়গা ছাড়িয়ে ক্রমশঃ বরামূলা সহরে পৌঁছালো। অতটা পথ অতিক্রম ক'রে ও বাসের ঝাঁকুনিতে আমার শরীর বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বরামূলায় গিয়ে তাই খানিকটা বিশ্রাম করলাম। রামপুর থেকে সে' সহরটি ১৬ মাইল দূরে ও উচ্চতা ছিল ৫১৯৩ হাজার ফিট। একটি রোম্যান ক্যাথলিক মিশন-স্কুল সেখানে দেখলাম। তার পাশ দিয়ে গুলমার্গ-সহরে যাবার রাস্তা। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে গেছে'।

বরামূলা-সহরটির আসল নাম বরাহমূল। কাশ্মীরের হিন্দুদের বিশ্বাস যে, ওখানেই নাকি বিষ্ণু বরাহ-অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সহরটি বিতস্তানদীর উভয় দিকে বিস্তৃত ছিল। প্রায় ৮০০ শত বাসিন্দা সেখানে বাস করে। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'-তে বারমূলার বিবরণ দেওয়া আছে। রাজা অবন্তী বর্মার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসূর্য নাকি ঐ সহরকে জলপ্লাবন থেকে বাঁচাবার জন্য বিতস্তানদীর ওপর একটা পাথরের বড় বাঁধ তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার ভীষণ ভূমিকম্পে সহরটার খুব ক্ষতি হয়েছিল। সেখানে মোগল সৈন্যদের একটা প্রাচীন সরাইখানা ছিল। মুঘলরাজত্বের আমলে মোগলরা ঐ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেও তাদের ঘাঁটী তৈরী করতে কসুর করেনি। শিখদের রাজত্বের সময় শিখরা আবার ওখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেছিল। দুর্গটা তখন ধ্বংসপ্রায়। তার কাছে দু'টি গন্ধকমিশ্রিত জলের ঝরণা দেখলাম। হিন্দুদেরও সেখানে একটা প্রাচীন শিবমন্দির ছিল। বিতস্তানদীর পূর্বতীরে একটি নগর-তোরণের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছিল।

হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের উপর্যুপরি অভিযানগুলির স্মৃতিচিহ্ন সেখানে সুস্পষ্ট দেখলাম'।

'বরমূলাতে ঠাণ্ডা একটু কম, কেননা শ্রীনগর থেকে প্রায় ১০০০ ফিট নীচে ছিল সেই সহর। শীত কম ব'লে শ্রীনগর ও গুলমার্গ থেকে অনেকে শীতকালে সেখানে গিয়ে বাস করে। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য সফেদাগাছের শ্রেণী দেখা গেল। আমাদের বাস তখন একটু জোরে চলতে লাগলো, কেননা সন্ধ্যার আগেই শ্রীনগরে পৌঁছানো দরকার। পূর্বদিকে ১৪ মাইল অতিক্রম করার পর পাটান (পত্তন) নামক গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামে অসংখ্য চানার গাছ দেখা গেল। সেখানকার জায়গার উচ্চতা ছিল ৫২২০ ফিট। সেখান থেকে নাংগাপর্বত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শ্রীনগর সেখান থেকে আর বাকী ছিল ১৮ মাইল। বরাবর সমতলভূমি। দু'ধারে সফেদাগাছের শ্রেণী বেশ দেখতে সুন্দর লাগছিল। তারই ভেতর একটা কাঠের সেতু আমাদের পার হ'তে হ'ল। তারপর আমরা পৌঁছালাম মিরগুণ্ড। সেখানে কাশ্মীরের রক্ষীসৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে দেখলাম। তার এক মাইল দূরে ডানদিকে গুলমার্গ যাবার আর একটি রাস্তা চলে গেছে। সন্ধ্যার ঠিক কিছু আগে আমরা শ্রীনগরে গিয়ে পৌঁছালাম'।

'শ্রীনগরে পৌঁছে বেলুড় মঠের পাণ্ডা সুদামাকে খুঁজে বার করলাম ও তার সাহায্য নিয়ে ডাক্তার এ. মিত্রের বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। আলওয়ারের মহারাজের (জয় সিং) সঙ্গে আমার আগে থেকে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বলেছিলেন কাশ্মীর মহারাজকে তার (টেলিগ্রাম) ক'রে কাশ্মীর ও অমরনাথ ভ্রমণের সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।

করেছিলেনও তাই। শ্রীনগরে আমার পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে কাশ্মীরের মহারাজা (প্রতাপ সিং) আমায় আমন্ত্রন জানিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওদেশের দেশাচার অনুযায়ী আমি মাথায় গেরুয়া পাগড়ী বেঁধে রাজদর্শনে রওহনা হলাম। স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) মতো আমিও পাগড়ী-বাঁধায় সিদ্ধহস্ত ছিলাম। গাড়ী বিতস্তানদী (Bias) পার হ'য়ে বাজারের ভেতর দিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়ালো। একজন গাইড (পথপ্রদর্শক) আমাদের সসম্মানে রাজপ্রাসাদের ভেতর নিয়ে গেল। বিতস্তানদীর সামনের দিকে বারান্দায় একটা কারুকার্যময় কাশ্মিরী গালিচা পেতে আমাদের বসার স্থান করা হয়েছিল। ষ্টেট্ সেক্রেটারী পণ্ডিত জগৎরাম জ, মুতাবিন্দ দরবার রায়-বাহাদুর, পণ্ডিত মনমোহনলাল লঙ্গর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা ক'রে আমায় বসতে বল্লেন। আমি বসলে তাঁরাও আমার চারদিকে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ এলেন। তিনি আমায় হাত তুলে নমস্কার করলে আমিও প্রতিনমস্কার জানালাম। আমেরিকায় প্রচারকার্য, বেলুড় মঠ ও মিশনের কর্মপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। মহারাজ প্রতাপ সিং অমায়িক, সাদাসিদে ও নিরহংকার লোক ছিলেন। আলোচনার পর তিনি আমাদের সুখ-সুবিধার সমস্ত বন্দোবস্ত করার জন্য সেক্রেটারীকে আদেশ দিলেন। তাছাড়া অমরনাথ-যাত্রার সকল রকম আয়োজনও ক'রে দিতে বল্লেন'।

'অমরনাথ-যাত্রার তখন আর চারদিন মাত্র বাকী। কাজেই

শ্রীনগর ও কাশ্মীরের প্রধান প্রধান স্থানগুলি আমরা ঘুরে দেখতে লাগলাম। কাশ্মীর ও তিব্বতের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইয়ে পাবে'।

'তিব্বতে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেরই প্রভাব দেখলাম। মুসলমানদের আক্রমণও তিব্বতে হয়েছিল। তিব্বতে তন্ত্রবাদের প্রচারও বড় কম হয়নি। তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন গুম্‌ফা বা মঠ-মন্দিরে হিন্দু দেবদেবীরা বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ ও ছদ্মনাম নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজো পাচ্ছেন। অবশ্য বর্তমানে আমরা তাঁদের বৌদ্ধ দেবদেবী ব'লেই জানি। তিব্বতের লামাউরু, লিকির, লে, হিমশ, ত্রিত্‌শ, ফিয়াং, পিতুক, কাওচী ও শে-গ্রামের গুম্ফা-গুলিতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ দেখলাম। দেবদেবীদের মূর্তি বেশ সুন্দর'।

'লামাউরু-গুম্ফা বা মন্দির প্রায় ১২,০০০ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত! গুঁম্ফার উচ্চতা হবে ৩০ ফিট এবং দৈর্ঘ্য তার কিছু বেশী। পাথর, মাটি কাঁচ ও ইট দিয়ে গুম্ফাটি তৈরী। ছাদ সমতল ও চতুষ্কোণ। ছাদের ওপর পাঁচ ছ'টি কাল কাপড় দিয়ে মোড়া ঝাণ্ডা ও ত্রিশূল আছে। প্রত্যেক ত্রিশূলে আবার ভেড়ার সিং ও চামর বাঁধা! দু'টি বড় মণিচক্রও দেখলাম। বাতাসের বেগে মণিচক্র দু'টি প্রায়ই ঘুরতে থাকে। গুম্ফায় জানালার সংখ্যা অত্যন্ত কম। দরজাগুলি মজবুত মোটা কাঠ দিয়ে তৈরী। গুম্ফার ভেতরটা বেশ অন্ধকার, দিনরাত্তির সেগুলিতে তাই বাতি জ্বলে। লামাউরু-গুম্ফার ভেতর একটি কাঠের তাকে প্রায় চারশো' তিব্বতী ভাষায় লেখা পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি রেশমের কাপড়

দিয়ে মোড়া। সেটাই গুম্ফার লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার)। লাইব্রেরীর অন্যদিকে অতীশ দীপংকর, পদ্মসম্ভব, কুশক প্রভৃতি লামাদের মূর্তি। তাছাড়া সাকাথুব্‌পা (শাক্য-স্থবির), থুক্‌জে-ছিন্‌পো (অবলোকিতেশ্বর), শাকা-মুনি (শাক্য-মুনি), তার, চেঁরে-জি (বিশালাক্ষী) প্রভৃতি আরো কতকগুলি দেবদেবীদের মূর্তি ছিল। থুক্‌জে-ছিন্‌পো বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে এগারটি মাথা ও এক হাজার হাত। প্রত্যেকটি হাতে একটি ক'রে আবার চোখ (চক্ষু) আছে। ঐ মূর্তির মাথাগুলি থাকে থাকে সাজানো, যেমন প্রথম থাকে ৩টি, দ্বিতীয় থাকে ৪টি, তৃতীয় থাকে ৩টি, চতুর্থ থাকে একটি ও সকলের ওপরে একটি অমিতাভ বুদ্ধের মাথা। অবলোকিতেশ্বরের পূজোয় কোনরকম শুচি অশুচির বিচার নেই। সাকা-থুব্‌পা বা শাক্য-স্থবির পদ্মাসীন বুদ্ধ। তিনি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় আসীন। প্রচারক শাক্যমুনি-বুদ্ধের মূর্তি কিন্তু দাঁড়ানো। গুম্ফার আর একটি ঘরে প্রায় দেড়তলা সমান উচু আর একটি অবলোকিতেশ্বর, বজ্রতারা ও বুদ্ধদেবের দাঁড়ানো মূর্তি ছিল। মূর্তিগুলির কোনো-কোনোটি ছিল কাঠের তৈরী। কাঠের ওপর সোনা ও রূপো দিয়ে মোড়া। কতকগুলো মূর্তি আবার নিরেট পিতলের ছিল। বৌদ্ধ দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তি ছাড়া আরো অনেকগুলি ছোট-ছোট স্তূপের মতো 'মণি' ছিল। মণিগুলি দেখতে প্রায় মুসলমানদের তাজিয়ার মতো। সেগুলি সোনা ও রূপোর পাত দিয়ে মোড়া ছিল। মণিগুলি অনেক দামী পাথরের দ্বারা খচিত। প্রত্যেকঠি মূর্তির সামনে ছোট ছোট পিতলের বাটিতে পানীয় জল রাখা ছিল। সেগুলিকে

কারণবারির (মদ্যের) অনুকল্প বলা যায়। বেশীর ভাগ লামা তান্ত্রিক আচারের পক্ষপাতী। তাছাড়া শীতপ্রধান দেশ ব'লে তিব্বতের সাধারণ অধিবাসীদের মতো লামারাও সামান্য সামান্য কারণ (মদ্য) গ্রহণ করে। মদকে তিব্বতীরা বলে 'ছাং'। তারা বেশী পরিমাণে চা-ও খায়। তবে দুধ মিষ্টি না দিয়ে মাখন দিয়ে চা তৈরী করে'।

'লামাউরু-গুম্ফার ভেতর দেওয়ালের চারদিকে স্বর্গ, নরক, শাক্যমুনির দশ অবস্থা ও তাঁর ছ'রকম গতি, যমরাজ ও বিভিন্ন লামাগুরুর হাতে আঁকা ছবি সাজানো ছিল। মূর্তিগুলির সামনে নানান রকমের ঝালর ও পিছনে সৌখিন রেশমে বোনা পর্দা টাঙানো দেখলাম। ওপরে ছোট ছোট চাঁদোয়া (canopy)। মেঝের ওপর কতকগুলি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তাদের ওপর ওদেশের ভেড়ার লোমে তৈরী কম্বল বিছানো। ঐ কম্বলের ওপর বসে লামারা পূজা প্রভৃতি করে। রাত্রের প্রথম দিকে দেবদেবী ও পূর্ব-পূর্ব লামাগুরুদের আরাত্রিক হয়। আরাত্রিকের পর সকলের যিনি বড় লামা তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন ও অন্যান্য লামারা তা একাগ্রচিত্তে শোনে'।

'লামাদের ধর্মশাস্ত্র দু'রকম : তানজুর ও কানজুর। 'কানজুর' বলতে বোঝায় ত্রিপিটকগ্রন্থ। অবশ্য সেগুলি ছিল তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা। তানজুর কানজুরের ভাষ্য। কানজুরে ১০৮টি পরিচ্ছেদ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ১০০০ খানি ক'রে পাতা। তানজুরের পরিচ্ছেদ সর্বশুদ্ধ ২২০টি।[১] দু'টি ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদই

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে তানজুর ও কানজুরের অন্তর্গত সুদীর্ঘ একটি বৌদ্ধ পুঁথির তালিকা দিয়েছেন।

এক একখানি আলাদা পুঁথির মতো দেখতে। তাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চি, উচ্চতা ও বিস্তার হবে ৫ ইঞ্চি ক'রে। পুঁথিগুলির মলাট কাঠের তৈরী ও মলাটের ওপর নানান রকম রঙে চিত্র আঁকা ছিল'।

'তিব্বতে গুম্ফাগুলিতে পূজার আগে জমায়েৎ হবার জন্য শিঙ্গাধ্বনি ক'রে উপাসকদের আহ্বান করা হয়। ঐ শব্দ শুনে লামারা যে যার ঘর থেকে বার হ'য়ে আরাত্রিক ও পূজার জায়গায় সমবেত হয়। একত্র হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা নীরবে দেবদেবীদের মূর্তির দিকে মুখ করে ব'সে মন্ত্র পড়েঃ 'ওঁ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে, উৎসুম্ম মহাক্রোধ হুং ফট্'। এই মন্ত্র পড়ে তারা মনে করে তাদের মনের সব পাপ ধ্বংস হ'য়ে গেছে। আবার শিঙ্গাধ্বনি করা হয়। তখন তারা সমস্বরে আরাত্রিকের মন্ত্র শুরু ক'রে। আবৃত্তি বা গানের সঙ্গে করতাল, দামামা, দোর-জে বা কাঁসার তৈরী ঝুমঝুমির মতো একরকম বাজনা বাজাতে থাকে। গুম্ফার ঘরের কোণে আধমন পুরোতন মাখনের একটি প্রদীপ জ্বালা থাকে। প্রদীপটা থাকে একটি বড় পিত্তলের পাত্রের ওপর, আর পাত্রটা রাখা হয় কাটের তৈরী একটি তেপায়ার ওপর'।

'তিব্বতে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তা' বিস্তৃতভাবে আমি আমার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইয়ে উল্লেখ করেছি। তবে বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রবাদ ভারতবর্ষ থেকেই তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল। তিব্বতীরা আসলে ছিল গ্রহ-নক্ষত্র ও ভূত-প্রেতাদির উপাসক। তান্ত্রিকধর্মের সঙ্গে যোগের সাধনপ্রণালীও তিব্বতী লামাদের ভেতর প্রবেশ লাভ করেছিল। তিব্বতী লামারা অনেকে সূর্যেরও উপাসক। তারা 'ও মরিচিনম্ স্বাহা' মন্ত্রে উষাকালীন সূর্যকে শ্রদ্ধা-

সহকারে প্রণাম জানায়। লামারা দিনের বেলায় ও রাত্রে মোট ন'বার আহার করে। আহারের আগে তারা বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'ওঁ গুরু বর্জ নৈবেদ্য অঃ হুং' প্রভৃতি মন্ত্রে আহার্য নিবেদন করে। মন্ত্রপূত না ক'রে তারা কোন জিনিস খায় না'।

লামাউরু গুম্ফা দেখার পর লিকিরগুম্ফা দেখতে গেলাম। লিকির-পর্বতের ওপর গুম্ফাটি অবস্থিত। লিকির-পর্বতের উচ্চতা প্রায় ১৪,০০০ ফিট। লিকির-গুম্ফার ওপরে উঠতে নীচতলা থেকে ১৫০টি পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। আমরা গুম্ফার তোরণে পৌঁছাতেই প্রায় ২৫ জন লামা 'জুলে জুলে' ব'লে প্রণাম ক'রে অভ্যর্থনা জানালে। লামারা আমায় প্রথমে একটি বড় হলে (Hall) নিয়ে গেল। হলটি কারুকার্যময় ও নানান বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে সাজানো। হলের মেজেতে নামদা ও লুই বিছানো। তার ওপর এদিকে সেদিকে ছাপা পুঁথি ছড়ানো। কতকগুলি ওদেশী বাদ্যযন্ত্রও আছে। হল-এর পাশেপাশে লাল ও নীলরঙের সিল্কের কাপড় দিয়ে সাজানো থামওয়ালা সব ঘর দেখলাম। ঘরগুলিতে লামারা থাকে। ঐসব ঘরে 'গেন্দুম-গ্রুব' প্রভৃতি দালাই লামাদের (গ্যাল-বা-রিণ্-পোছে) প্রতিমূর্তি আছে। গেন্দুম্-গ্রুব খ্রীষ্টীয় ১৪শ থেকে ১৫শ শতকের ভেতর 'গ্যাল্-বা-রিণ্-পোছে' এই উপাধি নিয়ে দালাই লামা হয়েছিলেন। তিব্বতে লামাদের বিশ্বাস যে, চেনরেজী বা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মানুষের দেহে প্রবেশ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ও তাঁদের বলা হয় 'দালাই-লামা'। তা'সি-লামারাও চেন্‌রেজীঁর পিতা অমিতাভের অবতার-রূপে পূজা পান'।

'গুম্ফার ভেতর লামাদের ঘরগুলির মাঝখানে কতকগুলি 'মেনদাং' বা স্মৃতিস্তূপ আছে। স্মৃতিস্তূপে বিখ্যাত লামাদের মৃত্যুর পর তাদের নখ, চুল, অস্থি প্রভৃতি রাখা হয়। স্তূপগুলি সোনা, রূপা ও দামী পাথর দিয়ে তৈরী। স্তূপগুলির আশেপাশে বজ্রপাণি লোকনাথ বা লোকেশ্বর, বজ্রতারা,[১] অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সাজানো ছিল। তাছাড়া হলটির ঠিক পাশের ঘরে বিরাট একটি শাকা-থুবা

১। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের মধ্যেই তারাদেবীর মূর্তিভেদ পাওয়া যায়। তারাদেবী আসলে হিন্দু—কি বৌদ্ধদেবী এ'নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের অভিমত যে, প্রথমে যে শক্তি বৌদ্ধসমাজে পূজিত হয়েছিলেন তাঁর নাম 'তারা'। প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রে নাকি তারাদেবীর নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় অনেকে এঁকে বৌদ্ধদেবী বোলে অনুমান করেন। 'তারারহস্যবৃত্তিকা' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে তারার 'প্রজ্ঞাপারমিতা' এই বৌদ্ধ নাম দেখা যায়। বৌদ্ধ তারামন্ত্রের ঋষি অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধ। এই ধ্যানীবুদ্ধের পরমজ্ঞানের নামই প্রজ্ঞাপারমিতা বা তারাদেবী। হিন্দুতন্ত্রেও তারাদেবী জ্ঞানশক্তিরূপে পরিচিতা। বৌদ্ধ-তন্ত্রে ২১ রকম তারার মূর্তিভেদের উল্লেখ আছে: মহত্তরী বা শ্যামতারা, খদিরবাণীতারা, সিতাতারা, জঙ্গুলীতারা, ভ্রূকুটীতারা, বজ্রতারা, রক্তা বা কুরুকুল্লা-তারা, নীলতারা বা একজটা প্রভৃতি। শ্বেত, নীল, রক্ত, হরিদ্রা, সবুজ প্রভৃতি ভেদে তারার বর্ণভেদেরও উল্লেখ আছে। হিন্দুতন্ত্রে তারাদেবী শক্তির দ্বিতীয়া মূর্তি, যেমন কালী, তারা, ষোড়শী। ..

২। অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্বকে ষড়ক্ষর লোকেশ্বর বা লোকনাথও বলে। ইনি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁর শক্তি পাণ্ডরাদেবী থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। বৌদ্ধ 'সাধনমালা'-র মতে ৩১ অবলোকিতেশ্বর রকম মূর্তিতে বিকশিত। অবলোকিতেশ্বর বা ষড়ক্ষর লোকেশ্বরের শক্তি ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা ও মণিধর। ইনি একটি কল্প বা যুগের নিয়ামক।

(শাক্য-স্থবির), মঞ্জুশ্রী[৩] ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি দেখলাম। মূর্তিগুলির সামনে ছোট ছোট বাটিতে কারণবারির অনুকল্প-রূপে জল সাজানো আছে। তিব্বতের গুম্ফাগুলি যেমন অন্ধকারময়, লিকির-গুম্ফায়ও তাই। একজন লামা মাখমের প্রদীপ জ্বেলে মূর্তিগুলির মুখের সামনে ধ'রে আমাদের দেখাতে লাগলো। মূর্তিগুলির মুখ সত্যিই কমনীয়, প্রেম ও করুণার ভাবে পরিপূর্ণ। ঘরটির দু'পাশে কাঠের তাকে প্রায় ২৫০ শত পুঁথি কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা ছিল। ওটাই গুম্ফার লাইব্রেরী। লামাদের অনেকে বেশ বিদ্বান। যৌগিক বিভূতিসম্পন্নও অনেকে আছেন। এমন কি অনেকে জন্মান্তর সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ'।

তারপর স্বামিজী মহারাজ বাসগোর গুম্ফার প্রসঙ্গ তুল্লেন। তিনি বল্লেন : 'বাস্‌গো' গুম্ফাতে মৈত্রেয়-বুদ্ধের[৪] মূর্তির

৩। মঞ্জুশ্রীরও রূপভেদ আছে। মঞ্জুশ্রীর গুরু অক্ষোভ্য। ইনি 'বাগীশ্বরী' নামেও পরিচিত। মঞ্জুশ্রী বা বাগীশ্বরী বৌদ্ধধর্মে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অধিকাংশ মূর্তিতেই তাঁর একহাতে পদ্ম ও অপর হাতে একখানি গ্রন্থ থাকে। ঐ দু'টিই মঞ্জুশ্রী-দেবতার আসল চিহ্ন। হিন্দুদেবী বাগীশ্বরী বা সরস্বতীর সঙ্গে এঁর তুলনা করা যায়। মঞ্জুশ্রীর শক্তির নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। এঁর কিরীটে বা জটায় গুরু ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্তি থাকে : "সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌলিনং"। মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ পীতবর্ণ, ধর্মচক্রমুদ্রাধর ও তাঁর বাম হস্তে উৎপল বা পদ্ম। অনেকের মতে এই মঞ্জুশ্রী ও অক্ষোভ্যের কল্পনা হিন্দুদেবী দুর্গা ও শিব থেকে নেওয়া হয়েছে—যদিও বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী স্ত্রী নন—পুরুষ দেবতা।

৪। মৈত্রেয়-বুদ্ধ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির বিকাশ—পঞ্চম মানুষী-বুদ্ধ। বুদ্ধগণ সকলেই প্রায় সমান, তবে তাঁদের হস্তের মুদ্রাভেদে রূপভেদ কল্পিত হয়। এঁকে ইংরেজীতে '*Messiah of Buddhism*' বলা হয়।

তুলনা নেই। মূর্তিটি কাঠ, তামা ও সোনার পাত দিয়ে তৈরী। মৈত্রেয়বুদ্ধের বয়স ৮০ বছর, সুতরাং সে'রকম বয়সের মূর্তিই তৈরী করা হয়েছে। মূর্তি তিনতালা সমান উচু। বাস্‌গো-গুম্ফাটি নাকি ইংরেজী ১৭শ (১৫৯০—১৬২০) খৃষ্টাব্দে দেলদানের পিতা রাজা সেংগে-নামজাল কর্তৃক নির্মিত। সেংগে-নামজালের মা ছিলেন মুসলমান-ধর্মাবলম্বী, তাহলেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মের ওপর তাঁর খুব অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। তাই তিব্বতী লামাদের মতো তিনি রক্তবর্ণ পোষাক পরে থাকতেন। রাজা সেংগে-নামজাল 'স্তাগ-সঙ্গ-রস-চেন' বা ব্যাঘ্র-লামাকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান। ব্যাঘ্র-লামা বেশ উন্নত ধরনের তিব্বতী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিব্বতে হিমিশ-চেমরে, এশিসসঙ্গ ও হান্‌লে গুম্ফাগুলি ব্যাঘ্রলামাই নির্মাণ করান'।

'পিতুক-গুম্ফাটিও সুন্দর। পাঁচশো বছর আগে গ্যাংপো বুমলডে ঐ গুম্ফাটি নির্মাণ করেছিলেন। গুম্ফাটি 'লে' উপত্যকার ওপর অবস্থিত। পিতুক-গ্রামখানি গুম্ফার অপর দিকে গড়ে উঠেছে। নীচু থেকে প্রায় ১০০০ ফিট চড়াই ক'রে উঠে গুম্ফার প্রবেশপথে হাজির হলাম। একজন লামা সসম্মানে আমাদের গুম্ফার ভেতর নিয়ে গেল, বসার পিঁড়ি দিলে ও কাঠের বাটিতে লাসার চা-সিদ্ধ জল, মাখন ও একটু ক'রে লবণ খেতে দিলে। তাছাড়া আর একটি কাঠের বাটিতে ভাজা যবের ছাতু ও হাড়ের ছোট একটি চামচও দিলে। এ'ভাবেই লামারা অতিথিদের সেবা করে'।

'খাওয়া শেষ ক'রে আমরা গুম্ফাটি ঘুরে দেখতে লাগলাম। গুম্ফাতে অসংখ্য কুলুঙ্গি। প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে লামা, তাসিলামা বা কোন-না-কোন পিত্তল বা তামার তৈরী

দেবদেবীর মূর্তি আছে দেখলাম। কোন কোন কুলুঙ্গিতে পুঁথিও রাখা আছে। দু'একটিতে 'সুর-সুন্দরী' ও 'কর্ণ-পিশাচ-সুন্দরী' দেবীর মূর্তি। তাঁরা সবাই তান্ত্রিক দেবী। যারা সিদ্ধাই বা সাধনায় বিভূতি (ঐশ্বর্য) চায় তাদের এঁরা সফলকাম করেন।[৫] তিব্বতের লামাদের ভেতর এ'রকম অনেক তান্ত্রিক ও যোগসাধক আছেন—যাঁরা সিদ্ধাইয়ের পক্ষপাতী। সিদ্ধাই-ক্ষমতাপন্ন অনেক লামাদের সন্ধানও তিব্বতে মেলে'।

'পিতুক-গুম্ফার অল্প দূরে কাওচ-গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ বিগত বালতিযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়কাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে কলঙ্ককীর্তিও ঘোষণা করছে। খ্রীষ্টীয় ১৭শ অব্দে মুসলমান শাসনকর্তা শের আলীর তিব্বত-অভিযানের কথা ঐতিহাসিক-মাত্রেই জানেন। 'লে' বাজারের শেষে অতুচ্চ একটি পাহাড়ের মাথার ওপর একটি প্রাচীন প্রাসাদ ও লামাদের মঠ ছিল। শের আলি ঐ প্রাসাদ ও মঠ থেকে অনেক দেববিগ্রহ ও বৌদ্ধ পুঁথি আগুন লাগিয়ে ধ্বংস ক'রে দেয়। লামাদের শ্মশানভূমির মতো তিব্বতের কোথাও কোথাও মুসলমানদের কবরভূমি দেখা যায় ও তা' থেকে মুসলমানরা তিব্বতে যুদ্ধযাত্রায় গিছলো তা প্রমাণ হয়'।

'তবে এখন তিব্বতে বৌদ্ধধর্মই প্রবল, আর তন্ত্রবাদের প্রচার যা আছে তা মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রবাদের প্রভাব বলা যায়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের চমকপ্রদ ইতিহাস রেভারেণ্ড

৫। কি হিন্দু ও কি বৌদ্ধ এই উভয় তন্ত্রের দু'টি দিক আছে: একটি পরমার্থ জ্ঞানের ও অপরটি জাগতিক ঐশ্বর্য বা বিভূতির দিক। তন্ত্র-সাধনার আসল দিকই তত্ত্বজ্ঞান লাভ, অন্যটি ভোগের দিক।

এ. এইচ. ফ্র্যাঙ্কে (Rev. A. H. Francke) *A History of Western Tibet* বইয়ে উল্লেখ করেছেন। 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইয়েও আমি সামান্যভাবে পশ্চিম তিব্বতে বা লাড্যাকে, চীনে, কোরিয়ায় ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। ওয়াডেল সাহেবের *Buddhism in Tibet* বইখানিতে তিব্বতের culture (সংস্কৃতি) ও religion (ধর্ম) সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে'।

'আগেই বলেছি যে, তিব্বতের আদিম অধিবাসীরা ভূত প্রেত পিশাচ ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসক ছিল। মানুষের মাংসও তাদের আহার ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, ভূত ও পিশাচরা গাছ, পাথর, সাপ প্রভৃতির দেহ আশ্রয় ক'রে পৃথিবীতে বাস করে, তাই মঙ্গল কামনার জন্য। তারা এ'সবের পূজা ক'রে।

'ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতির পূজাকে তিব্বতীরা 'বন্' বা 'পন্'-ধর্ম বলে। এই ধর্ম প্রবর্তন করেন সেন্‌রাব-মি-ভো নামে পশ্চিম-তিব্বতের একজন সাধক। সেনরাব-মি-ভো নিজে পিশাচসিদ্ধ ছিলেন। নানান ভাষা, বিদ্যা ও ঔষধ তাঁর জানা ছিল। ৩৩৬টি স্ত্রী ও অসংখ্য সন্তানের তিনি অধিকারী। প্রথম বয়সে তিনি সংসারী জীবন যাপন ক'রেন। ৩১ বছর বয়সের সময় উগ্র তপস্যা ক'রে তিনি নাকি সিদ্ধিলাভ করেন ও 'বন্'-দেবতা 'সেন্-হাও-কার' (শ্বেতবর্ণের জ্যোতির্ময় 'বন্')-এর আরাধনায় অলৌকিক সিদ্ধাই বা যোগশক্তির অধিকারী হন। তিনি ২৫ বছর ধরে চীনদেশে গিয়ে 'বন্‌ধর্ম' প্রচার করেন। সেই সময়ের তিনি চীনরাজ কন্-গং-সিকে বন্‌ধর্মে দীক্ষিত করেন ও অমঙ্গল নিবারণের জন্য কবচ, মাদুলি, ধারণের মন্ত্র, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি নানান রকমের ম্যাজিক ও তুক্‌তাক্

তিব্বতীদের শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত 'বন্‌ধর্ম' ধীরে ধীরে চীন ও তিব্বত ছাড়িয়ে মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান ও মধ্য-এশিয়ার নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে'।

'বন্‌ধর্মের পুরোহিতদের বলা হন 'বন্-পো'। বন্-পোরা নানান রকমের মন্ত্র উচ্চারণ ও তার প্রয়োগ ক'রে ভূত, প্রেত ও ডাকিনীদের সন্তুষ্ট ও বশীভূত করে এবং তা দিয়ে রোগ-ব্যাধিরও আরোগ্য করে। বন্‌ধর্মের প্রধান দেবতার নাম 'লা-ছেনপো-মিগ্-ডু'পা', অর্থাৎ ন'টি চোখবিশিষ্ট মহাদেব। এই দেবতা মহাপরাক্রমশালী পৃথিবীর পতি। বন্‌ধর্মের প্রধান দেবীর নাম 'জি-বৃজিদংথা-যম্মা', অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের মুখশ্রী ও দু'হাতবিশিষ্ট দেবী। দেবী সিংহাসনাসীনাও আমাদের দেশে (বাংলায়) সিংহবাহিনী দুর্গার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বাংলাদেশের দুর্গার বাহন একটি, আর বন্‌ধর্মের দুর্গার বাহন চারটি। তিব্বতের বন্-দুর্গা[৬] চারটি

৬। তিব্বতের 'বন্-দুর্গা' ও বাংলাদেশের 'বনদুর্গা' সমশ্রেণী ভুক্ত। পাশ্চাত্য মনষী কেলেট্ তাঁর *A Short History of Religion* (পৃঃ ১০৫) বইয়ে 'বন-দিয়া' (Bona Dea) দেবীর নামোল্লেখ করেছেন। 'বন-দিয়া' বনদেবী দুর্গা। রাজপুতনা অঞ্চলে নারীদের মধ্যে এই দেবীর পূজার প্রচলন আছে। বাংলাদেশে সুন্দরবনে 'বন-বিবি'-র পূজা আসলে বনদেবী 'শাকম্ভরী'-দুর্গার পূজা। মাননীয় টড তাঁর *Annals & Antiquities of Rajasthan* পুস্তকে (পৃঃ ৪৫৫) গৌরী অন্নপূর্ণা ও একলিঙ্গ শিবের নামোল্লেখ করেছেন। গৌরী অন্নপূর্ণা শাকম্ভরী বনদুর্গাই (—Cf. প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত "শ্রীদুর্গা", পৃঃ ৭২-৭৪)। বনদুর্গা বা বন্-দুর্গার মতো 'লা-মো' ও 'সাই-লা-মো' তথা মহাকালী দুর্গার পূজাও তিব্বতে প্রচলিত আছে। মনীষী ওয়াডেল তাঁর *Lamaism in Tibet* বইয়ে 'লা-মো' দেবীকে 'শ্রী'-দেবী এবং 'like her great prototype the goddess Durga of Brahmin' বলেছেন। আসলে সকলেই দেবী দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ।

সিংহের পীঠে সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। বন্-দুর্গা আদ্যাশক্তি ও লা-ছেন্‌পো নামক মহাদেবের পত্নী। লা-ছেন্‌পো শ্বেতবর্ণের মহাদেব তা আগেই বলেছি। তিনি বৃষারূঢ়। দেবী জি-বৃজিদংথা দু'হাতে যেমন দু'টি দর্পণের ওপর দু'টি প্রজ্জলিত মশাল ধ'রে আছেন, মহাদেব লা-ছেন্‌পা তেমনি এক হাতে একখানি রুপার পুস্তক ধারণ ক'রে আছেন। সুতরাং বন্‌ধর্মের শিব ও পার্বতী রূপে ও আকারে একটু ভিন্ন হলেও আসলে তাঁরা যে হিন্দুতন্ত্রের দেব-দেবী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিব ও দুর্গা ছাড়া বাগ্দেবী, লক্ষ্মী, দয়াময়ী, বুদ্ধিদাত্রী প্রভৃতি দেবীরাও আছেন। তাঁরা সকলে সিংহাসনে উপবিষ্টা ও এই প্রত্যেকটি দেবী বা শক্তির একজন ক'রে দেবতা আছেন। সেই দেবতাদের নাম বাগ্দেবতা, লক্ষ্মী-দেবতা, দয়াময়ী-দেবতা, প্রভৃতি। শক্তিদের দেবতারা সকলে বৃষারূঢ়। সুতরাং বন্‌ধর্মে পাঁচটি দেবী ও পাঁচটি দেবতা প্রধান। দেবী ও দেবতারা সকলেই শিব ও শক্তির বিকাশ। সুতরাং সকলে বৌদ্ধদেবীর ছদ্মবেশে যে হিন্দু দেবী বা দেবতা তা' বেশ বুঝা যায়'।

'তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় এক হাজার বছরের মধ্যে তাঁর ধর্মমতে নানান রকমের পরিবর্তন এসেছিল। বৌদ্ধধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য চারবার ধর্ম-সংসদ (Buddhist Council—বৌদ্ধ মহাসংসদ) আহ্বান করা হয়। খ্রীটীয় প্রথম শতকে সিথিয়ান-রাজ কণিষ্ক জলন্ধরে যে সংসদ আহ্বান করেছিলেন, তাতে বৌদ্ধধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল : একভাগ পোষণ করলো প্রাচীন মতবাদ, আর অপর ভাগটি

অন্যান্য জাতির দেব-দেবী প্রভৃতি ও নানান নূতন সংস্কারকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো *Northern Buddhism* নামে। প্রথমটিকে বলা হয় *Soutern Buddhism*—যা বিস্তারলাভ করলো সিংহল, শ্যাম, বর্মা প্রভৃতি দেশে। *Northern Buddhism* ছড়িয়ে পড়লো উত্তর-ভারতের বাইরে চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া প্রভৃতি দেশে। বৌদ্ধরা প্রথমটিকে নাম দিলেন 'হীনযান', আর দ্বিতীয়টিকে 'মহাযান'। 'যান' অর্থে পথ বা ধর্মমত। এ'ছাড়া একযান, দ্বিযান, ত্রিযান প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রচলন আছে। হীনযান ও মহাযান ধর্মমত-হু'টির চরম-উদ্দেশ্য নির্বাণ। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের মধ্যে প্রথমে কোন মতভেদ ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে নাগার্জুন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মহাযান-মত প্রচার করেন—যেটা আসলে শূন্যবাদের নামান্তর। হীনযান-মতাবলম্বীরা নিজেদের নির্বাণ-মুক্তির পথযাত্রী বলেন। তাঁরা 'বিনয়পিটক' অনুযায়ী সাধন করেন। মহাযানীরা নিজেদের ছাড়াও সকল প্রাণীর মুক্তির কামনা করেন। তাঁদের গ্রন্থে হীনযানীদের নিন্দা আর মহাযানীদের প্রশংসা করা হয়েছে। একই ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে বিবাদের মূল প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। ইসলাম ও খৃষ্টধর্মেও তাই'।

'খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২-২৩১ শতকে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্র-নগরে (পাটনা) তৃতীয় বৌদ্ধ-সংসদ (3rd Council) আহ্বান করেন। পরে তিনি নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত, লাডাক, ইয়ারকন্দ, চীন, মঙ্গোলিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে ধর্ম-প্রচারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বহন ক'রে

নিয়ে গিয়ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্রাহ্মীভাষায় লিখিত একটি প্রস্তরফলক থেকে জানা যায় ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই প্রথমে লাডাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে অসঙ্গ, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শান্তরক্ষিত, ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব ও পরে ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধসিংহ, কমলশীল, কুমার, শঙ্কর ব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জু, অনন্তবর্মা, কল্যাণমিত্র, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, গুণপাল, সুভূতি, শ্রীশান্তি প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারসাধন করেন। মহারাজ থিস্রং-দৈৎসানের সাহায্য নিয়ে পদ্মসম্ভব যেমন ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধ মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে তাঁর পৌত্র রালপাচন তিব্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করতে পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছিলেন। তাতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বেশ দ্রুতভাবে প্রসারলাভ করেছিল'।

এমনি ক'রে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বামিজী মহারাজের কাছ থেকে তিব্বত ও দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হলাম এবং সংগ্রহও করলাম প্রচুর তথ্য।

॥ স্মৃতি : তেরো ॥

সে'দিন স্বামী অভেদানন্দের ডায়েরী "জীবন-কথা" নকল করার কথা উঠতে আমরা এটা ওটা প্রশ্ন শুরু করলাম। তিনি বল্লেন : 'একটু বসো, এই চিঠিটা পড়ে নি'। চিঠি পড়া শেষ হ'লে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন : 'ইংল্যাণ্ডের ঘটনা তো আমাদের 'বিশ্ববাণী' কাগজে কিছু কিছু বেরিয়েছে। বাকি সব যা আমেরিকার। পঁচিশ বছরের ঘটনাই আমার ডায়েরীতে লেখা আছে। তবে অসাধারণ খাটতে হবে, কারণ ডায়েরীতে যা লিখেছি তা এতই সংক্ষেপ যে, বিস্তৃত-কিছু জানার জন্য আমার কাছে বসে জেনে নিতে হবে। আমার প্রচারকার্যের ঘটনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে স্বামিজীর (বিবেকানন্দের) জীবনেরও অনেক নূতন ঘটনা পাবে। স্বামিজীর জীবনের বহু ঘটনা তো এখনো অপ্রকাশিত আছে'।

আমরা : 'মহারাজ, আপনার জীবন যে কি বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' ডায়েরীর কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই আমরা বুঝতে পেরেছি। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অতীত ইতিহাসের অনেক উপাদানই ছড়ানো আছে আপনার ডায়েরী-বুকে। এগুলির প্রকাশ হওয়া একান্ত দরকার'।

স্বামিজী মহারাজ : 'তা তো বুঝি, কিন্তু নিজের ঢাক নিজে আর কত পেটানো যায় বলো। তাই তো বলি যে, আমার মুখ থেকে তোমরা সব-কিছু শুনে নাও। তাছাড়া দেখতে পাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, ভাব ও আদর্শ ওদেশের (পাশ্চাত্যের) লোকরা কি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহন করেছে'।

স্বামিজীকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে বল্লেন: 'আমারিকায় একদিন[1] ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ক্যামন ক'রে হ'তে পারে এই ছিল আমার আলোচনার বিষয়। কিংস কলেজে তার আগের দিন *Relation of Soul to God* (আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ) বিষয়ে বক্তৃতা ছিল। কর্ণওয়েল ইউনিভারসিটিতেও সেই বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক টাইলরের (Prof. Tylor) সঙ্গে দর্শনের বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। কিংস কলেজে আমার বক্তৃতার আগে ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডাঃ রাইট প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। প্রায় একঘণ্টা ধ'রে নানান দিক থেকে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কি ক'রে উন্নতি হ'তে পারে সে' সম্বন্ধে বল্লাম। ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে আগে থেকে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন'।

'আর একদিন ডাঃ স্মিথ (Dr. Smith) নিউ-চার্চ-ক্লাবে কিছু বলার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।[2] ডাঃ স্মিথ ছিলেন সোয়েডেন-বর্গিয়ান মিনিষ্টার (*Swendenborgian Minister*)। যেখানে আমি বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বল্লাম। খৃষ্টান মিনিষ্টারদের (ধর্মাচার্যদের) ভেতর ডাঃ স্মিথ অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মন দিয়ে আমার বক্তৃতা আগাগোড়া শুনলেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি'।

'কিন্তু একবার হলো কি—একদিন মটমেমোরিয়াল হলে (*Mott Memorial Hall*) আমার সাধারণ বক্তৃতা ছিল

১। ইংরেজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ, ১৫ই জানুয়ারী, বুধবার।

২। ইংরেজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ, ২২শে জানুয়ারী, সোমবার।

Sin and Sinner (পাপ ও পাপী) সম্বন্ধে।[৩] বক্তৃতার পরের দিন আমেরিকার 'আউটলুক' (*Outlook*) কাগজে বেশ লম্বা একটা সমালোচনা বার হ'ল। 'আউটলুক' ছিল নিউ ইয়র্কের গোঁড়া খৃষ্টানমহলের একখানা বিখ্যাত কাগজ। তার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন মিষ্টার ব্র্যাডফোর্ড (Mr. Bradford)। তিনি সমালোচনার রিপোর্ট (বিবরণ) পড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। আমি নিমন্ত্রণ নিয়েছিলাম, ভাবলাম দেখাই যাক কি হয়। পরের দিন বেলা সাড়ে বারোটার সময় ব্রাডফোর্ডের সঙ্গে দেখা করি। তিনি সসম্মানে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। আলোচনার সূত্রপাত হ'ল খৃষ্টান বইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে যে আদমের (Adam) কথা আছে তাই নিয়ে। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে ইভের পাপেই আদমের পৃথিবীতে অবতরণ হয়েছিল। সয়তান (Satan) ইভকে প্রলোভন দেখিয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে পৃথিবীতে টেনে এনেছিল। 'দি হায়ার অথরিটি অব চার্চিয়ানিটি' (খৃষ্টানচার্চের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক লোক) সেণ্ট পলও সে ধারণার কোন সংশোধন করেন নি, বরং সমর্থনই করেছিলেন। ফলে খৃষ্টানদের ভেতর আদম ও ইভের ঘটনাটা চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই থেকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আদম ও ইভের বংশধর পৃথিবীর হতভাগ্য মানুষদের কপালেও *eternal damnation*-এর (অনন্ত নরকের) ব্যবস্থা কায়েমী হ'য়ে গেল। *Last day of Judgement*-এর (শেষ-বিচারের) দিন ট্রামপেটের (*trumpet*—ভেরী বা শিঙ্গা) শব্দে মৃতাত্মারা যে যার কবর থেকে উঠে জিহোবার কাছে যায়। জিহোবা বসে

৩। ইংরেজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, ২০শে মার্চ, রবিবার

থাকেন হাতে দণ্ড নিয়ে (*with a rood in hand*) সিংহাসনের ওপর। ক্রোধে তাঁর চক্ষুদু'টি রক্তবর্ণ। তারপর বিচার আরম্ভ হয়। তখন আত্মাদের ভাগ্যে হয় অনন্ত নরক—নয় অনন্ত স্বর্গ নির্দিষ্ট হয়। আমি ব্র্যাডফোর্ডকে বল্লাম ওল্ড টেষ্টামেণ্টের মত (অভিমত) সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পাপ মানেই *imperfect knowledge* (অসম্পূর্ণ জ্ঞান) বা *ignorance* (অজ্ঞান)। অজ্ঞানতাই মানুষকে সংসারে স্বার্থপর করে। স্বার্থপরতাই মহাপাপ। নইলে পাপ বলে আলাদা কোন জিনিসের অস্তিত্ব সারা ছুনিয়ায় নেই। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম বা অজ্ঞানতা দূর হ'য়ে যায়। মানুষের অজ্ঞানতা-রূপ মিথ্যাজ্ঞান বা পাপকেই খৃষ্টানরা 'নরক' বলেছে। জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশকেই তারা নরক থেকে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনা করে'।

'ব্রাডফোর্ড আমার কথার কোন প্রতিবাদ না ক'রে নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিলেন। আমি বল্লাম: Punishment and reward are the reaction of man's own actions (শাস্তি ও পুরস্কার মানুষের নিজেরই কর্মানুযায়ী ফল)। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই। Action must bring its reaction (কাজই তার ফল সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে)। কাজের ফল আমাদের অনুকূলে হ'লে তাকে আমরা বলি পুণ্য, আর ভাল বা *pleasing* (সুখকর) না হয়ে প্রতিকূল হ'লে বলি পাপ বা মন্দ। ছুনিয়ার সকল জিনিসই আপেক্ষিক (relative)। পাপ-পুণ্যও আপেক্ষিক। আলো যেমন অন্ধকারের কথা জানিয়ে দেয়, গরম যেমন ঠাণ্ডার কল্পনা জাগায়, পাপও তেমনি পুণ্যের ধারণা স্বষ্টি করে। একটা থাকলেই অপরটা থাকে। যেখানে একটা

নেই, সেখানে অপরও নেই। বেদান্ত তাই ব্রহ্মকে পাপ ও পুণ্যের অতীত বলেছে। ব্রহ্ম এক ও দুয়ের অতীত। পাপ ও পুণ্য যেন *negative and positive poles of a magnet* (একটা চুম্বকপাথরের নেতি ও ইতি বাচক দু'টো দিক)। *Negative* ও *positive*-এর মাঝখানটা হ'লো চুম্বকের *neutral point* (নিরপেক্ষ স্থান)। *Neutral point* কিনা *negative* ও *positive* এই দু'টো দিকের *meeting place* (মিলনস্থল), অথবা বলা যায় *neutral point*-এ *negative*-ও নেই, *positive*-ও নেই। এটা ঠিক no man's land-এর (নিরপেক্ষ জায়গার) মতো। ব্রহ্মে নেতি বা ইতি বাচক কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব নেই, [৪] অথচ

৪। ঠিক এ' ধরণের আলোচনা করেছেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *Self-Knowledge* (১৭-১৮ পৃষ্ঠায়) এবং *True Psychology* বইয়ে। তিনি বলেছেন: 'The positive pole is the subject, the negative pole is the object ; but they both exist in the same Substance, * * *. That is monism, when we look at the neutral point of the magnet, we do not see the positive end and the negative end. স্পিনোজা, বার্টাণ্ড, রাসেল, অধ্যাপক হোয়াইটহেড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও ঈশ্বর বা ব্রহ্ম (God the Absolute) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে mental and physical, mind and matter অথবা thought and extention-কে positive ও negative poles বলেছেন। তবে তাঁদের আলোচনায় neutral zone ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ঠিক subject ও object থেকে নির্মুক্ত নন, বরং সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ neutral zone হিসাবে ব্রহ্মকে সর্বগুণবর্জিত এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদিক থেকে তাঁর দার্শনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য মরমী ও দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন।

ব্রহ্ম সকলেরই অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) থেকেই দুনিয়ার সকল-কিছুর বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁতে একও আছে, দুইও আছে। তাঁতে বহুও আছে, আবার সবই মিশে একাকার হয়েছে,—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত কোনটাই নেই। মিষ্টার ব্র্যাডফোর্ড নির্বাক হ'য়ে আমার কথা শুনছিলেন। দেখলাম তিনি খুব খুসী হয়েছেন। ব্র্যাডফোর্ড পণ্ডিত ও নিরভিমানী লোক ছিলেন, কাজেই সত্যের মর্যাদা তো তিনি দেবেনই'।

স্বামিজী মহারাজ : 'মট্-মেমোরিয়াল হলে যে সমস্ত বক্তৃতা আপনি দিতেন 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' (*New York Times*) পত্রিকায় (March 21, 1898) তাদের অনেক কমেণ্ট (comment—মন্তব্য) বেরিয়েছিল শুনেছি। আপনার আলমারীতে রাখা পেপার-কাটিংস-এ (*paper-cuttings*) আমরা অনেকগুলি ওরকম ধরনের মন্তব্য পড়েছি, তাথেকে ওদেশে আপনার বক্তৃতার যে খুব আদর হয়েছিল তা বোঝা যায়। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' কাগজের একটি মন্তব্য যেমন : 'Swami Abhedananda has the advantage of a remarkably winning personality, and the ability to make interesting abstract philosophic subject relating to religious life' (স্বামী অভেদানন্দের একটা সুবিধা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে—যা দিয়ে তিনি সকলের মনকে জয় করতে পারেন, আর আছে ধর্মজীবনের উপযোগী নিছক নিরস দার্শনিক বিষয়বস্তুকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করার কৃতিত্ব)। এ' রকম মন্তব্য আমেরিকার আরো অনেক কাগজে বার হয়েছিল, সে' সবের পেপার-কাটিংস আপনার আলমারীতেই আমরা

দেখেছি। একজন ভারতবাসীর পক্ষে এ'রকম সম্মান লাভ বড় কম নয়!'

স্বামিজী মহারাজঃ 'বাবা, কমেণ্টের (মন্তব্যের) ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড (কথার পর কথা) মনে রেখেছ দেখছি। এ'রকম প্রশংসা ক'রে আমার লেক্‌চার (বক্তৃতা) সম্বন্ধে কত শত মন্তব্য ওদেশের কাগজ বার করেছে। সব তো আর নিয়ে আসতে পারিনি, আনলে দেখতে দু'তিন আলমারী ভর্তি হ'য়ে যেত। তারপর শুধু কাগজে নয়, বড় বড় নামজাদা প্রফেসার, আর্টিষ্ট, নভেলিষ্ট, এ্যাক্‌টার-এ্যাক্‌ট্রেস্, টুরিষ্ট (অধ্যাপক, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ভ্রমণকারী) এঁদের মন্তব্যও আছে। আমি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারতাম। ওরাও অবাধে মিশতো। ওরা আমাকে বিদেশী ব'লে কোনদিন মনে করতো না, আমি ছিলাম যেন ওদেরই সমাজের বা দেশের একজন লোক। তা ছাড়া ওরা ছিল সত্যই গুণগ্রাহী'।

আমরাঃ 'এটাই কিন্তু নিয়ম মহারাজ। শুধু ধর্মপ্রচার কেন, শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরী বা যে'কোন কাজের জন্য যে'কোন দেশে আমরা যাই না কেন, যদি সে দেশের মতো হ'য়ে সেই সব সমাজের লোকের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারি তবেই তাদের সহানুভূতি ও ভালবাসা ঠিক ঠিক পাব'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'ঠিকই বলেছ, *give and take rule* (দেওয়া ও নেওয়ার নীতি)। আসলে যতটুকু তুমি মানুষকে সত্যিকারভাবে দেবে, ততটুকুই পাবে। একজনকে প্রাণখুলে যদি ভালবাস তো নিশ্চয়ই তার ভালবাসা তুমিও পুরোপুরি পাবে, আর ভালবাসার মধ্যে যদি চাতুরী বা দোকান-

দারী ভাব থাকে তো পাবার ঘরে শূন্য বসবে। কিছুই দেবে না, অথচ চাইবে—সে ক্যামন ক'রে হয়। আমি ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ওদের মতো হ'য়েই মিশতাম। খেলায়, আমোদ-প্রমোদে, ভ্রমণে, গল্প করায়, পড়াশোনায় সকল ব্যাপারে ওদের সঙ্গে ওদের মতো হ'য়েই মিশেছি, ওরাও আমাকে ওদেরই সমাজের—ওদেরই দেশের একজন ব'লে দেখতো'। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লেন: 'দেখছি গল্প শুনতে তোমরা ভারি ভালবাস। তবে আর একটা মিটিঙের (অধিবেশনের) কথা বলি শোন। সেটা হবে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[১] সে'দিন ছিল রবিবার। ঐদিন *Buddhist Association*-এ (বৌদ্ধ-সম্মিলনে) ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি-উৎসব। জাপানের প্রধান পুরোহিত (*High Priest*) রেভারেণ্ড সোয়েন শাকাও (Rev. Soyen Shaka) উপস্থিত ছিলেন। আমি সে অনুষ্ঠান-সভায় একজন বক্তা হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সান্‌ফ্রান্সিসকোর মাননীয় কেণ্টক হোরি (Mr. Kentok Hori) ছিলেন তার সভাপতি। সেখানে বক্তৃতা শেষ হ'লে সভাপতি আমায় কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি ভগবান বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্ম জাপানে কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চীন ও জাপানের সম্পর্ক কিরকম ছিল, চীন ভারতবর্ষ থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন উপাদান নিয়েছিল কিনা, চীন ও জাপানকে ভারতবর্ষ কি দিয়েছিল এই সব নিয়ে প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা করলাম। সভায়

১। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল, রবিবার। স্বামিজী মহারাজ তাঁর *Leaves from My Diary*-তে এই তারিখই লিখেছেন।

জাপানের বিখ্যাত *Buddhist scholar* (বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত) ডি. টি. সুজুকিও (D. T. Suzuki) উপস্থিত ছিলেন। সুজুকি সত্যকারের একজন গুণগ্রাহী ও পণ্ডিত লোক। ভারতবর্ষের ওপর তিনি পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীন ও জাপান যে ভারতবর্ষের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী একথা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি মহাযান-বৌদ্ধধর্ম, জাপানী-বৌদ্ধধর্ম, জেন্-বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখেছেন'।

'আমার বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড সোয়েন শাকা বক্তৃতা করলেন। তিনি ইংরেজী জানতেন না, তাই জাপানী ভাষাতে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে *Mahayana Buddhism* (মহাযান-বৌদ্ধধর্ম) সম্বন্ধে বল্লেন। অধ্যাপক সুজুকি ইণ্টারপ্রিটারের (দোভাষীর) কাজ করেছিলেন। তিনি সেটাকে ইংরেজী ভাষায় তর্জমা ক'রে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন। বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড সোয়েন শাকা ও অধ্যাপক সুজুকির সঙ্গে আমার কিছুক্ষণ আলাপ হ'ল। দু'জনেই ছিলেন বেশ মিষ্টভাষী ও অত্যন্ত অমায়িক লোক'।

'বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। *Buddha and His Teachings* (বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষা)[৩] সম্বন্ধে আমার বক্তৃতাটি বড়। তা'ছাড়া *Lamasim in*

২। অধ্যাপক ডি. টি. সুজুকির *An Introduction to Mahayana Buddhism*, *An Introduction to Lankavatara-Sutra* প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট আদরণীয়।

৩। নূতন সংস্করণ *Great Saviours of the World* বইয়ে এই বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে।

Tibet (তিব্বতে লামাধর্ম), *Sintosim in Japan* (জাপানে সিন্‌টোধর্ম বা পিতৃপুরুষপূজা), *Buddhism in Japan* (জাপানে বৌদ্ধধর্ম) প্রভৃতি সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এ'সব বক্তৃতা দিতে হয়েছিল'।

দু'চার মিনিট চুপ ক'রে থেকে সহাস্যে রহস্য ক'রে আবার বল্লেন: 'বাবা, (নিজের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে) এই লোকটি কিন্তু আজকের নয়। লণ্ডনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যখন ডায়মণ্ড জুবিলি হয় তখন ইনি লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। সেটা হয়েছিল ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে (২২শে জুন)। মহারাণী ছিলেন একটু খর্বকায়, সাদাসিদে পোষাক। তাঁর ষাট বছর বয়সের জন্মতিথি-উৎসব। চার ঘোড়ার গাড়ী ক'রে মহারাণী বাকিংহাম প্যালেস (প্রাসাদ) থেকে গেলেন সেণ্ট-পলস্‌ ক্যাথিড্রেলে আর্ক-বিশপের আশীর্বাদ নেবার জন্য। প্যালেস (প্রাসাদ) থেকে ক্যাথিড্রেল (গীর্জা) পর্যন্ত রাস্তার দু'ধার সাজানো হয়েছিল। কাতারে কাতারে লোক। সমস্ত বাড়ী-ঘরদোরে নানা রকমের পতাকা প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল। মহারাণীর বডিগার্ড (দেহরক্ষী) অনেক পাঞ্জাবীও ছিল। প্রিন্স-অব-ওয়েলস্‌ (পরে যিনি সপ্তম এডোয়ার্ড) নিজে ঘোড়ায় চড়ে মহারাণীর আগে আগে যাচ্ছিলেন। সে এক অভিনব দৃশ্য। সকলের রঙ-বেরঙের পোষাক-পরিচ্ছদ, জাঁকজমক, শান্তিপাহারা, নিয়মশৃঙ্খলা অপূর্ব ধরণের, না দেখলে বোঝানো যায় না'।

'লণ্ডনে গিয়ে প্রথমবার ব্লুমস্‌বেরি স্কোয়ার খ্রীষ্টো থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটীতে আমার 'পঞ্চদশী' সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা তো তোমরা শুনেছ। বক্তৃতা দেওয়া

ছাড়া ওদেশে (লণ্ডনে, আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে) বড় বড় লোকদের বক্তৃতা শোনাও যথেষ্ট হয়েছে। ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) অধ্যাপক জগদীশ বসুর বক্তৃতাও ঐ সময়ে ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউটে হয়েছিল। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রিয়ে (Lord Reah) তাতে preside (সভাপতিত্ব) করেন। আমিও গিয়েছিলাম সেই বক্তৃতা শুনতে। অনেক সুশিক্ষিত লোকের ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতার পর ডাঃ বসুর (জগদীশচন্দ্র বসু) সঙ্গে আমি দেখা করি। আমায় দেখে তিনি ভারি খুসী হয়েছিলেন। তাঁর নব-আবিষ্কৃত 'আর্টিফিসিয়াল আই' (*Artificial Eye*—নকল চক্ষু) যন্ত্রটি তিনি আমায় দেখালেন। মিঃ ষ্টার্ডিও আমার সঙ্গে ছিলেন'।

'ডাঃ মায়ার্সের (Dr. Myers) লেকচারও আমি শুনেছি। পরলোকতত্ত্বের ওপর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রেত-তত্ত্বের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। একবার 'হিপ্‌নোটিক হিলিঙ্' (*hypnotic healing*—অজ্ঞানাবস্থায় আরোগ্য করা) সম্বন্ধে তিনি লণ্ডনের সাই-কিক্যাল রিসার্চ সোসাইটীতে (প্রেততত্ত্বানুশীলন-সমিতিতে) বক্তৃতা দেন। হিপ্‌নোটিক হিলিঙে যে-কোন রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে তার অবচেতন মনে সাজেসচান (*suggestion*—

৪। স্বামিজী মহারাজ কখনো কখনো 'লেকচার' ইংরেজী শব্দ, আবার কখনো কখনো 'বক্তৃতা' বাঙ্গালা এই উভয় শব্দই ব্যবহার করতেন।

কোন ধারণার ইঙ্গিত) দিয়ে রোগ সারানো যায়। তিনি যেভাবে লেকচার দিয়ে বিষয়টি সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছিলেন তা' এখনো আমার মনে আছে। আমি ষ্টার্ডির সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার পর ডাঃ মায়ার্সের সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সত্যই হিপ্‌নোটিক হিলিঙের কোন *scientific basis* (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) আছে কিনা। তিনি আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হ'য়ে একদিন তাঁর *practical demonstration* (হাতেনাতে প্রমাণ) আমায় দেখিয়েছিলেন। একটি অসুস্থ য়ুরোপীয়ান মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে সাজেসচান (*suggestion*) দিয়ে তিনি তার অসুখ ভাল করেছিলেন। এ' আমার নিজের চোখে দেখা'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেঃ 'মহারাজ, সাজেসচান (*suggestion*) দিলেই দেহের অসুখ সারে এটা ক্যামন ক'রে হয় ?'

স্বামিজী মহারাজঃ 'কেন সারবে না বলো ? আসলে অসুখটা কার ? আত্মার, দেহের—না মনের ? তোমরা কেন, ডাক্তারাও বলবেন—অসুখ হয় দেহের। কিন্তু দেহ তো আসলে জড় যন্ত্র, দেহের পিছনে যদি মন না থাকে তবে দেহ আর কি করতে পারে বলো। মনের অভাবে *sensation* (সংবেদন বা চেতনা) বলো, *feeling* (অনুভব) বলো, আর যেকোন জ্ঞানই বলো কোনটাই হ'তে পারে না। তাই সত্যকারের অসুখ হয় মনের। মনটাই অসুস্থ, চঞ্চল বা বিকৃত হয়। মনে বিকৃতি বা চাঞ্চল্য এলে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে শরীরে সংক্রমিত হয়। তখন লোকে মনে করে দেহের বিকৃতি হয়েছে, দেহের অসুখ করেছে'।

আমরা : 'এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মহারাজ। শরীরে যখন কোন আঘাত লাগে তখন মনটা খারাপ বা অসুস্থ হয়। দেহে কোন ক্ষত বা দেহটা আহত ও যেকোন কারণে অসুস্থ হ'লে তবেই সেটা অনুভব করে মন, তখনই মন হয় অসুস্থ। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ থাকে। সুতরাং আগে শরীর, তারপর মন। আগে শরীরের হয় বিকৃতি বা অসুস্থতা, তার পরে মনের—এটাই ঠিক ব'লে মনে হয়'।

স্বামিজী মহারাজ : 'সাধারণতঃ এটাই তো মনে হয় সকলের। সকল লোকই ভাবে দেহটা আগে, তারপর মন, চৈতন্য বা আত্মা। আসলে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা। যারা বলে দেহটা আগে কিংবা জড়বস্তু আগে, তারা জগতের সব-কিছুকে দেখে জড়বস্তুর ভেতর দিয়ে, জড়বস্তুই হয় তাদের *medium* (মাধ্যম বা দ্বার)। একে ইংরেজীতে বলে *materialistic view* (জড়বাদসম্মত দৃষ্টি বা জড়দৃষ্টি)। *Materialism*-এ (জড়বাদে) মন বা চৈতন্যকেও ম্যাটারের (জড়বস্তুর) সামিল করা হয়। সেখানে *one primordial stuff of the world* (জগতের আদিবস্তু বা সত্তা) হ'ল 'ম্যাটার' (জড়বস্তু)। ম্যাটারই সেখানে একমাত্র সত্য। মন, চৈতন্য ও এমন কি আত্মা পর্যন্ত সেখানে *by product of matter* (জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন জিনিস)। সুতরাং *materialistic viewpoint*-এ (জড়-দৃষ্টিভঙ্গিতে) মন ও আত্মাকে এক দিক থেকে অস্বীকারই করা হয়। জড়দৃষ্টিতে মানুষ দেখে দেহটা রক্ত-মাংস-পেশী-তন্তু এ'সব দিয়ে তৈরী। অথচ modern science-এর (আধুনিক বিজ্ঞানের) কাজ একমাত্র জড়জগৎ নিয়ে হ'লেও সে *energy* (শক্তি) ব'লে একটা পদার্থ

স্বীকার করে। সে স্বীকার করে *energy* (শক্তি) *electricity*-ই (বৈদ্যুতিক শক্তি) হোক বা আর-কিছুই হোক, সেটা না হ'লে জড়ে ক্রিয়া হয় না। ম্যাক্সওয়েল, আইনষ্টাইন, ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক, জিন্‌স, ক্রোথার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন *matter* (জড়) থাকা মানেই তার পিছনে *energy*-ও (শক্তি বা চৈতন্যও) আছে একথা স্বীকার করা'।

'*Materialist*-রা (জড়বাদীরা) প্রায় সকলে *realist* (বাস্তববাদী)। তাদের মধ্যে অনেকে আবার ম্যাটার ছাড়া 'গতি' অর্থাৎ movement ব'লে একটা জিনিষ স্বীকার করে।[৫] অন্তত ইংরেজ দার্শনিক হব্‌সের (Hobbes) তাই অভিমত। এদেরকে বলা হয় *monistic materialists* (একত্ব-জড়বাদী)। তেমনি আবার *dualistic materialit*-রা (দ্বৈত-জড়বাদীরা) আছেন। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য দর্শনে *materialism*-এর আবার অনেক ভাগ আছে'।[৬]

'জড়বাদীরা *realist* (বাস্তববাদী) হয় কেন জান? তারা জড়বস্তু ছাড়া সারা দুনিয়ার মন, চৈতন্য বা আত্মা প্রভৃতি আর কোন জিনিষকে মানবে না ব'লে। সাধারণত মানুষমাত্রেই হয় *realist* (বাস্তববাদী)। *Realist*-দের (বাস্তববাদীদের)

৫। এখানে মনে রাখা উচিত যে, movement বা গতিও matter-এরই (জড়েরই) একটা ভিন্ন রূপ মাত্র। জড়ত্বই তার গুণ ও স্বরূপ। তবে জড় থেকে 'গতি' বলে একটা বস্তু স্বীকার করে মনিষ্টিক বা একত্ববাদীতে বিশ্বাসী জড়বাদীরা।

৬। যেমন *theoretical* and *proctical* materialism, attributive, causal, equative, monistic, dualistic প্রভৃতি materialism.

মত হ'ল : physical things are *out there* in the space, অর্থাৎ জড়বস্তু মনের বাইরে (মন-নিরপেক্ষ হ'য়ে) সত্য সত্য থাকে, আর তাতে ক'রে ঘরবাড়ী সত্য, গাছ সত্য, চেয়ার সত্য—দুনিয়ার সব-কিছু সত্য। *Materialism*-এর (জড়বাদের) মতো *realism*-ও (বাস্তববাদও) মন বা চৈতন্যকে (*consciousness*) স্বীকার করে না। তবে বাস্তববাদীরা জড়বাদীদের মতো স্বীকার করে না যে, মন বা চৈতন্য *by-product of matter* (জড়বস্তু থেকে তৈরী জিনিস)—এই যা তফাৎ'।

'জগতে সব জিনিসেরই *thesis* (স্বপক্ষ) ও *antithesis* (বিপক্ষ) আছে। তার মানে একজন একটা মত প্রতিষ্ঠা করলে, আর অন্যজন সেটা খণ্ডন ক'রে ভিন্ন মত স্থাপন করলে। এ'রকম রীতি সুপ্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশেই চলে আসছে। ভারতীয় দর্শনে এমন দ্বৈতমতের বিপক্ষে অদ্বৈতবাদ, আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পাশ্চাত্য দর্শনেও তাই। *Materialism* (জড়বাদ) সর্বসাধারণের জন্য। *Spiritualism* (জ্ঞান বা আত্মবাদ) তার *antithesis* (বিপক্ষ)। *Realism* (বাস্তববাদ)[৭] সাধারণের কাছে আদৃত, আর *idealism* বা *mentalism* (ভাববাদ, মনোবাদ বা বিজ্ঞানবাদ) দেখা দিল জড়বাদের *antithesis* (বিপক্ষ)-রূপে।

৭। Realism বা বাস্তববাদের ও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তবে প্রধানতঃ ***realism*** বলতে direct, naive অথবা common sense realism বুঝায়। তাছাড়া representative, critical, scientific প্রভৃতি realism আছে।

Idealism-এর[৮] প্রচার করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে বিশপ বার্কলে (Berkeley)'।

আমরা : 'আইডিয়ালিজম জিনিসটা কি মহারাজ' ?

স্বামিজী মহারাজ : '*Idealism*-এর (বিজ্ঞানবাদের) অর্থ জগতের সব-কিছুকে দেখা, বোঝা বা বলা হয় *idea*-র (বিজ্ঞান বা ভাবের) ভেতর দিয়ে ; অর্থাৎ we see and realize things of the world *thorough* the ideas or mind (আমরা জগতের সব-কিছু দেখি ও বুঝি ভাব বা মনের মাধ্যমে)। অথবা বলা যায় everything knowable or every object of experience is in its proper or original nature a contents of mind or consciousness (আমরা যা-কিছু জানি ও অনুভব করি, সত্যিকারের স্বরূপ তাদের মন বা জ্ঞান)। মোটকথা *idealism*-এ (বিজ্ঞান বা ভাববাদে) mind বা consciousness (চৈতন্য) হয় medium (মাধ্যম বা দ্বার)। *Idealistic viewpoint*-এ (মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে) *idea* বা মনের ভাব বা ধারণাটা আগে ধরা পড়ে, তারপর *matter* (জড়বস্তু)। *Idealism*-এর (ভাব বা বিজ্ঞানবাদের) মতো *spiritualism*-এর[৯] (মন বা আত্মবাদ) *realism* (বাস্তববাদ) ও

৮। Idealism-ও অনেক রকমের। তবে প্রধানত এদের দুটি রূপ প্রসিদ্ধ : একটি *objective idealism* ও অপরটি *subjective idealism* কিংবা *solipsism*। তা' ছাড়া *transcendental idealism* আছে—যা জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট, ফিক্টে এঁরা স্বীকার করেছেন।

৯। 'কনসাসনেস (consciousness) বলতে আত্মচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান নয়, এটি মনেরই ভিন্ন নাম বা রূপ, যাকে 'ধারণা' বলা যায়।

materialism-এর (জড়বাদের) *antithesis* (বিপক্ষ) তা' আগেই বলেছি। স্পিরিচুয়ালিজম যা-কিছু প্রতিপন্ন করে সবই *mind* বা *spirit*-এর (মন ও বিজ্ঞান বা চৈতন্যের) ভেতর দিয়ে'।

'আমাদের দেশে বৌদ্ধদের ভেতর যারা বিজ্ঞানবাদী, যারা বিজ্ঞান বা *consciousuess* ছাড়া অন্য কিছু মানে না তারাও ঐ একই কথা বলে। তারাও আগে বিজ্ঞান ও পরে জড়বস্তুকে স্বীকার করে। বিজ্ঞানবাদীদের ভেতর অনেকে একমাত্র বিজ্ঞান ছাড়া অন্য-কিছুই স্বীকার করে না। তারা পাশ্চাত্যদেশের *subjective idealist*-দের (বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদীদের) মতো। শংকরও বিজ্ঞান স্বীকার করেছেন, তবে ঐ চরম-বিজ্ঞানবাদীদের মতো নয়। তিনি পাশ্চাত্যের কাণ্ট, ফিক্টে, শেলিঙ প্রভৃতিদের মতো *objective idealist*-র (বিষয়-বিজ্ঞানবাদীর) অন্তর্ভুক্ত। শংকর জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক সত্তা তিনি স্বীকার করেছেন।'[১০] কাণ্টও তাই। কাণ্টের মতে *world as appearance* (বিকাশ হিসাবে জগৎ) *thing-in-itself*-এর (স্বরূপসত্তা

১০। আচার্য শংকরকে অনেক 'মায়াবাদী' বলে সমালোচনা করেন, কেননা তিনি নাকি জগতের বস্তুসত্তাকে তুচ্ছ ও মায়া অর্থে অলীক বা মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়, তিনি 'মায়া' অর্থে অলীক বা মিথ্যা বলেন নি, বলেছেন অসৎ, অর্থাৎ পারমার্থিক সৎ নয়, কিন্তু ব্যবহারিক সৎ। মায়াবাদেরও তিনি সমর্থক বা প্রচারক নন, বস্তুত তিনি 'ব্রহ্মবাদী', অর্থাৎ মায়ার অস্তিত্ব প্রমাণ না ক'রে তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্বই প্রমাণ করেছেন ও একান্তভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করেছেন পূর্ব-পূর্ব আচার্যদের অনুসরণ ক'রে।

ব্রহ্মের) তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তার *objective appearance*-এর (বস্তুতাত্ত্বিক বিকাশের) একটা *relative* ও *phenomenal existence* (আপেক্ষিক ও জাগতিক বা ব্যবহারিক সত্তা) আছে। তিনি তাই হু'টো *view-point*-ই (দৃষ্টিভঙ্গিই) স্বীকার করেছেন : একটা *phenomenal* (জাগতিক বা ব্যবহারিক) ও অপরটা *transcendental* (বিশ্বাতীত বা পারমার্থিক)। তাঁর মতবাদে তাই *realism* ও *idealism* (বাস্তববাদ ও বিজ্ঞানবাদ) হুটোরই স্থান আছে'।

'যাক, এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। তোমাদের প্রশ্ন ছিল *mental suggestion* (মানসিক ইঙ্গিত বা প্রেরণা) দিয়ে দেহের অসুখ সারানো যায় কিনা। কেন যাবে না ? আমি আগেই বলেছি যে, অসুখ আসলে হয় কার ? প্রথমত, বলা যেতে পারে দেহের। সুতরাং মনটাকে যদি দেহ থেকে আলাদা ক'রে নাও তাহ'লে দেহের অসুখ হ'লেই কি আর না হ'লেই কি, মন অর্থাৎ তুমি কিছু জানতে পারবে না। কাজেই অসুখের দিকে মন না থাকায় সেটা বস্তুত থাকলেও না-থাকারই সামিল হয়'।

'দ্বিতীয়ত, অসুখ হয় দেহের এ'কথা যদি ধরেই নেওয়া যায় তাহলেও দেহের ওপর মনের কর্তৃত্ব আছে অসীম। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের যদি পরিবর্তন করা যায়, তবে শরীরের বাইরে বা ভেতরে কোন অসুখ করলে ইচ্ছাশক্তি তা' সারাতে পারবে না কেন ? মানুষের শরীরের মধ্যে যে সমস্ত জীবাণু আছে তারা জীবিত, তাদের ভেতরেও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ আছে। বিশেষ ক'রে রক্তের মধ্যে যে রেড়-কর্পসেল ছাড়াও ওয়াইট-কর্পসেল

(লাল ও সাদা রক্ত-জীবাণু) আছে তারা আমাদের শরীরের মধ্যে সৈনিকের মতো কাজ করে। শরীরের কোন জায়গায় আঘাত লাগলে—কি ক্ষত হ'লে তারা যোদ্ধার মতো বিষাক্ত জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ক্ষত, আঘাত বা অসুখ সেরে যায়, আর পরাজিত হ'লে তারা জীবন দেয়—যার ফলে ক্ষতস্থানে বা আহত জায়গায় অনেক সময় pus form করে (পুঁজ জন্মায়)। ঐ pus form-এর (পুঁজ জন্মানোর) দ্বারাও তারা আমাদের কল্যাণ সাধন করে। *Hypnotic healing*-এ (হিপনোটিক হিলিঙে) প্রথমে রোগীকে সম্মোহনশক্তি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অজ্ঞান করা হ'য় ও পরে *suggestion* (ইঙ্গিত) দেওয়া হয় যে তুমি সেরে গেছো। সাজেসচানটা *mental thing* (মানসিক বস্তু) বা কতকগুলো *vibration*-এর (কম্পনের) সমষ্টি মাত্র। *Positive mental vibrations* (ইতিমূলক মানসিক কম্পন) দিয়ে শরীরে জীবাণুদের দেহে ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার করা যায়। *Fighting corpuscle*-গুলোর (যুদ্ধকারী ক্ষুদ্র রক্তজীবাণুদের) শরীর ও শক্তিতে পরিবর্তন সৃষ্টি করা যায়, তাতে ক'রে জীবাণুগুলো যে'কোন অসুখ সারিয়ে দিতে পারে। *Mental suggestion* (মানসিক ইঙ্গিত) সেখানে মিডিয়মের (মধ্যস্থতার) কাজ করে'।

'তৃতীয়ত, অসুখটা সত্যিকারের হয় মনে, তারপর affect (বিকৃত) করে শরীরকে। নইলে শরীরে যদি কোন আঘাত লাগে ও মন অন্যমনস্ক থাকে, অর্থাৎ ঐ আঘাতের দিকে লক্ষ্য না রেখে মন যদি অন্যদিকে থাকে তবে আঘাতকে তখন অনুভব করবে কে? ঘুমিয়ে

থাকলে পাশের ঘরে যদি মারামারি বা একটা গণ্ডোগোল হয় তবে তুমি জানতে পারো না, জানবে যখন তুমি জাগবে বা বাইরের চেতনা তোমার মধ্যে আসবে। তাহলেই একথা ঠিক যে, জ্ঞান বা চেতনা আসলে আত্মার,—শরীর বা ইন্দ্রিয়ের নয়। তবে আত্মার ঐ জ্ঞান বা চেতনা বাইরে প্রকাশ পায় মনের ভেতর দিয়ে। মন তাই একটা *instrument* (যন্ত্র) বা *medium* (মাধ্যম)। ভারতীয় দর্শনে একে বলা হয়েছে 'অন্তরিন্দ্রিয়', অর্থাৎ *internal organ* বা *instrument*'।

আমরা নির্বাক হ'য়ে স্বামিজী মহারাজের কথা শুনছি। তিনি আমাদের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: 'এই বিচারগুলো অবশ্য জটিল, দু'এক কথায় পরিষ্কার ক'রে বুঝানো যায় না। তবে তোমরা মোটামুটি এ'কথা জেনে রেখো যে, যতক্ষণ মন শরীরের ওপর থাকে ততক্ষণই শরীরের চেতনা, জ্ঞান বা অনুভূতি সবই থাকে। নইলে মানুষ মরে গেলে জড়শরীরটা থাকে, কিন্তু মন বা প্রাণ থাকে না ব'লে শরীরের কোন চেতনা বা অনুভূতি থাকে না। তখন শরীরকে ছুরি দিয়েই আঘাত করো আর অন্য যা-কিছু দিয়েই কেটে খণ্ড খণ্ড করো না কেন—শরীর তার কিছুই জানতে পারে না, শরীরের তাতে কোনই কষ্ট হয় না। তাহলেই কথা যে, শরীরই কর্তা—না শরীর মন, প্রাণ ও চৈতন্যের নিয়ন্তা যিনি আত্মা তিনিই কর্তা। এটাই আগে ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর'।

'ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রী চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যরা এ'কথা ভালো ক'রেই বুঝতেন। তাঁরা

সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতি জড়া ও অচেতন, আর পুরুষ সচেতন। প্রকৃতি একা কিছুই করতে পারে না, চেতন পুরুষের সঙ্গে মিশলে তবেই তার মধ্যে ক্রিয়া হয়। তাই জড়শরীরের চিকিৎসা করলেও আয়ুর্বেদীরা চৈতন্যের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। মনীষী হ্যানিম্যানও সাংখ্যের ঐ তত্ত্ব বুঝেছিলেন ব'লে মনে হয়। *Homeopathic treatment*-এ (হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়) হোমিওপাথ ডাক্তাররা দেহের চিকিৎসা করেন মানে প্রথমে মনকে study (পর্যবেক্ষণ) ক'রে তারপর মনের চিকিৎসা করেন। *Homeopathic philosophy* (হোমিওপাথিক দর্শন) ঠিক এ'ভাবেই গড়ে উঠেছিল। মনীষী কেণ্ট (Kent) তাঁর হোমিওপাথিক দর্শনে এর কিছুটা আভাস দিয়েছেন'।

'সুতরাং সাজেসচান (*suggestion*) দিতে গেলে মনের ওপরই দিতে হয়। মনই দেহের চালক। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেনঃ 'মনো হি জগতাং কর্তৃ', অর্থাৎ মনই জগতের সৃষ্টিকর্তা। দুনিয়া আছে ও তাতে ভালমন্দ ঘটছে এ'সমস্তেরই জ্ঞান হয় মন আছে ব'লে। মন যদি সত্যিই না থাকতো তবে কেই বা দেখতো আর কেই বলতো যে, এই জগৎটা আছে বা নেই। তাই মনকে সাজেসচান (*suggestion*) দেওয়া মানেই মনের ভেতর নূতন idea (ভাব) দেওয়া যে, তুমি এই করো বা এই কোরো না, আর তাহলেই মন সক্রিয় হয় কিছু করা বা না-করার দিকে। সেই ক্রিয়াই সংক্রামিত হয় আবার দেহে

ও দেহের সমস্ত জীবাণুদের মধ্যে। আর তখনই তারা সচেতন ও শক্তিমান হয় ও কাজ করে, লড়াই করে, অসুখ সারায় প্রভৃতি'।

'দার্শনিক হিউম বলেছেন মন হ'ল '*a bundle of sensation*' (সংবেদন বা ভাবের সমষ্টি)। ভারতীয় দর্শনেও মন বা অন্তঃকরণকে বলা হয়েছে সংস্কারের সমষ্টি। অন্তঃকরণের ক্রিয়ার নাম 'বৃত্তি', যেমন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। একই অন্তঃকরণ যখন সংকল্প ও বিকল্প করে তখন 'মন', যখন বিচার করে 'এটা নয়—ওটা' বোলে তখন 'বুদ্ধি', যখন কিছুর ধারণা করে তখন 'চিত্ত' ও যখন 'আমার' বলে জ্ঞান করে তখন 'অহংকার'। একটাই চার রকমভাবে প্রকাশ পায়। একই প্রকৃতি যখন স্থির থাকে, তখন সত্ত্বগুণ, যখন কাজ করে বা চঞ্চল হয় তখন রজোগুণ, আর যখন মূঢ় বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় তখন তমোগুণ। কাজটা গুণেরই পরিণতি বা product (কার্য)। একই প্রকৃতি তিন গুণে তিন রকমভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রে কাজ করে। গুণগুলো প্রকৃতির মানে গুণ থেকে প্রকৃতি আলাদা নয়, গুণগুলো মিলেই বা গুণের সমষ্টিই প্রকৃতি'।

'ইংরেজীতে সংস্কারকে বলে *impression* (ইম্‌প্রেসন)। সংস্কারকে *ideas*-ও (ভাব বা ধারণাও) বলা যায়। মনটা আসলে সংস্কারের সমষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলেছেন মন সরষের পুঁটুলি, একবার ছড়িয়ে গেলে কুড়ানো কঠিন। আমাদের অবচেতন মনে জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য সংস্কার পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। Western psychologist-রা (পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকরা) অবচেতন মনকে

বলেছেন 'ice-berg', বা 'boundless ocean'। অবচেতন মন যেন একটা বরফখণ্ডের মতো—তার তিন ভাগ জলের মধ্যে ডুবে থাকে ও একভাগ থাকে জলের ওপরে ভেসে। কিংবা মন যেন মহাসমুদ্র—যার কুল-কিনারা নেই'।

'সাজেসচান (*suggestion*) আসলে *idea*-ই (ধারণাই), আর মন *ideas*-এর (ধারণার) সমষ্টি।[১১] দুটোই আবার কম্পন ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাজেসচান (*suggestion*) দিলে মন সক্রিয় হয় তা' আগেই বলেছি। *Vibration* (কম্পন) *vibration*-এর (কম্পনের) নাগাল পায়, কারণ দুটোই এক জিনিস। মন ক্রিয়মান বা চঞ্চল হ'লে শরীরের জীবাণুগুলোতেও ক্রিয়া চলতে থাকে, আর সেই ক্রিয়াই শরীরের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে অসুখ সারিয়ে দেয়। যোগীরাও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজেদের রোগ সারিয়ে ফেলতে পারেন। অপরের দেহের অসুখও তাঁরা মনে করলে ইচ্ছাশক্তি বা সাজেসচান (*suggestion*) দিয়ে সারাতে পারেন'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম, স্পিরিচুয়ালিজম (বাস্তববাদ, বিজ্ঞানবাদ, অধ্যাত্মবাদ) প্রভৃতির কথা আগে যা আলোচনা করলেন ওগুলো তাহলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য কিছু নয়'।

১১। এখানে মন যেন আধার ও ধারণাগুলো আধেয় বা মনের উপাদান। কিন্তু আসলে মনও যা, ধারণাও তাই। অনেকে আবার মনকে বলেন কারণ (cause) ও ধারণাগুলি কার্য (effect)। কিন্তু তা' ঠিক নয়, আসলে দুটোই এক ও অভিন্ন, তবে সাধারণভাবে প্রকাশের দিক থেকে মনে হয় একটা কারণ ও অপরটা কার্য।

স্বামিজী মহারাজঃ 'হ্যাঁ, যে যেমন ভাবে বা চিন্তা করে সে তেমনই দেখে বা বোঝে। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের নিজের জগতে (ধারণার জগতে) বাস করে, তাই তোমার জগৎ আমার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। '*Ism*' বা 'বাদ'-গুলো যেন এক একটা চশমা বা কাঁচের পরকোলা — নীল, লাল, সবুজ, হল্‌দে—নানান রকমের। তুমি যদি নীল-চশমা দিয়ে দেখ তো দুনিয়ার সকল জিনিসই তোমার কাছে নীল ব'লে মনে হবে। লাল চশমা দিয়ে দেখলে দেখবে সব লাল। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শাক্ত্যাদ্বৈতবাদ বা জড়বাদ, মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্যের *realism, idealism, materialism, spiritualism, monism, pantheism, parallelism, phenomenalism, absolutism* এ'সমস্তই মানুষের মনের ধারণা, আর এ'গুলোই মতবাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে যেমনভাবে জগৎ ও ঈশ্বরকে বুঝেছে সে তেমনিভাবে তাদের বর্ণনা করেছে। তাই জিনিস আসলে একটা হলেও বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। '*Ism*' ও 'বাদ' কোনটারই পারমার্থিক সত্তা নেই, তারা এক একজন মানুষের নিজস্ব মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য কিছু নয়'।

'শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে অন্ধদের হাতী দেখার গল্পটা বলেছেন তা' জানতো? যে ল্যাজে হাত দিয়েছিল সে বল্লে হাতী সাপের বা দড়ির মতো, যে দিয়েছিল পায়ে হাত সে বল্লে হাতী গাছের গুঁড়ির মতো, যে হাত দিয়েছিল কাণে সে বল্লে হাতী কুলোর মতো, আসলে হাতী সাপও নয়, দড়িও নয়, গাছের গুঁড়ি বা কুলো নয়, হাতী হাত-পা-নাক-মুখ-চোখওয়ালা জন্তু-বিশেষ। পরমবস্তু ভগবানকে সে'রকম ইজিমের (দৃষ্টিভঙ্গির) ভেতর দিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে

বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসলে তিনি একই। তাই সত্যকারভাবে যিনি ভগবানকে দেখেছেন তিনিই তাঁর যথার্থ স্বরূপ বুঝতে ও বলতে পারেন, আর যারা কেবল কল্পনা করে, তারাই নানান রকম কথা বলে, অথচ নানার কোনটাই সত্য নয়, সত্য যা—তা' উপলব্ধির জিনিস, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জিনিস। তাই সত্যিকারের শান্তি বা মুক্তিকামী যাঁরা তাঁরা তুনিয়ায় আসল কারণকে খুঁজে বার করতে চান। এই চাওয়াই সাধনা ও সাধনায় সিদ্ধি মানেই সৃষ্টির মূলে যে সত্য ও শাশ্বত বস্তু আছে তাকে ঠিকঠিকভাবে খুঁজে বার করা। বলতে বা বর্ণনা করতে না পারলেও সত্যদ্রষ্টা পুরুষ সত্যকে জানেন ও বোঝেন। সত্যের উপলব্ধিই মনুষ্য-জীবনের চরমলক্ষ্য। সত্য ছাড়া অন্য যা-কিছু, সবই সত্যস্বরূপ লক্ষ্যে পোঁছোবার উপায় বা পথমাত্র। '*Ism* বা 'বাদ'-গুলো ঐ পথের সামিল'।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন একটু চঞ্চল হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। স্বামিজী মহারাজ তা' লক্ষ্য করেছেন। তিনি একজনের দিকে হঠাৎ তাকিয়ে বল্লেন: 'হ্যাঁ, শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, আর নীরসঃ তরুবরঃ পুরত ভাতি'—তু'রকম জিনিস, একটা নীরস আর একটা সরস। আমার কথাগুলো তোমাদের কাছে একটু শুক্‌নো লাগছে, ক্যামন?'—এই ব'লে তিনি উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। আমাদের মধ্যেও একটা হাসির রোল উঠলো। স্বামিজী মহারাজের অনুমান যে ঠিক তা লক্ষ্য করতেই বুঝলাম, কারণ আমাদের মধ্যে সে'দিন তু'তিনজন আগন্তুক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন সংযমের পরাকাষ্ঠা রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও তু'একবার হাই না তুলে পারেন নি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'মানুষের মন আর কি না পারে বলো। মন এতো বলীয়ান কেন? তার পিছনে সর্বশক্তিমান আত্মা আছেন ব'লে। চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার ক'রে জ্যোতিষ্মান, মনও তেমনি। নইলে মন তো আসলে জড়—একটা যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব'লেই সে কাজ করে। মন সব-কিছু করে মানে আত্মাই মনকে প্রেরণা যোগায়। মন তাই *medium* (মাধ্যম) বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নেই, অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি', তাঁরই আলোক দুনিয়ার সব-কিছু আলোকিত। জীবজন্তু সবাই তাঁর কাছ থেকেই শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের ওপর সমানভাবে কিরণ দেয়, *partiality* (পক্ষপাতিত্ব) তাতে কিছুমাত্র নেই। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। আগুনই কি পেতে? আত্মাও তেমনি। মন আত্মার দ্বারী, সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর তখনি সে মনের বশীভূত হয় ও সৃষ্টি হয় যত-কিছু অনর্থ। 'সাধনা' মানেই মনের 'অহং'-কর্তৃত্বাভিমানকে নষ্ট করা, মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীরী আত্মা— যিনি শরীরে আছেন, আবার জগতের সর্বত্র আছেন। যখন এইরকম ভাবতে পারবে তখনি তোমার মন বশীভূত হবে, তুমি মনের পারে যাবে।' মনই মুক্তির অন্তরায়, আবার

১। 'মনের পারে' বলতে মন থাকে, কিন্তু তা আত্মচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। সংকল্প ও বিকল্প এই দু'টি বিরোধী বৃত্তি নিয়েই মনের মনত্ব, এ'দুটি নষ্ট অর্থাৎ শান্ত হ'লে মন আর মন-রূপে থাকে না,

মনই মুক্তির সহায়ক। অন্তরায়—কেননা মনই কর্তা সেজে নিজে আত্মা থেকে পৃথক এ'কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সহায়ক—কেননা মনই বুদ্ধি-রূপে আত্মাকে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হ'য়ে জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলে *Self-knowledge* বা *Godconsciousness*। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাকেই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ মহামায়া অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারেন না, তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু মনের, অর্থাৎ বুদ্ধির। মন বা বুদ্ধিই আবার মায়া বা মহামায়া। মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল পার্থিবদৃষ্টিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুইই এক'।

আমরাঃ 'মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন মন প্রসন্ন হ'লে তা' আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। তাই কি?'

স্বামিজী মহারাজঃ হ্যাঁ, তাই বৈকি। মন প্রসন্ন হওয়া

শুদ্ধচৈতন্য-রূপে তা' আত্মপ্রকাশ করে। ব্রহ্মে যখন সংকল্প-বিকল্পাত্মক আবরণ কল্পিত হয়, তখনই তিনি 'মন' রূপে প্রতিভাত হন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির আবরণ কল্পিত হ'লে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নিজেকে 'বুদ্ধি' রূপে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন সাজ-পোষাক পরে একই লোক বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে, আসলে লোক একটাই, তেমনি ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু নাম ও রূপের জন্য তিনি ভিন্ন বলে মনে হন। নাম-রূপের ধ্বংস আছে, কেননা তারা কল্পিত। সুতরাং মনের পারে যাওয়া বা মনের ধ্বংস বলতে 'মন' এই নাম ও রূপেরই কেবল ধ্বংস বা পরিবর্তন হয়, মনের নিয়ন্তা আত্মা চিরদিনই অবিকৃত ও শাশ্বত থাকেন।

মানে মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-দুটো চলে গেলেই মন শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ হলে আর মন থাকে না, তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মন প্রসন্ন হ'লে তাই আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা। সাপের গতি না থাকলে তাকে স্থিরসাপ বলা হয়। আসলে সচল সাপ ও নিশ্চল সাপের মধ্যে সাপ একটাই'।

স্বামিজী মহারাজকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে বল্লেন: 'বুদ্ধির গোড়ায় এবার একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক'। তিনি তামাক খেতে লাগলেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক (স্বামিজী মহারাজেরই শিষ্য) এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'এই যে, ক্যামন আছেন? আপনার চিঠি পেয়েছি। বাড়ীর অসুখ-বিসুখ কিছুটা সেরেছে তো?' ভদ্রলোক শশব্যস্তে উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব আপনারই আশীর্বাদ'।

স্বামিজী মহারাজ: 'আমার আশীর্বাদ নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র বৈ তো নয়, তিনিই যন্ত্রী, তাঁর ইচ্ছায়ই সব-কিছু হচ্ছে'।

ভদ্রলোক আমাদের পাশে এসে বসলেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ খুসী মেজাজে আবার বল্লেন: 'এখন আমেরিকার গল্প চলছে। অনেক দিনের কথা, এতদিন পরে সেই সব কথা বলতে বেশ আনন্দ লাগছে। আর আপনাদেরও লাভ—বিনা পয়সায় আমেরিকার সব খবর জানা হ'য়ে যাচ্ছে'।

ভদ্রলোক বল্লেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ'। স্বামিজী

মহারাজ তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'স্যর জগদীশ বসুর প্রসঙ্গে আমেরিকার এক দিনের কথা মনে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে সেটি ইংরেজী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হবে।[২] সে'দিন সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেকচার (বক্তৃতা) ছিল ট্রিনিটি অডিটোরিয়মে (*Trinity Auditorium*)। রবীন্দ্রনাথ একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট্ (*manuscript*—বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি বা লেখা কাগজ) পড়ছিলেন *The World of Personality*-র ('ব্যক্তিত্বের বিকাশ'-এর) ওপর। অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল। লেকচার (বক্তৃতা) হ'য়ে গেলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমেরিকায় আমার কাজের কথা খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কৃতকার্যতা ও কাজের প্রসারতার কথা শুনে খুব খুসী হয়েছিলেন'।

'তাছাড়া আর একটা মিটিঙে (*meeting*—সভায়) তিনি (রবীন্দ্রনাথ) *preside* (সভাপতিত্ব) করেন, আমি তাতে বক্তৃতা করেছিলাম। সেবার আমার আশ্রম দেখার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করি। কিন্তু কাজের চাপের জন্য তিনি যেতে পারেন নি'।

'লালা লাজপত রায়, ধর্মপাল (অনাগারিক দেবমিত্ত ধর্মপাল—মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা), আলোয়ারের মহারাজা (জয়সিংহ), বরোদার গাইকোয়াড় (সওয়াজী রাও) ও মহারাণীর সঙ্গেও আমার আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। একবার একটা মিটিঙে (সভায়) আমি *Worship of Buddha* (বুদ্ধের পূজা) সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলাম,

২। ইংরেজী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

অনাগারিক ধর্মপাল তাতে উপস্থিত ছিলেন।[৩] আমার আশ্রমে যেতে একদিন তাঁকেও নিমন্ত্রণ করি। ঐদিন শরৎচন্দ্র রুদ্র (জিওলজিষ্ট ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার এস. সি. রুদ্র) ও বোম্বের ডাঃ এস. বি. নায়েকের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছিল'।

'আলোয়ারের রাজা জয়সিংহ ছিলেন তখন হাইড পার্ক হোটেলে (*Hyde Park Hotel*)। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। মহারাজ খুব বিদ্বান ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অতি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারতেন, ঠিক ইউরোপীয়ানদের মতো। আমি নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করি। আমেরিকায় আমার কাজ বেশ successfully (সাফল্যের সঙ্গে) হচ্ছে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেদান্ত সম্বন্ধেও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। আমার সঙ্গে একঘণ্টারও ওপর বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করলেন'।[৪]

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, আপনি যে বরোদার গাইকোয়াড়ের কথা বল্লেন, ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কোথায়?'

স্বামিজী মহারাজ: 'আমেরিকায়ই গাইকোয়াড় ও মহারাণীর সঙ্গে আমার দেখা ও আলাপ-পরিচয় হয়।[৫] গাইকোয়াড়ের ভাই ও তাঁর সেক্রেটারী মিঃ দাতারাও (Mr. Datar) সঙ্গে

৩। ইংরেজী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ, ১২ই নভেম্বর, রবিবার।

৪। ইংরেজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ, ১৫ই ও ১৬ই জুলাই, সোম ও মঙ্গলবার।

৫। ইংরেজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, ১৩ই মে রবিবার।

ছিলেন। আশ্রমে একদিন তাঁদের সবাইকে invite (নিমন্ত্রণ) ক'রে নিয়ে যাই।[৬] গাইকোয়াড় ও মহারাণী আশ্রম দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন। তাঁরা আমায় অনুরোধ জানান ভারতে ফিরে বরোদায় তাঁদের সঙ্গে যেন আবার দেখা করি। নানান কাজের চাপে এখানে (ভারতে) ফিরে তাঁদের সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথমবার ফিরে আসার ঠিক দু'একদিন আগেই তাঁদের সঙ্গে আমেরিকায় আমার দেখা হয়েছিল। যে'দিন প্রথমবার আমায় *Farewell Address* (বিদায়-সংবর্ধনা) দেওয়া হয় সে'দিনও মহারাজা, মহারাণী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন'।[৭]

তারপর কি জানি কেন হঠাৎ তিনি একটু গম্ভীর হলেন। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কিছুক্ষণ পরে আবার বল্লেন: 'ভগবান যার সহায়, সংসারে তার আর ভাবনা কি বলো। ভক্ত মানে সত্যিকারের সরল বিশ্বাসী একান্তচিত্ত সাধক। আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলি শোন—যার পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা ও করুণা ছিল। তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনও সদাসর্বদা করেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি ভূরি-ভূরি পেয়েছি। তাঁর *presence*-ও (উপস্থিতি) জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত

৬। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই মে সোমবার।

৭। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামিজী মহারাজ ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও কোন এক সময়ে একবার বরোদারাজ্যে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু নানান কারণে তা' সম্ভব হয় নি।

ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি'।

আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে বসে আছি, কারু মুখে কোন কথা নেই। ঘরের পরিবেশ শান্ত ও গম্ভীর। স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'একবারের কথা। লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল 'লুসিটেনিয়া'। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করলো। আমি হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে, কিন্তু সেবারেও ঠিক সে' রকম। তখন টিকিট কেনা আর হ'ল না, বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা—S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে।[৮] আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। চোখে জল এলো। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন'।

৮। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের যাত্রীবাহী জাহাজ (liner) 'লুসিটেনিয়া' (S. S. Lusitania) জার্মানদের কোনও একটি সাবমেরিনের আক্রমণে আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্ক-এর (Cork) উপকূলের কিছু দূরে ৭ই মে, ১৯১৫ তারিখে ডুবে গিয়েছিলো। সেই জাহাজ ডুবিতে ১১৯৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও ছিলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দেরও এ'রকমেরই একটা ঘটনা ঘটেছিল নাকি কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীদেবীর মন্দিরের সামনে। তিনি অশরীরী বাণী শুনেছিলেন শূন্যদেশ থেকে'।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'কি জানি বাবু, দৈববাণী—কি অশরীরী বাণী কিছুই তখন বুঝতে পারিনি। তবে এ'রকমের যে একটা হয়েছিল এটা ঠিক। অশরীরী বাণীও শোনা যায়।[১] কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় বাঁচিয়েছেন। তাঁর অশেষ করুণা আমাদের ওপর'।

আমরা ঃ 'মহারাজ, শুনেছি বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনী-লেখক শ্রদ্ধেয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('মানসী'-পত্রিকার সম্পাদক) নাকি ঐ লুসিটেনিয়া জাহাজেই ডুবে মারা যান'।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'তা হবে'। এই বলেই তিনি বেশ একটু অন্যমনস্ক হলেন দেখলাম।

১। অশরীরি বাণী বা দৈববাণী সম্বন্ধে অন্য সময় একবার স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম হ'ল ঃ সবার পিছনেই একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকা চাই। দৈববাণী আসলে চৈতন্যময় আত্মারই নির্দেশ বা ইঙ্গিতময়ী বাণী। সর্বান্তর্যামী ভগবান তো আত্মা বা জ্ঞান-রূপে সকলের ভিতরে আছেন। বিবেক, দিব্যদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যৎদৃষ্টি, দূরশ্রবণ—এ'সব আত্মারই শক্তি। সবার আত্মা সব সময়ই সকল-কিছু জানতে পারে। তাই দৈববাণী নিজেরই জ্ঞানময় আত্মার নির্দেশ, তা মনের ভেতর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র, কিন্তু লোকে ভাবে শূন্য থেকে ঐ শব্দ আসে।

এ'সম্বন্ধে *Divine Inspiration* বক্তৃতায় স্বামিজী মহারাজ আরো ভালভাবে বুঝিয়েছেন।

॥ স্মৃতি ঃ চোদ্দ ॥

পুনরায় লণ্ডন যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতে স্বামিজী মহারাজ সে'দিন 'তাঁর গুরুভাইদের কথা বলতে বলতে ভাবে বিভোর হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু প্রথমে যে কথার আলোচনা হচ্ছিল তা বন্ধ ক'রে হঠাৎ তিনি লাটু-মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) কথা বলতে লাগলেন। তিনি বল্লেন ঃ 'লাটু মহারাজ তখন বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকে। ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে এই ঘটনা হবে। লণ্ডনে যাবার সময় রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমায় আউটরাম ঘাটে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল লাটু, যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), হরি ভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ), তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), খোকা (স্বামী সুবোধানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) প্রভৃতি। কিন্তু বেশী ক'রে মনে পড়ছে লাটু মহারাজেরই কথা! বিদায় দেবার সময় তার কি কাতর দৃষ্টি। তার দু'টি চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল'!

'একবার একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল লাটু মহারাজকে নিয়ে। বরানগর মঠে থাকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার স্তোত্র রচনা করেছিলাম। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করতো। পূজার পর প্রতিদিন সকলে সমবেত হ'য়ে ঐ শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রই পাঠ করতাম। স্তোত্রের শেষে প্রণাম করতাম এই মন্ত্র ব'লে—

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং, ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈঃ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ'।

একদিন প্রণামের পর দেখি লাটু মহারাজ ভারি চটে গেছে। শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) সামনে পেয়ে রাগে জিজ্ঞাসা করলো: 'এ শরট্, টোমরা শেষে ঠাকুরকে ভুলে গিয়ে কিনা যীশুকেষ্টকে পূজো করতে আরম্ভ করলে? টোমরা কি সব হ'লে বোলো দিখি? এরি মধ্যে এমোন?' শরৎ তো হেসেই অস্থির। বুঝতে বাকী রইলো না যে প্রণামমন্ত্রের 'ঈশাবতারং' কথাটাই লাটুর প্রাণে ভারি দুঃখ দিয়েছে। আমি তারপর সেখানে গিয়ে উপস্থিত। শরৎ আমাকে দেখে বল্লে: 'কালী ভাই, লাটু কি বলে শোন। এ' আজ ভারি চটেছে'। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি ব্যাপারটা কি, এরই মধ্যে লাটু মহারাজ আমার সামনে এসে বল্লে: 'কালী, তুই এরি ভেতর ঠাকুরকে বলিস্ কিনা যীশুকেষ্টর অবতার?' শুনলাম লাটু মহারাজকে কেউ নাকি 'ঈশাবতারাং' কথাটার অর্থ যীশুখৃষ্টের অবতার বলেছে। আমি তখন বুঝিয়ে বল্লাম: 'ভাই, তাও কি কখনো হয়? শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা ভুলবো একথা মুখে আনাও অন্যায়। তিনি যে আমাদের মাথার মণি, তাঁকে ধরেই তো এত বাধা-বিপত্তি ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে আমরা এখনো টিকে আছি'। তারপর তাকে শ্লোকটার অর্থ বুঝিয়ে বল্লাম। তখন লাটু মহারাজের মুখে হাসি আর ধরে না। কি সে সরলতাপূর্ণ হাসি। লাটু মহারাজ আনন্দে ঘাড় নেড়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লে: 'ওঃ, তাই বলো, আমিই তাহ'লে ভুল বুঝেছিলাম'। শুনে শরৎ ও আমি হেসে অস্থির হলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর তার প্রগাঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ভাব দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী ভালোবাসাই লাটু মহারাজকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল'।

এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা স্বামিজী মহারাজের মধ্যে বেশ একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। দেখলাম চোখ-দুটো জলে ভরে উঠেছে। গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের নিবিড় ভালবাসার স্মৃতিই যেন তাঁকে বিচলিত করেছে বলে মনে হ'ল। কি সরলতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তিই না ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানরা। সকলেই ছিলেন একই ছাঁচে গড়া। একই ভাব, একই ধরণের সহজ সরল কথা ও আলাপ-আলোচনা। ছোট বড় সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁদের সমান ব্যবহার।

স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'লাটু মহারাজের স্বার্থহীন ভালবাসার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আলম-বাজার মঠে একবার আমার ভীষণ অসুখ করলো। ডাক্তার বল্লে ছোঁয়াচে অসুখ। লাটু মহারাজের সে কথায় দৃক্‌পাত নেই। শরৎও (স্বামী সারদানন্দ) তাই। দু'জনে আমার কি সেবাই না করেছিল!'

'লাটু মহারাজ মাঝে মাঝে আমায় আমেরিকায় চিঠিপত্র লিখতো। একবার লিখলে—চোখের অসুখ, ছানি কাটানো দরকার, কিছু টাকা পাঠাতে হবে। আমি তখুনি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম'।[১]

'আর একবার একটা মজার ব্যাপারের কথা বলি শোন। লাটু মহারাজ আমায় লিখে পাঠালে আমেরিকা থেকে একটা

১। এই ঘটনার কথা স্বামিজী মহারাজ তাঁর *Leaves from My Diary*-বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'Tues. (Tuesday), Oct. 27, Prof. Hiram Corson called about 11 A.M. Sent to Latoo £3—10s.=Over Rs. 50/-.'

ঘড়ি আর গেরুয়া পাগ্‌ড়ি পাঠাবার জন্য। আমি কিন্তু তাকে একটা র‍্যাট্‌ল সাপের (Rattle-snake)[২] ল্যাজ পাঠালাম। র‍্যাট্‌ল সাপ ভারি বিষাক্ত, কাকেও কামড়ালে সে আর বাঁচে না। ভগবানের সৃষ্টি কি রকম দেখো—তিনি তাই তার ল্যাজে ঝুমঝুমি দিয়েছেন। মানুষ বা যেকোন প্রাণী ঐ শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে র‍্যাট্‌ল সাপ আসছে। শুনেছিলাম র‍্যাট্‌ল সাপের ল্যাজ পেয়ে লাটু মহারাজ নাকি ভারি চটেছিল, বলেছিলঃ 'দেখো না, কালীর কি ব্যেপার? আমি বোল্লাম তাকে ঘড়ি আর পাগড়ী পাঠাতে, আর সে পাঠালে কিনা আমায় একটা সাপের লেজ? এ' তো ভারি কথা'।

আমরা শুনে সকলে হেসে উঠলাম।

স্বামিজী মহারাজ ঃ 'আমাদের (গুরুভাইদের) ভেতর এ'রকম হাসি-ঠাট্টা-তামাসা প্রায়ই চলতো।[৩] এটা

২। এ' রকম সাপ আমেরিকায় সচরাচর পাওয়া যায়। কাকেও কামড়াবার বা আক্রমণ করার আগে সে লেজ আছড়ায় ও তাতে ঝুরঝুমি বাজানোর মতো শব্দ হয়।

৩। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও একটি কথা। আমরা তখন কয়েকদিনের জন্য ছিলাম দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। ইংরেজী ১৯৩৩ কিংবা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হবে। সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে চিঠি লিখেছেন সেখানকার ঠাকুর-ঘরের জন্য একটি ঘণ্টা ও আরো কি কি জিনিস পাঠাবার জন্য। স্বামিজী মহারাজ চিঠি পেয়ে খুব একচোট হেসে বল্লেন: 'গঙ্গাধরের ব্যাপারটা একবার দেখো, পাহাড়ী জায়গা দার্জিলিঙ, বাস করি হিমালয়ের চুড়োয়, আর আমায় কিনা লিখে পাঠিয়েছে একটা ঘণ্টা কিনে পাঠাতে। ভালো, আমিও পাঠাচ্ছি তাকে মজার একটা

ভালবাসার লক্ষণ। আমি যখন আমেরিকায়, শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) এরাও প্রায় চিঠিপত্র লিখতো।[৪] ঠিক সময়ে উত্তর না পেলে তারা অভিমান করতো, রাগও করতো। কি ভালোবাসাই না তাদের মধ্যে ছিল!'

স্বামিজী মহারাজ তাঁর অভিন্নহৃদয় গুরুভাইদের কথা বলতে বলতে আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। মুখ প্রদীপ্ত, চোখ-দু'টি সামান্য ছলছল। তিনি আবার বলতে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময় আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলে: 'মহারাজ, শ্রীশ্রীমা'র করুণা তো আপনার ওপর অফুরন্ত ছিল, তাঁর প্রসঙ্গ কিছু আপনার মুখ থেকে আমাদের শুনতে ইচ্ছা হয়'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'শ্রীমা-র অজস্র আশীর্বাদ ও করুণা আমার ওপর সত্যই ছিল। তিনি ছিলেন সবারই করুণাময়ী মা। তিনি ছিলেন সরলা বালিকার মতো, বাইরের লোকের কাছে নিতান্ত লজ্জাশীলা, কিন্তু ভক্ত-সন্তানদের কাছে

জিনিস'। পরে শুনেছিলাম স্বামিজী মহারাজ পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজকে কতকগুলি পাহাড়ী রঙিন ফুল পাঠিয়েছিলেন—যা শুকিয়ে গেলেও অনেকদিন ধ'রে টাট্‌কা ফুলের মতো থাকে, একটি পূজার ঘণ্টা, একটি তিব্বতী লোমওয়ালা অদ্ভূত রকমের টুপী ও আরো কিছু খেলনার জিনিষ। জিনিসগুলি পেয়ে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ নাকি হেসেছিলেনও যেমন, চটেছিলেনও তেমনি—অবশ্য নিবিড় ভালবাসার ভাব নিয়ে।

৪। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের কয়েকটি পত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত "পত্র-সংকলন" বইয়ে ছাপা হয়েছে।

সদাই হাস্যময়ী। শ্রীমা থাকতেন স্বভাবতই অতি সাধারণ মেয়েদের মতো, মনে হ'ত দুনিয়ার কোন-কিছুই যেন তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁর ছিল ত্রিকালদর্শী চক্ষু, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই তিনি দেখতে পেতেন। অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও মহীয়সী নারী ছিলেন শ্রীমা, অথচ বাইরে ছিলেন সকল রকম ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরবিহীনা, এতটুকু অলৌকিক শক্তি বা বিভূতির বিকাশও তাঁর মধ্যে কখনো কেউ দেখেনি। মোটকথা শ্রীমা ছিলেন একাধারে সাদাসিদে পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সরলা আবার সর্বজ্ঞানময়ী সাক্ষাৎ জগজ্জননী। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও জীবনে কিছু-কিছু ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু শ্রীমা ছিলেন সর্বৈশ্বর্যবিহীনা। সকল শক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পেরেছিলেন। কি মহিয়সী নারীই না তিনি ছিলেন। তাঁর মহিমা উপনিষদের ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়ঃ 'তং দুর্দর্শং গূঢ়ম্'—দুর্বিজ্ঞেয় ও অতীব নিগূঢ় তাঁর ভাব ও প্রকৃতি'।

'আলমবাজার মঠে থাকতে 'শ্রীমার স্তোত্র'[৫] রচনা ক'রে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেনঃ 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'। 'মূকং করোতি বাচালং', সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল করেছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতো দেশে ধুবন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিতে পারে। সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের কৃপা!'

৫। 'প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাম্' প্রভৃতি ছন্দোময় শব্দে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্'।

আমরা: 'মহারাজ, আমরা শুনেছি শ্রীমা নাকি আপনার সঙ্গে কথা কইতেন না, স্বামী যোগানন্দজীকে দিয়ে সকল সময় আপনাকে ব'লে পাঠাতেন?'

স্বামিজী মহারাজ: 'কে তোমাদের বল্লে। যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ও আমি এই চারজনের সঙ্গে শ্রীমা কথা কইতেন। তবে শ্রীমা ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীলা, বাইরের যে কোন লোকের সামনে তিনি একহাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। এমনকি স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ), রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতির কাছেও শ্রীমা মাথায় একটু কাপড় দিয়ে অপরকে দিইয়ে কথা কইতেন। অতি সরলা বালিকার মতো স্বভাবসম্পন্না ছিলেন শ্রীমা, তাই লজ্জাটা ছিল তাঁর প্রকৃতির একটা অঙ্গ'।

'শ্যামপুকুরের বাড়ীতে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পেটের অসুখ, ডাক্তাররা পথ্যের ব্যবস্থা করলেন ভাত আর গুগ্‌লির ঝোল। শ্রীমা আমাকে বলতেন বাজার থেকে গুগ্‌লি কিনে আনতে। আমি বাজার থেকে গুগ্‌লি কিনে এনে ইঁট দিয়ে খোলাগুলো ভেঙ্গে তৈরী ক'রে দিতুম, শ্রীমা ঝোল রান্না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিতেন। 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্র' লিখে যখন শ্রীমাকে নিজে পড়ে শোনাই তখন তাঁর কি আনন্দ ও করুণাপূর্ণ প্রসন্নতার হাসি। যেন ছোট্ট একটি মেয়ে। শ্রীমা আমার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কথা কইলেন ও হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। এখন তোমরাই বল যে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন না তো দেওয়ালের সঙ্গে কথা কইলেন কি?' এই ব'লে স্বামিজী মহারাজ হো হো ক'রে

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা। আপনার আশীর্বাদে আমি ভাল আছি। আমার আন্তরিক ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন এবং আশীর্বাদ করিবেন। আপনার কুশল সংবাদ লিখিয়া খুসী করিবেন। অধিক আর কি লিখিব

— ইতি আপনার
দাসানুদাস
কালী
অভেদানন্দ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী
সারদা দেবী

For Sārada Devi.
C/o Swami Saradananda
Udbodhan Office
Baghbazar P.O.

তাঁকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি সংবাদ বলুন?' ভদ্রলোক বল্লেন: 'মহারাজ আপনার আশীর্বাদে সব ভাল। আগে একদিন এসে আপনার মুখে আমেরিকার অনেক কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলুম। কি নিষ্ঠাবান ও জিজ্ঞাসুই না ওসব দেশের লোক'।

স্বামিজী মহারাজ: 'ওরা তো হবেই। সাংসারিক ভোগের সুখ ওদের একরকম চরমে উঠেছে। কাঁহাতক আর জড়ের উপাসনা নিয়ে আজীবন চলে বলুন। ঐশ্বর্য ওদের বিপুল। এখন ওরা ধর্ম চায়। জানতে চায় জড়বস্তু ছাড়া আর কোন-কিছু আছে কিনা—যা ওদেরকে পার্‌মেনেণ্ট (স্থায়ী) সুখ ও শান্তি দেবে। তাই স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন শিকাগোতে প্রথমবার (১৮৯৩ খৃঃ) গেলেন তখনই ওদেশের মানুষ এক নূতন পথের পরিচয় পেল, নিরাশার অন্ধকারে আশাময় আলোর সন্ধান পেল'।

আমরা: 'মহারাজ, শুনেছি ওরা ভারতীয় আদর্শের প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবকেও নাকি ওরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে'।

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, সত্যই তাই। কিন্তু তাই ব'লে মনে করো না যে, ইংল্যাণ্ড আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের সমস্ত লোক একেবারে হিন্দু হ'য়ে গেছে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবকে গ্রহণ করেছে। তবে ওদেশের অনেকেই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের উদার সার্বভৌমিক ভাবের ওপর যে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছে একথা ঠিক'।

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারার ওপর পাশ্চাত্য-বাসীরা যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাই আমরা

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের পাশ্চাত্যে প্রচারকার্যের জয়যাত্রা দেখে। পরিপূর্ণ বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসক ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অগণিত নরনারী প্রাচ্যের মহিমময় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল ও এখনও ভারতীয় অধ্যাত্ম সম্পদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবমুখে বলেছিলেনঃ 'সাগরপারে আমার আরো কত ভক্ত-সন্তান আছে'। সেই ভক্ত-সন্তানদের অবিষ্কার করার জন্যই তো দিব্যনির্দেশ পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মিলনের আয়োজনের পিছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই আশীর্বাদ। পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ পদার্পণ সৃষ্টি করলো এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর পরিবেশ। কলম্বস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার রক্তমাংসের দেহ, শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ আবিষ্কার করলেন আমেরিকার প্রাণ ও আমেরিকাবাসীর মর্মকথার পেলেন প্রত্যক্ষ পরিচয়। সার্থক হ'ল তাঁর বিজয় অভিযান, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়গাথা হ'ল সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত, সীমায়িত দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্যের নরনারী পেলো প্রাচ্যের প্রসারতা ও শান্তিময় আলোক, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রতি জানালো তারা পরমশ্রদ্ধার প্রণতি। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি প্রাচ্য-আদর্শবাহীদের পদার্পণকেও জানালো তারা অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন।

আমেরিকায় থাকতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যদীক্ষাও দিয়েছিলেন অনেককে। তাঁর দিনপঞ্জী (Diary) থেকেই তার নিদর্শন মেলে সুস্পষ্ট।

ইংরেজী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২রা এপ্রিল, রবিবার। সে'দিন ছিল ইষ্টারের উৎসব। স্বামিজী মহারাজ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, ব্রহ্মচর্যের হোমাগ্নি হ'ল প্রজ্জ্বলিত, আটজন মার্কিণ নরনারী প্রাচ্যের সন্ন্যাসধর্মের মহিমোজ্জ্বল আদর্শের প্রতি জানালেন প্রণতি। হোমাগ্নির চারিদিকে তাঁরা উপবেশন করলেন পবিত্র মন নিয়ে, ত্যাগদীপ্ত পবিত্র জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা-বাক্য হ'ল উচ্চারিত, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁদের ব্রহ্মচর্যমন্ত্রে করলেন অভিষিক্ত। তিনি গৌরিকবস্ত্র দিলেন সকলের হাতে, নূতনভাবে তাঁদের নামকরণ ক'রে বল্লেনঃ 'আজ থেকে তোমাদের নবজন্মের হ'ল সূচনা, আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধীতায় উৎসর্গীকৃত তোমাদের জীবন, তোমরা নিবেদিত হ'লে আজ থেকে শ্রীভগবানের চরণে'।

যে ক'জন ভাগ্যবান মার্কিনবাসী সেদিন ব্রহ্মচর্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হ'ল ঃ

	পূর্বনাম		ব্রহ্মচর্যের হিন্দুনাম
১।	Mrs. Coulston	...	সেবাপূত
২।	Miss. Mulford	...	মুক্তিকাম
৩।	Miss. Lindquist	...	সত্যকাম
৪।	Dr. Kate Stanton	...	শান্তিকাম
৫।	Miss. Kohlsaat	...	প্রেমকাম
৬।	Mr. Heyblom	...	গুরুদাস

মিস ম্যাকলিয়ডও (Miss McLeod) সে'দিন সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁর শিষ্য মিষ্টার হেয়োম সম্বন্ধে রোজনামচায় (Diary) লিখেছেন: 'Whom I gave Sannyasa in 1921, at the Belur Math, and gave the name of Swami Atulananda'; অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারী গুরুদাসকে আমি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করি ও নামকরণ করি স্বামী অতুলানন্দ)।

স্বামী অতুলানন্দ সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ তাঁর রোজনামচায় (Diary) আরো লিখেছেন: 'Among these, Gurudas (now Swami Atulananda) is still living as a true Sannyasin, at Ramakrishna Kutir, Almora, India. He is my most loving and faithful American Sannyasin disciple' (শিষ্যদের মধ্যে গুরুদাস [স্বামী অতুলানন্দ] এখনও আলমোড়া রামকৃষ্ণকুটিরে যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করছেন।' আমেরিকাবাসী শিষ্যদের মধ্যে তিনিই আমার অন্যতম প্রিয় ও বিশ্বাসী শিষ্য)।

স্বামী অতুলানন্দ তাঁর *With the Swamiji's in America* গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে এই অধ্যাত্মদীক্ষার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর দেওয়া দীক্ষার তারিখ সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ আছে। স্বামী অতুলানন্দ লিখেছেন:

'* * on the first day of April, in the year 1899, we

১। স্বামী অতুলানন্দ কিছুদিন আগে ইহধাম ত্যাগ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন।

were initiated. It was Eastern Sunday, the great Christian festival. * * A few friends, Brahmachari of Swami Vivekananda, were invited to witness the cerémony. * * Then one by one we were asked to approach the sacred fire and to repeat the words after the Swami. * * This part of the ceremony over, the Swami touched our foreheads with sacred ashes. We received a piece of *gerua* (ochre) cloth, and then with the sprinkling of holy water the Swami gave us over spiritual names: Muktikama, Shantikama, Satyakama and Gurudas' (pp. 23—25).

অর্থাৎ '১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা (?) এপ্রিল মাসে আমরা ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেছিলাম। সেদিন ছিল ইষ্টারের রবিবার —খৃষ্টানদের বিশেষ একটি পর্বদিন। স্বামী বিবেকানন্দের দু'চারজন ব্রহ্মচারী বন্ধুও (শিষ্য) আমাদের সেই ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিলেন। * * তারপর একে একে যজ্ঞকুণ্ডের কাছে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং স্বামিজীর (স্বামী অভেদানন্দ) সামনে প্রতিজ্ঞা করলাম। * * এসব ব্যাপার শেষ হ'লে স্বামিজী আমাদের সকলের কপালে যজ্ঞের ভস্ম মাখিয়ে দিয়ে এক একখানা গেরুয়া কাপড় দিলেন ও মন্ত্রপূত জল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে এক একজনের নাম দিলেন: মুক্তিকাম, শান্তিকাম, সত্যকাম ও গুরুদাস'।

ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আরো কয়েকজন ভাগ্যবতী মার্কিণ মহিলা স্বামিজী মহারাজের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম:

১। ইং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মে বুধবার মিস সিনেট (Miss. Sinnette) ব্রত নিয়ে পরিচিতা হন 'সরযু' নামে।

২। " " ৩০শে মে বৃহস্পতিবার মিস নবলো (Miss. Nablo) নাম গ্রহণ করেন 'গঙ্গা'।

৩। " " ৪ঠা জুন মঙ্গলবার মিস বার (Miss. Barr) নাম গ্রহণ করেন 'বরদা'।

৪। " " ৭ই জুন শুক্রবার মিসেস 'সি' নাম নেন 'কিরণবালা'।

৫। " " ১৪ই জুন শুক্রবার মিস (Miss. Everett)-এর নাম হয় 'সুমতি'।

৬। " " ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার মিসেস পেগুইনো (Miss. Peguino) নাম গ্রহণ করেন 'পূর্ণা'।

৭। " " ১৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার এ. ওয়াল্ডো (Miss. A. Waldo)।

ক্যালিফোর্নিয়ার লি-পেজ (LePage)-দম্পতিও যথাক্রমে 'হরিদাস' ও 'শিবানী' নামে পরিচিত হন। তা'ছাড়া ভগিনী ভবানীও স্বামিজী মহারাজের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ ক'রে আজীবন ব্রহ্মচারিণী-রূপে অধ্যাত্ম সাধনায় রত ছিলেন।

* * *

এ' গেল ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ইংরেজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মে বুধবার

আমেরিকা থেকে তিনি ভারতাভিমুখে রওনা হ'ন সকাল ন'টায়। 'হোয়াইট ষ্টার লাইন পায়াস' (*White Star-Line Piers*) দিয়ে ম্যাজিষ্টিক ষ্টিমারে তিনি এসে পৌছুলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে 'পেনিনসুলার এ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল ষ্টিমার এস. এম. সুলতান' জাহাজে কলম্বোয় উপস্থিত হলেন ১৬ই জুন রবিবার বেলা দেড়টার সময়। মাননীয় নারায়ণ-স্বামী, ডাঃ বেঙ্কটরঙ্গম-প্রমুখ কলম্বোর বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন কলম্বো-বন্দরে। মাননীয় ত্যাগরাজের পৌরহিত্যে সেখানে বিরাট এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হয়। স্বামিজী মহারাজ সেই সভায় পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যের বিজয়-কাহিনীর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু বল্লেন। অনাগারিক ধর্মপালও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সিংহলের বিভিন্ন রাজপথ ও বিশিষ্ট স্থান-গুলিকে পুষ্পমাল্যে ও নারিকেল পাতায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল। স্বামিজী মহারাজ সিংহল থেকে ক্রমে জাফনা, অনুরাধাপুরম, তিউনিকোরিন, তিন্নেভেলি, তেনকাসি, মহুরা, ত্রিচিনপল্লি, শ্রীরঙ্গম্, পাতুকোটা, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনম, কুড্ডালোর, মাদ্রাজ, ময়লাপুর, ত্রিপলিকেন, বানিয়াম্বাড়ি, ধর্মপুরি, বাঙ্গালোর, উলসুর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে যান। সর্বত্রই শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান ক'রে নগরবাসিগণ স্বামী অভেদানন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হন তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর। বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে তাঁকে হাওড়া-পুলের ওপর দিয়ে জষ্টীস সারদাচরণ মিত্রের আর্য ইনষ্টিটিউসনে আনা হয় ও সেখানেই অভিনন্দন-সভার আয়োজন করে তাকে মানপত্র দেওয়া হয়। কলেজের ছাত্ররা তাঁর গাড়ী

টেনে তাঁদের বিজয়ী অতিথির প্রতি সম্মান জানালো। কিছুদিন বেলগাছিয়ায় মাননীয় পশুপতি বসুর বাগান-বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা টাউন হলে একটি বিরাট নাগরিক অভ্যর্থনাও তাঁকে দেওয়া হ'ল। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল ও বিশেষ ক'রে চিন্তাশীল যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে তাঁর বক্তৃতা এক প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। হাওড়া টাউন হলে, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে তাঁকে অভিনন্দন-দানের আয়োজনও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

৫ই অক্টোবর (১৯০৬ খ্রীঃ) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বাঁকিপুর যাত্রা করেন। বাঁকিপুর টাউন-হলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। বাঁকিপুর থেকে পাটনায় ও পাটনা থেকে বেনারসে উপস্থিত হন। বেনারস সেণ্টাল হিন্দু কলেজে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। মাননীয় জি. এস. আরুণ্ডেল সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বেনারস থেকে এলাহাবাদ, আগ্রা, আলোয়ার, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান তিনি ভ্রমণ করেন। সর্বত্রই বিরাট জনতার উল্লাস ও শুভেচ্ছা তাঁর হৃদয়কে উদ্বেল করেছিল।

১লা নভেম্বর তিনি বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন। বিপুল জনতার জয়োল্লাস ও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হ'ল। বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে ওয়ার্ডেন রোডে শান্তিভবনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ফারমজি ইনিষ্টিটিউট হলে বোম্বাই সহরের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র ও অভিনন্দন দেওয়া হয়। তারপর তিনি ইলোরা, কার্লে প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

১০ই নভেম্বর (ইং ১৯০৬) শনিবার ভারতভূমি ও ভারতের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি 'পি. এ্যাণ্ড. ও, এস্. এস. মার্‌মোরা' জাহাজে আবার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। 'তিনি স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিলেন আমেরিকায় তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য। ১৮ই নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ চারটার সময় তিনি সুয়েজ-ক্যানেল ও ১৯শে নভেম্বর পোর্ট-সৈয়দ অতিক্রম করেন। মেসিনাপ্রণালী (Messina Strait) পার হবার সময় তিনি এটনার আগ্নেয়গিরি দর্শন করেন। বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরিও তিনি ইতিপূর্বে দেখে-ছিলেন ও পরবর্তীকালে তার সম্বন্ধে কৌতুহলোদ্দীপক গল্পও করেছিলেন আমাদের কাছে অনেকবার। বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন : 'যেন জীবন্ত রাক্ষসের মতো চব্বিশ ঘণ্টাই তার মুখ দিয়ে একটু-না-একটু আগুন বার হচ্ছে। আমি পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তার মুখে একটা পোষ্টকার্ড ধরা মাত্র তার খানিকটা তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠেছিল'। স্বামিজী মহারাজের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সেই পোড়া পোষ্টকার্ডটা এখনও সযত্নে রাখা আছে।

তারপর বনিফেসিড-প্রণালী (Banifacid Strait) পার হ'য়ে ২৪শে নভেম্বর শনিবার তিনি মার্শেলিস-বন্দরে উপস্থিত হন। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। তারপর ২৬শে নভেম্বর জিব্রাল্টার, ২৭শে কোষ্ট-অব-পর্টুগাল ও ২৮শে বিস্কে-উপসাগর পার হ'য়ে তিনি ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্লাইমাউথে উপস্থিত হন। বেলা তখন বারোটা। লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছুলেন ১লা ডিসেম্বর শনিবার।

॥ স্মৃতিঃ পণেরো ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের শেষ তিন চা'র বছর আমাদের কাছে এক স্বর্ণময় স্মৃতি রূপে জাগ্রত। ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কথা, স্বামিজী মহারাজ তখন দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। খবর এলো তিনি কলকাতার মঠে আসছেন। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) রওহনা হলেন দার্জিলিঙ থেকে কলকাতার দিকে। দার্জিলিঙ আশ্রমকে দেবোত্তর করার কাজ শেষ হয়েছে তার আগেই। তাঁরই দীক্ষিত কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যকে ট্রাষ্টী ক'রে আশ্রম উৎসর্গ করেছিলেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নামে।[১] সে'দিনের কথাই এখানে এবার কিছু বলব।

ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর (২৬শে ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪৩ সাল)। ঐদিন দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের ট্রাষ্টডিড্ রেজেষ্টারী করার জন্য স্বামিজী মহারাজ কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা দিল সে'দিন এক দৈব-দুর্বিপাক। রাত্র থেকেই আরম্ভ হ'ল বৃষ্টির অবিরল ঝরঝর ধারা। তার পরের দিনও বৃষ্টির বিরাম নেই। গাছপালা রাস্তা-ঘাট পাহাড়-পর্বত সমস্তই অন্ধকারে ছেয়ে গেল। বরফসিক্ত দম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল চারদিকে এলোমেলো

১। The said messuage lands, hereditaments and premises hereby granted shall be known as the 'Debutter property of Thakur Bhagawan Sree Sree Ramakrishna Paramahansa Dev * *.

ভাবে। ঘরের বার হওয়া ছিল দুষ্কর। অকস্মাৎ বৃষ্টির ঘনঘটার জন্য স্বামিজী মহারাজ কিছুটা চিন্তিত হলেন। তিনি তাঁর অফিস-ঘরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন ও তাঁর সেবককে বল্লেন একজন ব্রহ্মচারীকে ডাকতে। ব্রহ্মচারিজী[২] এলে স্বামিজী মহারাজ তাঁকে বল্লেন: 'দেখলে তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কি খেলা! কিন্তু ডিড্ রেজেষ্টারী আজ করতেই হবে। তুমি শচীনবাবুকে[৩] গিয়ে বলো আমার কথা, তিনি ডিডের একজন সাক্ষী হবেন'। বৃষ্টির মধ্যেই রওহনা হলেন ব্রহ্মচারিজী স্বামিজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য ক'রে। কিন্তু শচীনবাবু ছিলেন অসুস্থ, তাই তাঁর অপারগতার কথা তিনি ফিরে এসে জানালেন স্বামিজী মহারাজকে। স্বামিজী মহারাজের শরীরও সে'দিন ছিল সামান্য অসুস্থ। ব্রহ্মচারিজী তাই বল্লেন ডিড্-রেজেষ্টারী করার কাজ স্থগিত রাখার জন্য। রেজেষ্ট্রী-অফিসও ছিল আশ্রম থেকে অনেকটা দূরে। দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ঘরের বার হওয়া ছিল কষ্টকর। স্বামিজী মহারাজের সংকল্প কিন্তু অচল অটল। প্রসন্ন-গম্ভীর মুখে ধীরকণ্ঠে তিনি বল্লেন: 'তাও কি কখনো হয়? তুমিই হবে ডিডের সাক্ষী। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে চলো প্রস্তুত হই। রিক্সা একটা ডাকো এখুনি'।

আকাশ ভেঙে যেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেদিন। চারদিকে ছুটে চলেছে জলের খরস্রোত। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে অসংখ্য ছোট বড় ঝরণা, উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়েছে তাদের কলকল শব্দে। জলস্রোতে ভেসে চলেছে চতুর্দিকের

২। ব্রহ্মচারী উমানন্দ (বর্তমানে স্বামী ভবেশানন্দ)।

৩। তদানীন্তন আশ্রমের সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল।

পথ। কিন্তু স্বামিজী মহারাজকে দেখাচ্ছিল বেশ প্রফুল্ল, নিরুৎসাহ বা নিরাশার চিহ্ন এতটুকুও ছিল না তাঁর মুখে। কফি খাওয়া শেষ ক'রে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন নিশ্চিন্ত মনে। ইত্যবসরে ব্রহ্মচারিজী খবর দিলেন 'রিক্সা এসেছে, আসুন তাহলে মহারাজ'। স্বামিজী মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন : 'তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই হোক পূর্ণ'।

রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করছিল আশ্রমের নীচে ডিস্পেন্সারীর কাছে। দার্জিলিঙের রিক্সাওয়ালারা বেশীর ভাগ ভুটিয়া। তিনজন ক'রে লোক থাকে এক একটা রিক্সার সঙ্গে : রিক্সার সামনের দিকে একজন, আর পেছনের দিক থেকে রিক্সাখানাকে ঠেলে চলে দু'জন। সুদৃঢ় সুপুষ্ট তাদের শরীর, নির্ভীক প্রফুল্ল তাদের মন। আশ্রমের নীচের ডিস্‌পেন্সারিটা তখনো ছিল একতালা কাঠের ঘর। নীচে রাস্তার একদিক গেছে ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের (Victoria Falls) পাশ দিয়ে বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর দিকে, আর অপরদিক গেছে একেবেঁকে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ও স্যানিটোরিয়মের পাশ দিয়ে বাজারের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে স্বামিজী মহারাজ নিলেন টাইপ করা ডিডখানি। পোষাকের ওপর চাপা দিলেন একটা রেণকোট (rain-coat) ও মাথায় পরলেন গেরুয়া পাগ্‌ড়ি। তিনি নীচেকার রাস্তা দিয়ে মন্দিরের দিকে নামতে লাগলেন। পিছল হয়েছিল সারাটা উৎরাইয়ের পথ, অবিশ্রান্ত ধারায় জলস্রোতও ছুটে চলেছে পথের আশপাশ দিয়ে। বিদ্যুতের রেখা আঁকাবাঁকা-ভাবে জ্ব'লে উঠছে আকাশের বুকে কালো মেঘের গায়ে। লাঠিহাতে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন স্বামিজী মহারাজ। পেছনে মাথায় ছাতি ধ'রে চলেছেন ব্রহ্মচারিজী। হাসিমাখা

প্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে নেমে স্বামিজী মহারাজ গেলেন প্রথমে মন্দিরের ভেতর। করজোড়ে অর্ধনিমিলিত নেত্রে দাঁড়ালেন গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে। অপূর্ব এক ভাবে আলোকোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো মুক্তার মতো টলটলে একবিন্দু জল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্যাণ-ইঙ্গিত যেন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। দু'হাত তুলে আবার প্রণাম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে এলেন বাইরে। নীচে গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রিক্সা। স্বামিজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিজী ধীরে ধীরে বসলেন তাতে উঠে। প্রবল বারিপাতের দিকে কারুরই ছিল না এতটুকু দৃষ্টি। রিক্সা হাজির হ'ল ক্রমে রেজেষ্টারী-আফিসের সামনে। বৃষ্টির বেগ তখন কিছুটা গেছে কমে, বাতাসের গতিও হয়েছে মন্থর, আকাশের অন্ধকার সূর্যের অস্পষ্ট আলোকে হয়েছে কিছুটা দীপ্ত।

রেজেষ্টারী করতে খরচ হয়েছিল মোট ১০৫৲ টাকা। কিন্তু ব্রহ্মচারিজীর কাছে ছিল মাত্র ১০০৲ টাকা। স্বামিজী মহারাজ বার করলেন তাঁর মনিব্যাগটি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ৫৲ টাকামাত্রই ছিল তাঁর মনিব্যাগে। ঈষৎ হেসে তিনি ৫৲ টাকা দিলেন ব্রহ্মচারিজীর হাতে।[১] প্রায়

১। স্বামিজী মহারাজের ডায়েরীতে লেখা ছিল: 'Pouring in torrents day and night. I went in a Rikshaw to the Kanchari, and had the Trust-Deed of the Ashrama registered before the court of B. C. Sen, at 11 A.M. It cost Rs. 105/-. Had dry food at noon. Gave a feast to the inmates of the Ashrama in eve, with লুচি, আলুর দম and সুজির পায়স। Paid for fees Rs 5/-.'

সম্পন্ন হ'ল রেজেষ্টারী করার কাজ। স্বামিজী মহারাজ দস্তখৎ করলেন ডিডের উৎসর্গ-শিরোনামায়। অশ্রুসিক্ত তাঁর চোখ, কণ্টকিত ও পুলকিত তাঁর সর্বশরীর। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ন্যস্ত হ'ল সে'দিন থেকে আশ্রমের সকল-কিছু ভার—সকল-কিছু দায়িত্ব। তাঁর অনেক দিনের বাঞ্ছিত আশা হ'ল সে'দিন পরিপূর্ণ। সাক্ষ্যরকারীদের শিরোনামায় ব্রহ্মচারিজী (ব্রহ্মচারী উমানন্দ) করলেন নিজের নাম দস্তখৎ। সাব্‌জজ ও রেজিষ্ট্রার ছিলেন মাননীয় বি. সি. সেন। তুলারাম প্রধান ও রায়সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (উকিল) ছিলেন স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম। সম্পূর্ণ হ'ল রেজেষ্টারী করার কাজ। স্বামিজী মহারাজ প্রফুল্ল মনে এসে দাঁড়ালেন রেজেষ্টারী-অফিসের বাইরে।

প্রকৃতির দুর্যোগ-চিহ্ন তখন আর বিন্দুমাত্র নেই। সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে ফুটে উঠেছে ধরণীর হাসি। গাছের পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল জমে যেন মুক্তার জাল বুনেছে, তাতে চিক্‌চিক্‌ করছে সূর্যের আলোক। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রকৃতি নূতন প্রাণ পেয়ে হয়েছে সজাগ। স্বামিজী মহারাজ ব্রহ্মচারিজীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন: 'দেখেছ ক্যামন রোদ উঠেছে?' ব্রহ্মচারিজীও সায় দেন, কিন্তু ঠিক মর্মোপলব্ধি করতে পারলেন না তিনি স্বামিজী মহারাজের কথার। পরে স্বামিজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'আমার ওপর দিয়ে হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের এও একটা পরীক্ষা। তাঁর কল্যাণময়ী ইচ্ছাই হ'ল পূর্ণ। ব্রহ্মচারিজী জিজ্ঞাসা করলেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও আপনাদের পরীক্ষা করেন নাকি?' স্বামিজী মহারাজ একটু গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'করেন বৈকি'!

ব্রহ্মচারিজী একটি রিক্সা ডাকলেন আশ্রমে ফেরার জন্য। স্বামিজী মহারাজ ও তিনি রিক্সা ক'রে ফিরে এলেন আশ্রমে। ক্রমে রিক্সাখানি এসে থামলো ডিস্‌পেন্সারীর কাছে। বেলা তখন বারটা। রিক্সা থেকে নেমে স্বামিজী মহারাজ চল্লেন মন্দিরের দিকে ও গিয়ে দাঁড়ালেন মন্দিরের ফটকের সামনে। আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্নগম্ভীর মূর্তি। জোড়হাতে প্রণাম করলেন তাঁর বিশ্ববরেণ্য আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এলেন ওপরে নিজের ঘরের দিকে।

একটি কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই প্রসঙ্গে। সেটি হ'ল আমাদের স্মৃতির সম্বল—আমাদের চিরদিনের আশ্বাস ও সান্ত্বনার সামগ্রী। দার্জিলিঙ আশ্রমের দেবোত্তর-ডিড রেজেষ্টারী করার কাজ সমাপ্ত হ'ল যে'দিন, ঠিক তার দু'দিন পরে পেলাম আমরা স্বামিজী মহারাজের একখানি পত্র (enevelop) ও সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকার একটি মনিঅর্ডার। পত্রখানি পেয়ে হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করা দুষ্কর হয়েছিল। সে হ'ল আজ প্রায় ২৩ বছর আগেকার কথা, কিন্তু স্মৃতির দর্পণে দীপ্ত হ'য়ে আছে এখনো সেই ঘটনা! কত আনন্দ ও কত আবেগ নিয়ে পড়েছি ও বারবার পড়ে শুনিয়েছি সেই পত্রখানি সকলকে। কি এক অনির্বচনীয় ভাবের ব্যঞ্জনা পেয়েছিলাম তখন হৃদয়ে তা' এখনো স্পষ্ট মনে আছে। পত্রখানির মর্ম হ'ল ঃ

'স্নেহের—

'এতদিনে আমার জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ করলেন করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর। আজ থেকে সকল-কিছুই হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের। তিনিই হলেন দার্জিলিঙ আশ্রমের মালিক, আর আমরা তাঁর আজ্ঞাবাহ দাস। তিনিই চালক, আমরা তাঁর ভৃত্য।

তাঁর হাতে সব সঁপে দিয়ে আজ ঠিকঠিক আমি ফকির হ'তে পেরেছি। তাঁর কাজ তিনিই এখন থেকে দেখবেন, আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। বাকি রইলো কলিকাতার কাজ। তারপরই ছুটি। তোমরা কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজো দিয়ে আনন্দ ক'রে সকলে প্রসাদ পাবে। ২৫৲ (পঁচিশ টাকা) পাঠালাম মনিঅর্ডার ক'রে। প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়ে সুখী করবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ'

পত্রখানিতে তারিখ ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬), অর্থাৎ যে'দিন দেবোত্তর-ডিড্ রেজেষ্টারী করা হয় সেদিন রাত্রেই তিনি লিখেছিলেন পত্রখানি দার্জিলিঙ আশ্রম থেকে। আমরা তখন কলকাতার আশ্রমে, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে। পত্র ও মনিঅর্ডার একসঙ্গেই পেলাম ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১০টার সময়। পরের দিনই (১৫ই সেপ্টেম্বর) আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরে বিশেষপূজা ও ভোগ দিলাম এবং পূজার শেষে প্রসাদ পেলাম আনন্দাপ্লুত হৃদয় নিয়ে।

॥ স্মৃতি : ষোলো ॥

ইংরেজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর মাসে স্বামিজী মহারাজ (৺স্বামী অভেদানন্দ) তিব্বত থেকে ফিরে আসেন বেলুড় মঠে। সে'দিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ-জননী শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি-উৎসব। অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়েছিল বেলুড় মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। আনন্দানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল যথেষ্ট। ইংরেজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ থেকে তিনি কলকাতায় আসেন কর্মকোলাহলময় মহানগরীতে তাঁর নূতন কর্মপীঠ ও প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঐ সময়ে মেছুয়াবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে তিনি ওঠেন ও 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' (*Ramakrishna Vedanta Society*) প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্তের উদারনৈতিক ভিত্তির ওপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ প্রচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনে অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান-সম্মতযুক্তি ও বিচারপ্রণালীকেই তিনি অন্তরের সংগে চিরদিন ভালবাসতেন, আর যে'কোন গতানুগতিক সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও সংকীর্ণ মনোভাবকে তিনি মন প্রাণ দিয়ে অবজ্ঞা করতেন। অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ যুক্তি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে একনিষ্ঠা ও একান্ত অনুরাগ, দ্বৈতবাদে প্রপত্তি বা শরণাগতি, শাক্তাদ্বৈতবাদের শক্তিতে চিন্ময়ীদৃষ্টি তাঁর প্রশস্ত ও উদার মনকে আকর্ষণ করেছিল। তাই শাঙ্কর-বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে তিনি চরমসত্য ব'লে গ্রহণ করলেও বেদান্তের সকল মতকে এক পরমসত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ ব'লে তিনি সমাদর করতেন, আর এখানেই তাঁর ও শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের অপরূপ বৈশিষ্ট্য। কিছু-না-কিছু

সত্য সকল মতবাদেই আছে এ'কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। যে যেমনভাবে পরমসত্যকে দেখেছে ও উপলব্ধি করেছে সে তেমনি ভাবেই তার পরিচয় দিয়েছে, বলার ভঙ্গী ও বর্ণনাতে কেবল পার্থক্য, চলার পথেই শুধু ভিন্নতা, কিন্তু লক্ষ্য সকলের এক ও সমান—এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বেদান্তের মতবাদকে তাই গ্রহণ করেছিলেন পরমশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে। তাঁর সোসাইটী বা সমিতি, আশ্রম ও মঠের পিছনে তাই বেদান্তের নামকে তিনি যুক্ত করেছিলেন যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি দিয়ে। অচলায়তনের তিনি পূজারী ছিলেন না, যুক্তিসঙ্গত বা বিচারনিষ্ঠ যা' সেটাই ছিল তাঁর ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্ম-প্রচারের অবলম্বন ও আদর্শ। তাঁর 'বেদান্ত মঠ', 'বেদান্ত আশ্রম' ও 'বেদান্ত সোসাইটী'-র পিছনে এই মহান সত্যই আজো দেদীপ্যমান।

স্বামিজী মহারাজের বরাবরই ইচ্ছা ছিল কলকাতায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই মঠের সংলগ্ন থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মন্দির। সেজন্য তিনি উত্তর-কলকাতায় একটি জমিও কিনলেন। তিনি বলতেনঃ 'বিশেষ ক'রে উত্তর-কলকাতাতেই হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাভূমি, কেননা সিমলা, শ্যামপুকুর, বাগবাজার এ'সব জায়গায় তাঁর যাতায়াত ছিল বেশী। তাঁর পবিত্র পদধূলিতে উত্তর কলকাতার পথ-ঘাট পবিত্র হ'য়ে আছে'।

দেখা যায়, কলকাতায় একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করাই ছিল যেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ কামনা। এ'সম্বন্ধে চিঠিপত্রও তিনি লিখেছিলেন অনেকবার অনেককে মন্দির-প্রতিষ্ঠার আগে। ১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের জায়গা (জমি)

শোভাবাজারের কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে ১৮,৫০০৲ টাকায় ক্রয় করা হয়। জমি খরিদ করা হ'ল প্রথমে তখনকার বেদান্ত সোসাইটীর সম্পাদক স্বর্গীয় ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে। পরে স্বামী অভেদানন্দের নামে ঐ জায়গার সত্ব হস্তান্তরিত করা হয়। স্বামিজী মহারাজ সোসাইটীর জায়গা আবার ইংরেজী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী (৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৫) মঙ্গলবার দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গ করেন। ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।[১] রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী-র সকল সম্পত্তি মঠের নামে তখন অর্পিত হ'ল, কিন্তু তার অস্তিত্বকে বজায় রাখলেন তিনি মঠেরই অবিচ্ছেদ্য কর্মকেন্দ্র-রূপে। প্রচার, জনহিতকর ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সোসাইটীর শরীর থাকলো অক্ষত মঠের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হ'য়ে। তাহলেও মঠের কর্ম-প্রসারতার পথকে তিনি বিন্দুমাত্র খর্ব ও সংকীর্ণ করলেন না। মঠের পক্ষে স্বাধীনভাবে ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণকর সকল-কিছু কাজ করার ক্ষমতাকে তিনি অব্যাহত রাখলেন।[২] মঠ ও

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ট্রাষ্ট-ডিডে আছে : 'That the said Devatra or Debutter Estate shall be designated, called and known as 'The Ramakrishna Vedanta Math'.

২। ট্রাষ্ট-ডিডে উল্লিখিত আছে : "(e) To supplement what is wanting in the present system of general education particularly by imparting spiritual, ethical, cultural, vocational, artistic and physical training.

* * * *

"(g) To carry on educational work amongst the people in general and specially amongst the masses.

সোসাইটী যেন একই মায়ের দু'টি সন্তান পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মিলন-মৈত্রী ভাবের বিনিময় দিয়ে বিস্তৃতির পথে এগিয়ে যাবার অধিকার পেল। তবে অধ্যাত্ম ভাবধারা ও ধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র-রূপে মনোনীত থাকলো একমাত্র মঠই। কর্মের সকল রকম দায়িত্বশীল অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অধ্যাত্ম প্রেরণা ও বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের একমাত্র তীর্থপীঠ রইল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।*

"(h) To work for the removal of untouchability and other social prejudices and to cultivate brotherly feelings amongst all.

"(i) To help the sick, the needy and the distressed.

"(j) To impart, promote and cultivate the study of comparative philosophy, history, literature, arts, science, industries, agriculture, and other subjects like health, hygiene, social service and the like'.

"(k) To establish, organise, maintain, carry on, amalgamate and assist Colleges, Schools, Libraries, Free Reading Rooms, Classes, Lectures, Laboratories, Workshops, Orphanages, Homes for men and women and students, Hospitals, Dispensaries, Public Health, Institutions, Homes for the aged, the infirm, the invalid and the afflicted, Relief Works, and other Educational, Charitable, Philanthropic, Religious and Industrial activities, and Institutions of like nature".

৩। মঠের 'ট্রাষ্ট-ডিড্' (Trust-Deed) থেকে মঠের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মপ্রণালীর নির্দেশগুলি উল্লিখিত আছে :

"(c) To impart, promote and spread the study of all the phases of Vedanta philosophy, and its principles and rituals as propounded by Thakur Bhagawan Sree

১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মঠের (গোড়ায় সোসাইটীর) জমি কেনার অনেক পরে ইংরেজী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই, মার্চ স্বামিজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে'দিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ-জন্মোৎসব। তার ঠিক ছু'বছর পরে ইংরেজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই, মার্চ নূতন মন্দির হ'ল নির্মিত। মন্দির-প্রতিষ্ঠার স্মরণীয় দিনের কথা আমরা জীবনে ভুলতে পারব না, সেই পুণ্যঘন স্বর্ণস্মৃতি এখনো আমাদের চোখে প্রোজ্জ্বল।

ইংরেজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুণ ১৩৪৩) স্বামিজী মহারাজের অন্তরের আকুতি হবে পূর্ণ। সে'দিন রবিবার, সুতরাং সমস্ত আফিসের ছুটি ছিল। অজস্র লোকের সমাগম হ'তে লাগলো সকাল বেলা থেকেই। স্বামিজী মহারাজের মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল ও আনন্দসমুজ্জ্বল, আশার উচ্ছ্বাস যেন সে'দিন তাঁর অন্তরে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। মন্দির-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে পূজার আয়োজন চলেছে। পূজক ও তন্ত্রধারক আমাদের মঠের সন্ন্যাসীদের ভেতর থেকেই

Sree Rımakrishna Dev and particularly illustrated by His own Life

"(f) To spread the idea of that universal religion which underlies the various sects and creeds ·····in their spiritual, moral, intellectual, cultural and physical needs.

* * * *

"(o) To provide for the imparting of spiritual training to disciples, Brahmacharis, Sannyasis and others".—প্রভৃতি।

স্বামিজী মহারাজ নির্বাচন করেছেন। কিন্তু হঠাৎ তার আগের দিন রাত্রে পূজকের হ'ল ১০৫° জ্বর ও সে জ্বর থাকলো পরের দিন পর্যন্ত। স্বামিজী মহারাজের কাছে প্রস্তাব করা হ'ল বাইরে থেকে একজন সন্ন্যাসী পূজক আনার জন্য। কিন্তু তাঁর অভিমত মঠের যাবতীয় পূজা করবে মঠেরই সাধু ও ব্রহ্মচারীরা। সে'দিনও উত্তর দিলেন স্বামিজী মহারাজ ঠিক একই রকমের। বল্লেনঃ 'পূজা যেমনতরই হোক না কেন, তোমরা নিজেরাই করবে পূজা। সুতরাং পূর্বনির্দিষ্ট নির্বাচনের পরিবর্তন ক'রে ঠিক হ'ল যে পূজক যিনি ছিলেন তিনি হবেন তন্ত্রধারক, আর তন্ত্রধারক হবেন পূজক। অবশ্য আগের দিন থেকে যতরাজ্যের বই ও খাতাপত্তর নিয়ে পূজক ও তন্ত্রধারকের মধ্যে পূজার মহড়া শুরু হ'য়ে গিয়্লো, কাজেই নির্বাচনরীতির অদলবদল হলেও পূজায় ত্রুটির আশঙ্কার কোনরকম কারণ ছিল না।

সকাল ৭॥০ টায় স্বামিজী মহারাজ নাটমন্দির ও মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন, আর স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন উত্তরপাড়ার জমীদার সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রটি এঁকে বেদান্ত মঠকে উপহার দিয়েছিলেন কলকাতার শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত। দ্বারোদ্ঘাটন শেষ হ'লে তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ হবে। পূজার উপকরণ, পুষ্প-মাল্যাদি রাখা হয়েছে যেখানে তা' আগে ছিল মঠের ঠাকুরঘর। ঠিক ৭॥০ টায় স্বামিজী মহারাজ নেমে এলেন দোতালা থেকে। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এসে পৌঁছলেন এরই ভিতর। মন্দিরের দ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বামিজী মহারাজ। গলায় বেলফুলের মালা ও

কপালে শ্বেতচন্দের টীকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে অসংখ্য শঙ্খ বেজে উঠল। উচ্চারিত হ'ল সহস্র মুখে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'। স্বামিজী মহারাজও মেশালেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি সেই জয়শব্দের সঙ্গে। উদ্ঘাটিত হ'ল জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের দ্বার। স্বামিজী মহারাজ ফিরে দাঁড়ালেন নাটমন্দিরের 'দকে। প্রসন্নোজ্জ্বল ও ভাবগম্ভীর তাঁর মুখ। আবার উচ্চারিত হ'ল অগণিত কণ্ঠে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'। ধূপ-ধূনার গন্ধে চারদিক ছিল আমোদিত। তারপর উদ্ঘাটিত হ'ল নাটমন্দিরের দ্বার। অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে সনৎ বাবু ও স্বামিজী মহারাজ ধীরে ধীরে নাটমন্দিরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বাবুর গলায় গন্ধরাজ ফুলের মালা ও কপালে চন্দনের টীকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। স্বামিজী মহারাজ সনৎ বাবুকে স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। সনৎ বাবু এগিয়ে গেলেন তৈলচিত্রের দিকে ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে আবরণ উন্মোচন করলেন। স্বামিজী ও সকলের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হ'ল পুলক ও শিহরণের মাঝে 'ওয়া গুরুজীকী ফতে'। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাশের দিকে ছিল দু'খানি চেয়ার সাজানো। স্বামিজী মহারাজ বসলেন একটিতে ও অপরটিতে সনৎবাবু। ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সকলে বসলো তাঁদের চারদিকে কেন্দ্র রচনা ক'রে। স্বামিজী মহারাজ শ্রদ্ধাবিজড়িত কণ্ঠে পাঠ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র। উত্তর-কলকাতার বুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার অতীত স্বপ্নের উল্লেখ ক'রে তিনি বল্লেন : 'এতদিনে আমার অন্তরের কামনা পূর্ণ হ'ল, আর বাস্তবে পরিণত হ'ল ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের সুখস্বপ্ন'। তারপর

কিভাবে আত্মসমাহিত ভাবে ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার ছবি এঁকেছিলেন সে' সম্বন্ধে কিছু বল্লেন তিনি সকলকে। ঘড়িতে তখন বেজেছে ন'টা।

বিরাট একটি শোভাযাত্রা বার হ'ল হেদুয়ায় জীবন্ত একটি মাছ জলে ছাড়ার জন্য। স্বামিজী মহারাজ সনৎ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আফিস-ঘরে। এ'দিকে পূজার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। পূজক ও তন্ত্রধারক [৪] পূজায় বসার জন্য প্রণাম ক'রে অনুমতি নেবার জন্য গেলেন স্বামিজী মহারাজের কাছে। স্বামিজী মহারাজ ছিলেন তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল ও হাসিখুসি মেজাজে। তিনি দু'জনকে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ও প্রণাম ক'রে পূজায় বসগে। অতি পবিত্র দিন আজ। বহুদিনের আশা কার্যে পরিণত হ'তে চলেছে এতদিনে। সব তাঁরই ইচ্ছা, আমরা উপলক্ষ্য কেবল'। তারপর আনন্দে গাইতে লাগলেন:

> সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
> তোমার কর্ম তুমি কর মা,
> লোকে বলে করি আমি॥
> পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
> কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
> আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
> আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥

'সবই তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা তাঁরই ইঙ্গিতে হচ্ছে। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। জয়

৪। স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'। স্বামিজী মহারাজ ভাবে আত্মহারা, যেন এ'জগতের মানুষ নন, শাশ্বত আনন্দলোকে সমাসীন। পূজক ও তন্ত্রধারক প্রণাম ক'রে অগ্রসর হ'লে স্মিতহাস্যে তাঁদের বল্লেন: 'এসো তাহলে, যখন আমার দরকার হবে তখন ডেকে পাঠিয়ো। আমি একরকম তৈরী হয়েই বসে আছি'। তারা আবার প্রণাম ক'রে নীচে এলো।

প্রবল উদ্দীপনা ও আনন্দের রোল মঠের চতুর্দিকে। মন্দিরের ভিতর নানান রকমের ফুল ও মালা দিয়ে অপূর্ব-ভাবে সাজানো হয়েছে। ধূপ-ধূনার গন্ধে চারদিক আমোদিত। অপরূপ এক দৃশ্য, পবিত্র ও অবর্ণনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ভক্তিভাববিহ্বল জনসমুদ্র মন্দিরের চারদিকে সমবেত হ'য়ে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছিল। সকলেই উন্মুখ ও অধীর—কখন্ স্বামিজী মহারাজ মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার প্রতিকৃতি বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে পূজক ও তন্ত্রধারক শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার পূর্বকৃত্য শেষ ক'রে প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক আয়োজনে ব্যস্ত। ঘড়িতে বেজেছে তখন তু'টো (2. P. M.)। ক্রমশঃ সবই প্রস্তুত। মন্দিরে আসার জন্য স্বামিজী মহারাজকে খবর দিতে গেলেন একজন সন্ন্যাসী।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঠিক একমাস আগের একটি ঘটনার কথা আশ্চর্যজনক না হ'লেও সে'কথারই এখানে উল্লেখ করব। ঘটনাটি নিবিড়ভাবে জড়িত মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের সঙ্গে। নূতন মন্দিরে নূতন সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি হবে প্রতিষ্ঠিত। স্বামিজী মহারাজ ফরমাস

করলেন একটি রূপার সিংহাসনের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বায়না দিলেন কিছু টাকা। কিন্তু ঘটনা ঘটলো একটু বিচিত্র রকমের। তার পরের দিন সকালে—প্রায় সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে, স্বামিজী মহারাজ শশব্যস্তে ডেকে পাঠালেন আমাদের তাঁর শোবার ঘরে ও বল্লেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে রূপার সিংহাসন হয়। ধাতু-নির্মিত কোন জিনিসই তিনি স্পর্শ করতে পারতেন না, খেতেনও পাথরের বাসনে, সুতরাং এখুনি নিষেধ ক'রে পাঠাও রূপার সিংহাসন যেন আর তৈরী না করে'। শুনে তো আমরা অবাক। ভাবলাম ব্যাপারটা হ'ল কি। একদিন আগে যে-মানুষ প্রবল আগ্রহ নিয়ে রূপার সিংহাসনের জন্য ফরমাস দিলেন, আজ তাঁর আবার কত আগ্রহ তা নিষেধ করার জন্য। ঘটনাটি কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রশ্নরূপেই থেকে গেছে আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মনের মধ্যে। তবে ভাবলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই বোধহয় নয় যে রূপার সিংহাসন হয় নির্মিত ও এ'রহস্যই জেনেছেন স্বামিজী মহারাজ তাঁর পরিশুদ্ধ অন্তরে দিব্যপ্রেরণার ভিতর দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা আদরের সন্তান, তাঁর মর্মকথা তাঁদের পক্ষে জানাই স্বাভাবিক।

সুতরাং আমাদেরি একজন ভক্তবন্ধু[৫] তাড়াতাড়ি দৌড়ুলেন কারিগরকে নিষেধ করার জন্য। স্বামিজী মহারাজ তাঁর ইজিচেয়ারে আনমনাভাবে তখন বসে। আমাদেরি মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'তাহ'লে উপায় কি মহারাজ?' তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন: 'উপায় আর কি, যাঁর

৫। শ্রীআশুতোষ ঘোষ

কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন'। আমরা আর কোন উত্তর না দিয়ে নেমে এলাম নীচেকার ঘরে।

বেলা তখন এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে। ভক্তবন্ধু এলেন কারিগরের বাড়ী থেকে ফিরে, বল্লেন: 'নিষেধও করেছি যেমন, উপায়ও হয়েছে তেমনি আর একটি'। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'উপায়টা কি?' ভক্তবন্ধু বল্লেন 'আমার একজন বন্ধু আছেন মাদ্রাজে, চন্দনকাঠের তৈরী নানান রকম কারুকার্য করা সিংহাসনও পাওয়া যায় মাদ্রাজে, তাঁকেই লিখে দেবো একটা চিঠি সিংহাসন পাঠিয়ে দেবার জন্য'। আমরা বল্লাম: 'জানাও একথা তাহলে স্বামিজী মহারাজকে'। স্বামিজী মহারাজ তখন অফিস-ঘর থেকে শোবার ঘরে উঠে গেছেন। আমাদের ভক্তবন্ধু গিয়ে জানালেন সেই কথা। শুনে স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'চমৎকার কথা। এখুনি অর্ডার দাও তা'হলে তোমার মাদ্রাজী বন্ধুর[৬] কাছে। ঠিক কথাই বলেছ, চন্দনকাঠের সিংহাসনই হবে উত্তম'। বন্ধু কালবিলম্ব না ক'রে তখুনি লিখে পাঠালেন তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুকে, রেজিষ্টার্ড চিঠি একখানি পাঠিয়ে দিলেন ডাকে।

চিঠির উত্তর এলো সাত আট দিন পরে। মাদ্রাজী বন্ধু লিখেছেন আনন্দের সঙ্গে সিংহাসনের অর্ডার তিনি দিয়েছেন কারিগরকে, তৈরি হলেই পাঠাবেন রেলওয়ে পার্শ্বেল ক'রে। কিন্তু ঘটনার একটু বিপর্যয় হ'ল নানান কারণে। মাদ্রাজ থেকে চন্দনকাঠের সিংহাসন আসতে হ'ল একটু বিলম্ব।

৬। এই বন্ধুটি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত একজন প্রবীন ভক্ত, নাম পি. এস. আদিমূলম্।

এদিকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনও সমাগত। স্বামিজী মহারাজ বেশ একটু চিন্তিত হলেন ও সাময়িকভাবে অর্ডার দিলেন সেগুনকাঠের একটি সিংহাসন। সুতরাং ১০ই মার্চ (১৯৩৭ খ্রীঃ) বা ৩০শে ফাল্গুণ (১৩৪৩ সাল) সেই সেগুনকাঠের সিংহাসনেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি হ'ল প্রতিষ্ঠিত।

লতাপাতার কাজ-করা চন্দনকাঠের সিংহাসনটি মাদ্রাজ থেকে এসে পৌঁছুল ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭ খ্রীঃ)—মন্দির-প্রতিষ্ঠা হওয়ার দিন থেকে পাঁচ মাস পরে। চন্দনের গন্ধে চারদিক ভরপূর। স্বামিজী মহারাজ সিংহাসন দেখে অত্যন্ত খুসী হ'য়ে বল্লেন: 'তোমার কার্য তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি'। যাঁর কাজ তিনিই করান, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র'। পরে শিল্পী বিনয়বাবুকে দিয়ে সিংহাসনের মাথার ওপর খোদাই ক'রে রঙ করা হ'ল মঠের একটি প্রতীক অতি সুন্দরভাবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭ খ্রীঃ) বা ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ছিল স্বামী অভেদানন্দজীর জন্মতিথি-উৎসব। ঐ দিনই সেগুনকাঠে তৈরী সিংহাসনটি পরিবর্তন ক'রে চন্দনকাঠের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি প্রতিকৃতি। নূতন প্রতিকৃতিতে (ছবিতে) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন স্বামিজী মহারাজ নিজে। সে'দিন ছিল আবার ভীষণ দুর্যোগ।

যাহোক পূর্বপ্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক ১৪ই মার্চ (১৯৩৭) পবিত্র মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে। মন্দিরের বেদীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বামিজী মহারাজকে খবর দেওয়া হয়েছে তা' আগেই বলেছি। তিনি আগে থেকে ছিলেন তৈরী হ'য়ে বসে। সুতরাং আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পরণে নূতন রঙ করা সিল্কের গেরুয়া কাপড়, গায়ে সাদা পাতলা একটি গেঞ্জী ও তার ওপর জড়ানো সিল্কের গেরুয়া চাদর, মাথায় টুপি ও পায়ে চটিজুতা। উদাস-গম্ভীর ও আলুথালু তাঁর ভাব, কোনদিকেই ছিল না দৃষ্টি, মুখ প্রসন্ন অথচ প্রদীপ্ত। ধূপ, ধুনা ও গুগ্ গুলের গন্ধে মন্দির আমোদিত। আমরা সকলেই স্বামিজী মহারাজের আগমন-প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। তিনি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সকলে সমবেত কণ্ঠে 'ওয়া গুরুজিকী ফতে' ও 'জয় রামকৃষ্ণ' শব্দ ক'রে উঠলেন। স্বামিজী মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট একটি আসন আগে থেকেই বেদীর সামনে পাতা ছিল। তিনি ধীর মন্থর গতিতে আসনে গিয়ে বসলেন। মন্দির ও বাইরেশ পরিবেশ নীরব ও নিথর। স্বামিজী মহারাজ আসনে উপবেশন করেই ধ্যানস্থ হলেন—স্থির, ধীর ও নিষ্কম্প। অসংখ্য লোকের মুখর কোলাহল আগে থেকেই স্তব্ধ হয়েছিল। ভাবগম্ভীর প্রকৃতি, সকলের নিশ্বাসের শব্দও যেন স্তব্ধ। অপূর্ব সে দৃশ্য, অপূর্ব সে দিব্যভাবের পরিবেশ। যাঁরা সে' ঘটনা সে'দিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরাই বহন করবে তাঁর স্মৃতি চিরদিনের জন্য।

আধ ঘণ্টা—কি তার আরো কিছু বেশীক্ষণ কেটে গেল ঠিক একই ভাবে। তারপর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'তারপর'। তন্ত্রধারক বল্লেন: 'এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হবে'। সেগুনকাঠের সিংহাসনের ওপর নূতন ক'রে ভাল ফ্রেমে বাঁধানো শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি (ফটো) আগে থেকেই বসানো ছিল। স্বামিজী

মহারাজের ভাব তখন যেন 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। 'আচ্ছা' ব'লে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখ দু'টি অর্ধনিমিলিত। পূজক হাতে নিলেন সযত্নে সিল্কের কাপড়ে মোড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি। স্বামিজী মহারাজ 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ ক'রে সিংহাসনটি একবার মাথায় স্পর্শ করালেন। আগে পূজক ও তার পিছনে স্বামিজী মহারাজ পূজকের একটি কাঁধে একটি হাত দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর পিছনে তন্ত্রধারক স্বামিজী মহারাজের মাথায় ছাতা ধরে, সকলের পিছনে সাধু, ব্রহ্মচারি ও ভক্তগণ। শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে সারা মঠ মুখরিত। তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর স্বামিজী মহারাজ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পূজক সিংহাসনটি নিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। স্বামিজী মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করলে পূজক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন: 'এবার বেদীর ওপর সিংহাসন স্থাপন (প্রতিষ্ঠা) করুন'। তন্ত্রধারক বই দেখে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। স্বামিজী মহারাজ উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেদীর ওপর সিংহাসনটি স্থাপন ক'রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন: 'ঠাকুর, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর যতদিন চন্দ্র সূর্য আকাশে কিরণ দেবে ততদিন তুমি এখানে থাকবে। অনন্ত-কাল এই মঠে তুমি বিরাজ করো'। তাঁর দু'টি হাত ধীরে ধীরে কাঁপতে লাগল। চক্ষু জলে ভারাক্রান্ত। অপরূপ সে দৃশ্য। তিনি নতজানু হ'য়ে আসনে বসে করজোড়ে আবার বল্লেন: 'ঠাকুর, সবই আপনার ইচ্ছা। এতদিনে আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হ'ল'। ক্রমশঃ চক্ষু আরো জলভারাক্রান্ত। তিনি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন:
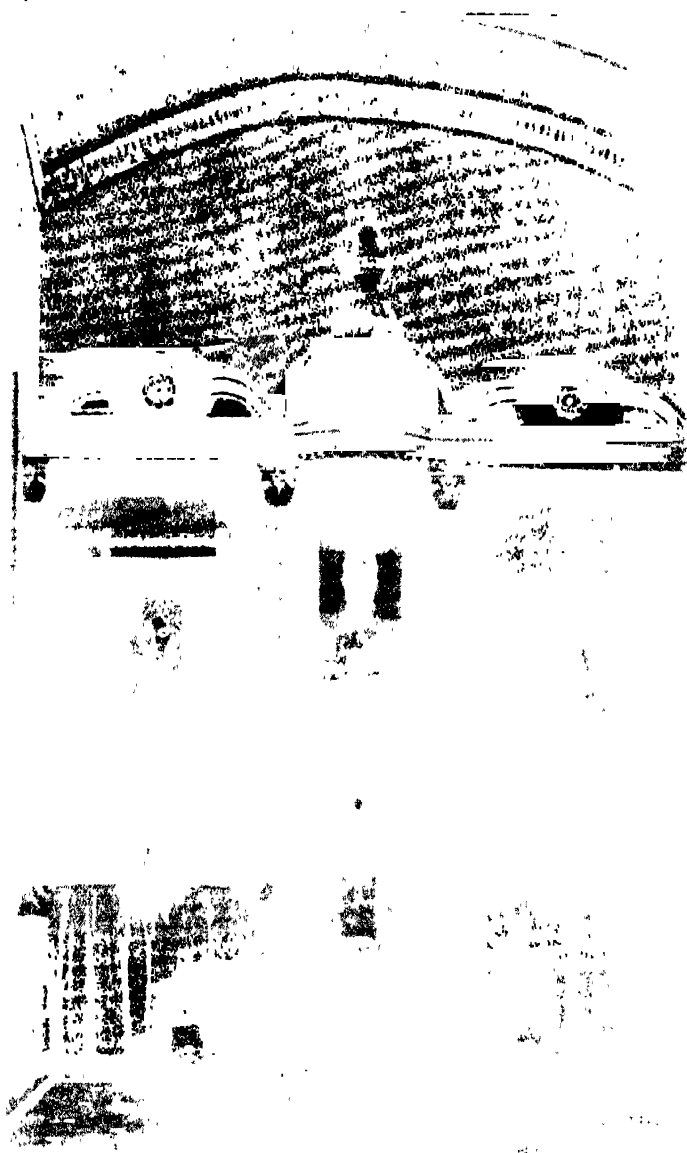
(কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মন্দিরের বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা

দার্জিলিঙ বেদান্ত আশ্রমে নিবেদিতা মেমোরিয়াল বিল্ডিং

দার্জিলিঙ বেদান্ত আশ্রমে (ক) উপরে স্বামী অভেদানন্দের বিশ্রাম-ঘর, (খ) নীচে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

'শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে বহুকাল থাকবেন—যাবচ্চন্দ্রদিবাকর। যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন তাঁর দিব্য আবির্ভাব এখানে থাকবে'। দিব্যপ্রশান্তির আলোকচ্ছটায় তাঁর মুখ সমুজ্জ্বল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে তিনি ভাবের আবেশে মন্দিরের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন ও ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলেন। তাঁর গম্ভীর, উদাস ও আনমনা ভাব দেখে কেউ আর তাঁকে প্রণাম করতে তখন সাহস পেলেন না। আনন্দমুখর হ'য়ে উঠল সকলের অন্তর।

ঠিক এরকমই হয়েছিল শুনেছি দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা যে'দিন হয়। ইংরেজী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শ্রীশ্যামাপূজার দিন দার্জিলিঙ আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের জীবনপ্রণালীই ছিল অদ্ভুত! সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো তা' রহস্যময়।

যাহোক সারাদিন কাটলো আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে। রাত্রি সাড়ে আটটায় আমরা গেলাম স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করতে। দেখি তিনি আনন্দময় পুরুষ, তিন চারজন ভক্তের সঙ্গে কথোপকথন করছেন। আমরা গিয়ে বসতেই আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তিনি বল্লেনঃ 'আজ দেখলাম ঠিক বায়স্কোপের মতো সব জীবন্ত ছবি। এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও সঙ্গে তাঁদের স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ), রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), যোগেন স্বামী (স্বামী যোগানন্দ) ও সকলে। জ্যোতির্ময় তাঁদের দেহ। একে একে হাসিমুখে সকলে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। সার্থক হয়েছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর তাঁদের আবির্ভাব এই সমিতিতে (তখন মঠ নাম হয়নি) ও মন্দিরে থাকবে। এখান থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হবে

জানবে। তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। তোমরা বিশ্বাস কর, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও তাঁর সন্তানদের কল্যাণী দৃষ্টি ও আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানের ওপর চিরদিন বর্ষিত হবে'।

ঘড়িতে তখন ৯টা। নীচে নাটমন্দিরে উৎসবের সমারোহ চলেছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কথকতা করছেন। কথকতার পরই ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর কীর্তন হবে। স্বামিজী মহারাজ চাদরটি গায়ে দিয়ে বল্লেন: 'চল, নীচে যাই, একটু কথকতা ও কীর্তন শোনা যাক। আজ আনন্দের দিন। প্রাণভরে সকলে আনন্দ করো। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য-আবির্ভাব আজ এখানে'। আমরা স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে নীচে নেমে উৎসব-অনুষ্ঠানের দিকে গেলাম। দেখি সমাগত সকলে তখন আত্মভোলা হ'য়ে কথকতা শুনছে। একটু পরেই কীর্তন আরম্ভ হবে। স্বামিজী মহারাজকে চেয়ার দেওয়া হ'ল। তিনি বসে একমনে কথকতা শুনতে লাগলেন।

॥ স্মৃতি ঃ সতেরো ॥

২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬ খ্রীঃ) রওহনা হলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দার্জিলিঙ আশ্রম থেকে কলকাতা অভিমুখে। ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল প্রায় ৯৷৷০টায় তিনি এসে পৌঁছুলেন কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বেদান্ত মঠের নূতন বাড়ী তখন হয়েছে। কিন্তু তখনও তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকে সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির-নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা বেদান্ত সমিতিকে দেবোত্তর করার জন্য স্বামিজী মহারাজের নির্দেশ-মতো খসড়াপত্রের (draft) কাজও চলেছে। অদল-বদলও তাতে তিনি কম করেন নি। তাঁর অবর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ও সকল কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে ও তাদের প্রসার লাভ করে সে'কথাই তিনি তাঁর সেবক-সন্তানদের বলতেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলী ও ট্রাষ্ট-ডিডের ছাপা নকলও তিনি আনিয়েছিলেন কলকাতার ট্রাষ্ট-ডিড্‌কে নিখুঁতভাবে তৈরী করার জন্য। তবে নবপরিকল্পিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে তিনি আরো শক্তিশালী ও লোকহিতকর কাজ করার ক্ষমতা দান করার পক্ষপাতী ছিলেন। মঠ কেবলই ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার কেন্দ্রভূমিরূপেই পরিগণিত না হ'য়ে যাতে স্বাধীনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ অনুযায়ী জনহিতকর কর্মে আত্ম-নিয়োগ করতে পারে এই ছিল তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে তাই তিনি মঠ ও মিশনের সকল রকম কর্মক্ষমতা দান করেছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে তিনি সমিতির

অস্তিত্ব লোপ করেন নি, বরং মঠকে আরও শক্তিশালী সংঘে পরিণত করার জন্য সমিতির অস্তিত্বকে বজায় রেখে একই শ্রীরামকৃষ্ণনামাঙ্কিত সংঘের দু'টি সুদৃঢ় বাহুর পারস্পরিক সহযোগকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সমিতির যাবতীয় জিনিষ তাই মঠের দানপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করলেও মঠের পাশে সমিতকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তার সকল রকম কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে। মঠ ও সমিতি সমষ্টি জনকল্যাণের কামনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মঙ্গল আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাতে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে ও তাদের সুদূর-প্রসারী অগ্রগতিকে জয়যুক্ত করে এই ছিল তাঁর প্রাণের আকুলতা ও মনের একান্ত কামনা।

কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মিত হবার আগে স্বামিজী মহারাজ বলতেনঃ 'দার্জিলিঙ আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সঁপে দিয়েছি। বাকী তাঁর লীলাক্ষেত্র উত্তর-কলকাতার বুকে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করা, আর এটিই আমার সংকল্পের শেষ কাজ'। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ও প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মন্দির-তৈরীর কাজ শুরু হ'য়ে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় শেষের দিকে তা' সমাপ্ত হয় ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে মন্দির উৎসর্গ ক'রে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

১। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন মাদ্রাজে অর্ডার দেওয়া চন্দনকাঠের সিংহাসন এসে না পৌছানোয় সাধারণ একটি

মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঘটনাটিও স্বামিজী মহারাজ সংক্ষেপে তাঁর রোজনাম্‌চায় (Diary ১৪ই মার্চ, ১৯৩৭) লিখেছেন। দেখা যায়,

'Went ,down and opened the door of মন্দির and নাটমন্দির at 7-50 A. M. Watched the start of the procession till 9 A. M Sjt. Sanat Mookherji unveiled S. V.'s (Swami Vivekananda's) Oil-paint. I spoke and described the history of S. R's (Sri Ramakrishna's) Oil-paint by Fr. Dvorak. At

কাঠের সিংহাসন তৈরী করিয়ে তাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। চন্দন কাঠের সিংহাসনটি মাদ্রাজ থেকে এসে পৌছোয় ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শনিবার। তাতে প্রতীক তৈরী ক'রে রঙ করাতে লাগলো দু'দিন। স্বামিজী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব ছিল ২৮শে সেপ্টেম্বর (১২ই আশ্বিন, ১৩৪৪) মঙ্গলবার। সে'দিনই নূতন সিংহাসনে নূতন একটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন স্বামিজী মহারাজ। তাঁর ডাইরীতেও ঐদিনের ঘটনা-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "It was a cyclonic weather with heavy rain and high winds all day and night. I made প্রাণপ্রতিষ্ঠা of the new photo of R. in the new sandal wood সিংহাসন। Had কথকতা by পাঁচকড়ি and শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন by a party from চোরবাগান। I sat in নাটমন্দির for 2 hours' (অর্থাৎ সে'দিন ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ দিন। দারুণ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল দিন ও রাত ধরে। আমি চন্দনকাঠের সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন একটি ফটো বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। পাঁচকড়ির (বন্দ্যোপাধ্যায়) কথকতা ও চোরবাগানের শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন হয়'। চন্দনকাঠের সিংহাসনের সঙ্গে সেই দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত ছবিটিই এখন মন্দিরে আছে।

2 P. M. I went down and প্রদক্ষিণ around the mandir and did প্রাণপ্রতিষ্ঠা। In eve I heard কথকতা and ভূপেন বসুর কীর্তন'।[২] অবশ্য বিস্তৃতভাবে আগেই এ'সব ঘটনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

ক্রমে কলকাতা বেদান্ত সমিতিকে দেবোত্তর করার কাজে স্বামিজী মহারাজ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাব পরামর্শ অনুসারে ট্রাষ্ট-ডিডের (Trust-Deed) খসড়া রচনা করেন। এটর্ণি যতীন্দ্রনাথ বসু ও মণীন্দ্রনাথ মিত্র খসড়া-রচনার কাজে সহায়তা করেন। স্বামিজী মহারাজ প্রায়ই বলতেন : 'this is the last mission of my life' (এটাই আমার জীবনের শেষ কাজ)। তাই বেদান্ত সমিতিকে যে'দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণময় চরণে অর্পণ করলেন সে'দিন তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম শান্তির নিঃশ্বাস ও অন্তরে আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশ। সে'দিনের কথা এখনো চাক্ষুষ আমাদের মনে আছে। একদিন রাত্রে আফিস-ঘরে আমরা বসে আছি, তিনি বল্লেন : 'এখন

২। 'আমি নীচে গেলাম ও নাটমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলাম। তখন সকাল ৭টা (১৪ই মার্চ, রবিবার ১৯৩৭)। ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম শোভাযাত্রা বার হওয়ার জন্য। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) নাটমন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের আবরণ-উন্মোচন করলেন। (একটি ছোট সভার অনুষ্ঠান হ'ল নাটমন্দিরে)। আমি প্রোগের ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রের ইতিহাসের কথা সকলকে বুঝিয়ে বল্লাম। বেলা ২টার সময় নীচে গিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র প্রতিকৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। রাত্রে 'কথকতা' (শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের) ও 'কীর্তন' (ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণ বসুর) শুনলাম'।

যতদিন শ্রীশ্রীঠাকুর রাখেন ঝড়ের এঁটো পাতার মতো। ঝড়ের এঁটো পাতা হওয়ার চেয়ে আর শান্তি কি বলো! তাঁর আশ্রম এবার তিনিই দেখবেন, আমার এবার পেন্সন'।

* * *

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্বানুশীলক ভি. ডি. ঋষি একবার কলকাতা বেদান্ত মঠে এসেছিলেন। স্বামিজী মহারাজ তখন কলকাতায়। ভি. ডি. ঋষি এলেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। ঋষির সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী মহারাজের আলাপ ছিল অনেকদিন আগে থাকতে। ভি. ডি. ঋষির পত্নীও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রেতাবতরণের তিনিই ছিলেন ঋষির মাধ্যম বা মিডিয়ম। বিশেষতঃ নারীরা কোমলস্বভাবা, ভাব ও ধ্যানপ্রবণ বলে তাঁরাই ভালো মিডিয়ম হ'তে পারেন। আমেরিকায় মেয়েরাই সকল সময়ে ভালো মিডিয়াম।

ভি. ডি. ঋষি বেদান্ত মঠে এলেন ইংরেজী ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) রবিবার সন্ধ্যার কিছু আগে। সমিতির গ্রন্থাগারে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হ'ল। তিনি মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দিলেন 'প্রেততত্ত্ব' (*Spiritualism*) সম্বন্ধে। এটর্ণি মণীন্দ্রনাথ মিত্র সে' বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বামিজী মহারাজ আমেরিকায় থাকা-কালে প্রেততত্ত্বানুশীলন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বল্লেন। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যে কী প্রগাঢ় ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' ('মরণের পারে') বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন। এ'গ্রন্থেও আমরা সে'সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি।

ভি. ডি. ঋষির সঙ্গে পরিচয় ছিল স্বামিজী মহারাজের তা' আগেই বলেছি। ঋষি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে একটি উইজা-বোর্ড(*Ouija-board*-প্রেতাবতরণ-যন্ত্র) উপহার-সামগ্রী-রূপে। ইংরেজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টের (২৫শে শ্রাবণ ১৩৪৩, সোমবার) রোজনাম্‌চায় (*Diary*) এ'সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ লিখেছেন : 'Recieved Ouija-Indicator from V. D. Rishi and paid Rs. 4/10'। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট (১লা ভাদ্র ১৩৪৩,) সোমবার রোজনাম্‌চায়ও পাই ঠিক এই ধরণের আর একটি লেখা : 'Sent Oui-ja Board to Girin Roy per V. P. Rs. 4-10+7 Ans =Rs. 5-1-0'। সেই' উইজা-বোর্ডটি আবার উপহার দিয়েছিলেন স্বামিজী মহারাজ তাঁরই অন্যতমা মন্ত্রশিষ্যা কাশীপুরের বিভাবতী রায়কে।

উইজা-বোর্ডটি দেখতে ছিল চারকোণা। একটি মোটা পিজবোর্ডের ওপর ইংরেজী 'এ' থেকে 'জেড্‌' (A—Z) পর্যন্ত অক্ষরগুলি সাজানো ছিল। আলাদা দু'টি চাকা-লাগানো ও লোহার কাঁটাযুক্ত একটি যন্ত্র ছিল তার সঙ্গে। বোর্ডের ওপর ছিল ঐ যন্ত্রটি। দু'পাশে দু'জন মিডিয়ম বোসে স্পর্শ ক'রে থাকেন ঐ চাকাযুক্ত সূচ্যাগ্র কাঁটাটি হাত্‌ দিয়ে। পাশে থাকেন আর একজন কাগজ পেন্সিল নিয়ে বোসে মেসেজগুলি লেখার জন্য। প্রশ্নকারী বা প্রশ্নকারীরা থাকেন তার পাশে বোসে।

কাশীপুরের বাড়ীতেই বসতো উইজা-বোর্ড নিয়ে প্রেতাবরণ-বৈঠক। মিসেস রায় (বিভাবতী রায়) ও বীরেন্দ্রনাথ রায় হতেন বৈঠকের মিডিয়ম। ধীরেন্দ্র নাথ রায় থাকতেন কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বোসে বিদেহী-প্রেরিত

কথাগুলি লেখার জন্য। গিরীণবাবু (গিরীন্দ্রনাথ রায়) ও স্বামিজী মহারাজ থাকতেন পাশে বোসে। স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে যেতেন লক্ষ্মণ মহারাজ (স্বামী সত্যরূপানন্দ) বা নগেন মহারাজ (স্বামী সদাশিবানন্দ) বা অন্য কোন কেউ। কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে বসার পর কাঁটাটির মধ্যে দেখা দিতো স্পন্দন ও গতি। কাঁটার সূচীমুখ পড়তো উইজা-বোর্ডে লিখিত এক একটি অক্ষরের ওপর। ছু'পাশে লাগানো চাকা-ছু'টি কাঁটাটিকে ঘোরাফেরার জন্য সাহায্য করত। বীরেন বাবু উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন ইংরেজী শব্দগুলি (অক্ষর) ও ধীরেন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি লিখে যেতেন কাগজে। সকল রকম মেসেজই হ'ত লেখা। স্বামিজী মহারাজ ও সকলে পড়ে বুঝতেন পবিত্র বিদেহীদের সঙ্কেত ও কথা।

কাশীপুর বাড়ীতে উইজা-বোর্ড নিয়ে বৈঠক বসতো সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবে। পরিবেশ ছিল তার পবিত্র ও শান্ত-সমাহিত। স্বামিজী মহারাজকে উপলক্ষ্য ক'রেই বসতো বেশীর ভাগ বৈঠক, আর আহ্বানে আসতেন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতারা। কখনো কখনো আসতেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে ও উপদেশ দিতেন তাঁর প্রিয় সন্তানকে। অত্যন্ত সংযত ও সংক্ষেপভাবেই প্রশ্ন করা হ'ত বাঙ্গালা বা ইংরেজীতে, কিন্তু উত্তর আসতো সর্বদাই ইংরেজীতে। ধূপের গন্ধে থাকতো সারাটি ঘর আমোদিত, আর স্তব্ধ ও ভাববিমুগ্ধ থাকতেন বৈঠকে যাঁরা যোগদান করতেন।

সে' বৈঠকের ছু'একটির পরিচয় দেব এ'প্রসঙ্গে এখানে। স্বামিজী মহারাজ নিজেই লিখেছেন তাঁর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের রোজনামচায় (১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন ১৩৪৩

শুক্রবার) বৈঠকের কথা : 'Cloudy and showers at night. Went to Cossipore after 7 P. M. and returned after 10 P. M. Had Lakshman with me and we took tea. Sat when they had Oui-ja Board with Biren, Giren, Dhiren and Mrs. Roy. S. V. and S. B. gave messages to me.'

['রাত্রে বেশ মেঘ ও বৃষ্টি হ'ল। সন্ধ্যা ৭ টার পর কাশীপুরে (ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ী) গেলাম ও সেখান থেকে ফিরে এলাম রাত্রি ১০টায়। লক্ষ্মণ (স্বামী সত্যরূপানন্দ) আমার সঙ্গে গেল। আমরা সেখানে চা খেলাম। তারপর উইজা-বোর্ড নিয়ে বসলাম। বৈঠকে ছিল বীরেন, গিরীন, ধীরেন ও মিসেস রায় (বিভাবতী রায়)। এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) ও এস. বি. (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে তাঁদের বাণী দিলেন]।

আর একটি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (২২শে চৈত্র ১৩৪৩) বুধবার রাত্রির ঘটনা। স্বামিজী মহারাজ তাঁর রোজনাম্‌চায় (*Diary*) এ'সম্বন্ধে লিখেছেন : 'At 7-30 P. M. went to Mrs. Roy with লক্ষণ, and had tea. Then sat at Oui-ja Board. Mrs. Roy, Dhiren and Biren. I sat aside. S. V. came first and asked us to meditate. S. R. gave me message of instructions. Then S. V. and then অখণ্ডানন্দ। Returned after 10-30 P. M.'

[সন্ধ্যা ৭॥০ টায় লক্ষ্মণের (স্বামী সত্যরূপানন্দ) সঙ্গে আমি মিসেস রায়ের ওখানে (কাশীপুর) যাই ও চা খাই। তারপর উইজা-বোর্ডে বসলাম। মিসেস রায় (বিভাবতী

রায়), ধীরেন (ধীরেন্দ্রনাথ রায়) ও বীরেন (বীরেন্দ্রনাথ রায়) ছিল বৈঠকে। আমি পাশে (চেয়ারে) বসে থাকলাম। এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে এলেন ও আমাদের ধ্যান করতে বল্লেন। তারপর এস. আর (শ্রীরামকৃষ্ণ) এলেন ও আমাকে তাঁর শিক্ষাপূর্ণ বাণী দিলেন। আবার এস. ভি. (স্বামী বিবেকানন্দ) ও পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ এলেন। আমরা রাত্রি ১০৷৷০টায় কাশীপুর থেকে মঠে ফিরে এলাম]।

এই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের বাণী ছিল একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! পার্থিবলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক যে নিবিড়, ভালবাসা ছিল, শাশ্বতধামের অধিবাসী হ'য়েও পৃথিবীর প্রতি তাঁদের ভালোবাসার অন্ত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জীবন্মুক্ত সন্তানরা নিজেদের মুক্তিকেও উপেক্ষা করেছিলেন, আর তাই বিশ্বের কল্যাণ-সাধনায় শত সহস্র জন্ম স্বীকার করতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তানদের লক্ষ্য ক'রে কতবার বলেছেন : 'বাউলের দল * * * নেচে কেঁদে গেল, কিন্তু কেউ চিনতে পারলে না', 'ওরা সব নিত্যসিদ্ধের দল', 'প্রাতঃকালের তোলা মাখন'। সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা ছিলেন ব্যক্তিগত মুক্তির বিরোধী, ছিলেন বোধিসত্ত্বের দল। ধূলিমলিন পৃথিবীলোক থেকে বিদায় নিলেও দিব্যসত্তা তাঁদের এখনো পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

ইংরেজী ১৯৩৬-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের বাণীগুলি পাওয়া যায় কাশীপুর বৈঠকেই। স্বামিজী মহারাজ, মিসেস রায়, ধীরেনবাবু ও বীরেনবাবু ছিলেন একদিন বৈঠকে বসে। প্রথমেই এলেন স্বামী

বিবেকানন্দ। স্বামিজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) উইজা-বোর্ড চালকদের লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: 'আমার শতকোটি প্রণাম দাও স্বামিজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে)'। চালকরা সমস্বরে জানালেন স্বামী বিবেকানন্দকে স্বামী অভেদানন্দের প্রণাম।

স্বামী বিবেকানন্দ: 'My heartiest blessings and love'.

[আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা নাও]

স্বামিজী মহারাজ: 'আপনি কি আমায় এখানে দেখতে চেয়েছিলেন? কিছু বলবেন' কি?

স্বামী বিবেকানন্দ: 'All of you just meditate for sometime'.

[তোমরা সকলে কিছুক্ষণের জন্য ধ্যান করো]

স্বামী বিবেকানন্দ: 'My Master will speak to you'.

[মদীয় আচার্যদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) তোমাকে কিছু বলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর: 'My dearest son, I have come down to this (plane) only to bless you. Your work is in right direction. My Mother is always with you and shall be there wherever you keep Her. *Your work is comming to an end*, but before you leave this mortal world, some more work you must finish. Educate your disciples * *, that at least some of them may not be misguided by love for power and name and money. My blessings to you all.'

[প্রিয় সন্তান, আমি এসেছি এখানে তোমায় আশীর্বাদ করার জন্য। তোমার কর্মপ্রণালী ঠিক পথেই চলছে।

আদ্যাশক্তি মা[৪] সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন ও যেখানেই তুমি তাঁকে নিয়ে যাবে সেখানেই তিনি থাকবেন। অবশ্য (পৃথিবীতে) তোমার কাজ শেষ হ'য়ে আসছে, কিন্তু পার্থিব শরীর ছেড়ে যাবার আগে তোমায় আরো কিছু কাজ করতে হবে। তোমার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করো * *, অন্তত তাদের মধ্যে কেহ কেহ যেন ক্ষমতাপ্রিয়তা, নাম-যশ ও অর্থের লোভে আদর্শচ্যুত না হয়। তোমাদের সকলকে আমি আশীর্বাদ করছি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারপর অন্তর্হিত হলেন। এলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ: 'My brother, you wanted to know whether my Master was present on the ocassion of the opening ceremony of the temple'[৫]

(ভাই, তুমি জানতে চেয়েছ যে, তোমার মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের সময় মদীয় আচার্যদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা!).

স্বামিজী মহারাজ: Yes [হ্যাঁ]।

স্বামী বিবেকানন্দ: 'He Himself came to tell you that He will go wherever you will take Him to. You do certainly feel His presence in your temple. I, though an humble servant of my Lord, take this

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

৫। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩) কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ও এই বৈঠক-বাণী প্রদত্ত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (২২শে চৈত্র, ১৩৪৩)—মন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রায় ১ মাস পরে।

opportunity to bless you for having been able to fulfil one of my missions to start *a hall for educational purpose* in the very heart of this city which was once the centre of *Lila* of our Master. Perhaps very few knew that this was a mission of my humble self except you, * * and few other gurubhais. This institution of yours must be such as will give real training to the fallen masses so that they will know what is the ultimate goal of mankind. It is only through you that the will of my Master can get full play for the present. You will gradually see how the name of my Master will create and open out a new field and vision among the people of this city * *'.

[তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এসেছিলেন তোমায় জানাতে যে, যেখানেই তাঁকে নিয়ে যাবে সেখানেই তিনি যাবেন। নিশ্চয়ই মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন তুমি মন্দিরের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব অনুভব করেছিলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যদিও আমি অতি দীন দাসানুদাস, তবুও এই অবসরে তোমায় আশীর্বাদ জানাবার সুযোগ নিচ্ছি যে, আমার একটি একান্ত কামনা ছিল (শ্রীরামকৃষ্ণের) লীলাস্থল কলকাতার বুকে শিক্ষা-প্রসারতার উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষায়তন নির্মাণ করা। এক তুমি ও কোন কোন গুরুভাই ছাড়া সম্ভবতঃ কম লোকই জানে। তুমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছ তাতে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সত্যিকারের শিক্ষার বিস্তার হবে ও তা' থেকে তারা বুঝতে পারবে তাদের জীবনের

চরম লক্ষ্য কি। একমাত্র তোমার ভিতর দিয়ে বর্তমানে মদীয় আচার্যদেবের পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেতে পারে। ক্রমশঃ আরো দেখতে পাবে ক্যামন ক'রে মদীয় আচার্য-দেবের নাম এই সহরের লোকদের মধ্যে এক নূতন দৃষ্টি এনে দিয়ে নূতন ক্ষেত্রের উদ্বোধন করবে * *'।

স্বামিজী মহারাজ: 'উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কি এই message (বাণী) দিয়েছিলেন' ?

স্বামী বিবেকানন্দ: 'My Master through this humble self'.

[হ্যাঁ, আচার্যদেব এই দাসের ভেতর দিয়েই তাঁর বাণী তোমায় পাঠিয়েছিলেন]।

স্বামিজী মহারাজ: 'আর কতদিন আমায় এখানে (পৃথিবীতে) থেকে কাজ করতে হবে' ?

স্বামী বিবেকানন্দ: 'I do not want to say. * * You will yourself get sufficient notice'.

[আমি আর তা' বলতে চাই না। * * তবে তুমি নিজেই তার যথেষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে পারবে]।

স্বামিজী মহারাজ: 'Will this work prosper, this temple, hall—through the will of our Master ?'

[এই যে মন্দির, হল্ (নাটমন্দির) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করলাম একি শ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুসারেই হয়েছে ?]

স্বামী বিবেকানন্দ: 'Certainly, otherwise do you think that my Master would have employed you in this work of His ? You are only His servant'.

[নিশ্চয়ই, তা' নইলে কি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় তাঁর কাজে নিয়োজিত করতেন। তুমি তো তাঁর দাস মাত্র]

স্বামিজী মহারাজ : 'I thank you for the message. Give my heartiest love, salutation to my Lord.'
[আমাকে এই বাণী দেওয়ার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচার্যদেবকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম দিও]
স্বামী বিবেকানন্দ অন্তর্হিত হ'লে এলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। উইজা-বোর্ডের কাঁটা তখন স্পর্শ করেছে 'এ' (A) অক্ষরটিকে। স্বামী অখণ্ডানন্দ বাণী দিয়ে বল্লেন : 'My love and namaskara to my brother. My blessings to Bira, Dhiren Babu, Girin Babu and Biren Babu, and to all the children'.
[ভাই, তোমাকে আমার ভালোবাসা ও নমস্কার জানাচ্ছি। বীরা, ধীরেনবাবু, গিরীনবাবু, বীরেনবাবু ও অন্যান্য সকল ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্বাদ]
স্বামিজী মহারাজ : '* * যে'দিন তোমার দেহত্যাগ হয়েছিল, আমি সে'দিন গিয়েছিলাম (বেলুড়ে), তা' কি তুমি জানো' ?
স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'Yes' [হ্যাঁ]
স্বামিজী মহারাজ : 'কলকাতায় যে temple (মন্দির) হয়েছে তা' কি তুমি জানো ? তা' দেখেছ কি ?'
স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'Yes. Did you not feel my presence near you, after I left this mortal body ? I went to take leave from you'.
[নিশ্চয়ই দেখেছি। আমি যখন নশ্বরদেহ ত্যাগ করি তখন কি তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করোনি ? এখন বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে]
স্বামিজী মহারাজ : 'এখন আর কি কাজ আমার বাকী আছে বলো'।

স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'My Master's will must be fulfilled. * * Good bye' !
[আমার প্রভুর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। * *এখন বিদায়].

এখানে আরো দু'টি বিদেহী-বাণীর উল্লেখ করলাম, স্বামিজী মহারাজ ইংরেজীতে একটি কাগজে এ' দুটি বাণী লিখে রেখেছিলেন। এ'রকম বোর্ড মারফৎ একটি বাণী পান তিনি ৫ই আগষ্ট ও অপরটি ৬ই আগষ্ট, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

I

OUIJA-BOARD SITTINC WITH MRS. DEXTER AND URCHS. AUGUST 5TH, 1914, AT NIGHT.

(Communicated with Sister Nivedita)

'A student will come into a great fortune and will do you all you desire. She is truly a Yogi and has been guided by your Master through tails. Search for mother for household not outside. Be careful with the new-comers,—Nivedita, Nivedita'.

II

SAT WITH MRS. DEXTER AUGUST 6TH, 1914, AT NIGHT, 10 P. M.

(Communicated with Swami Vivekananda)

'Received message from Vivekananda at 10 P. M.

1. Asked him to spell his name.

2. Asked : Have you message for me ?

Ans.—Not at present.

3. Asked ; Shall I go to India ?

Ans.—No.

4. Q.—Shall I go to California ?

Ans.—No.

5. Q.—What shall I do here ?

Ans.—Work with faith.

6. Q.—Will you help me ?

Ans.—Yes. Always do good work on earth.

Then he spelled my name.

7. Asked : Are you with R. (Ramakrishna Dev) ?

Ans.—Yes.

8. Asked : Please give him my love.

Ans.—Yes.

9. Asked : Ask him to bless me.

Ans.—Yes.

10. Q.—Was Nivedita here last night ?

Ans.—Yes.

11. Q.—Where is Balaram Babu ?

Ans.—Heaven.

Then he wrote :

'My brother in knowledge, good-bye' !

বঙ্গানুবাদ

উইজা-বোর্ড-অধিবেশনে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথোপকথন :

(১)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট রাত্রে :

'ধনী ভাগ্যবতী একজন ছাত্রী আপনার কাছে আসবে। আপনি যে সকল ইচ্ছা করেছেন তিনি আপনার জন্য তা সবই করবেন। সেই নারী একজন যোগী, আপনার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নানান পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। * * যাঁরা সব নূতন নূতন আপনার কাছে আসবেন তাঁদের থেকে আপনি সতর্ক থাকবেন।—নিবেদিতা, নিবেদিতা'।

(২)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট, রাত্রি ১০টায় :

রাত্রি তখন ১০টা, স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে বাণী পাওয়া গেল।

১। প্রথমে তাঁর (বিবেকানন্দের) নামটির বানান জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

২। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে আপনার কোন বলার আছে কি ?

উঃ—না, বর্তমানে অন্ততঃ নয়।

৩। প্রঃ—আমি কি ভারতে ফিরে যাব ?

উঃ—না।

৪। প্রঃ—আমি কি ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাব ?

উঃ—না।

৫। প্রঃ—আমেরিকায় এখন তাহলে কি করব ?

উঃ—ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে কাজ ক'রে যাও।

৬। প্রঃ—আপনি কি আমায় সে'জন্য সাহায্য করবেন ?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব। পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ততদিন সৎকাজ ক'রে যাও।

৭। প্রঃ—আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৮। প্রঃ—আপনি অনুগ্রহ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিন।

উঃ—হ্যাঁ, দেব।

৯। প্রঃ—শ্রীঠাকুরকে জানান যেন তিনি আমায় আশীর্বাদ করেন।

উঃ—হ্যাঁ জানাবো, তিনি আশীর্বাদ করবেন।

১০। প্রঃ—কাল রাত্রে কি নিবেদিতা এখানে (আমার কাছে) এসেছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ, এসেছিলেন।

১১। প্রঃ—এখন বলরাম বসু কোথায় আছেন ?

উঃ—স্বর্গে।

তারপর তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) লিখলেন : 'আমার প্রিয় ভ্রাতা, এখন তাহ'লে আসি, বিদায়'।

॥ স্মৃতি : আঠারো ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসা ছিল তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও সন্তানদের ওপর অনন্যসাধারণ। সকলের ওপর তাঁর স্নেহ ও করুণা ছিল নির্বিশেষভাবে। তাই সকল ভক্ত সন্তান মনে করতেন শ্রীঠাকুর ভালবাসেন তাঁকেই সবচেয়ে বেশী। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, হরিনাথ, তারক, নিরঞ্জন প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সন্তানরা বাঁধা পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় ভালবাসা ও স্নেহের আকর্ষণে। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) বলতেন: 'শ্রীঠাকুর আমায় ভালবাসে বশীভূত করেছিলেন'। কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) বলতেন: 'মা-বাপের স্নেহের টানও আমার কাছে তুচ্ছ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অপার ভালবাসা পেয়ে'। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন: 'গুরু মহারাজ যত ভালবাসতেন, বাপ মা কি সে'রকম ভালবাসতে পারে? আমরা তাঁর কি করেছি যে, তার জন্য আমাদের ওপর তাঁর এত ভালবাসা?'[১]

কালীপ্রসাদকে শ্রীঠাকুর বলতেন: 'তুই না এলে আমার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করে'। নৌকার ভাড়া না থাকলে শ্রীঠাকুরই ভাড়া যোগাড় ক'রে দিতেন। কালীপ্রসাদের পিতা রসিকচন্দ্র গেলেন শ্রীঠাকুরকে বুঝিয়ে ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে। শ্রীঠাকুর

১। এ' সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্তপ্রবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হেসে বল্লেন : 'সে কি গো, ও কি তোমার ছেলে? ওকে যে আমি খেয়ে ফেলেছি'। কালীপ্রসাদের ভ্রূ, চোখ, কপাল দেখে শ্রীঠাকুর বলতেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়—তাঁর ভেতর শ্রীরাধার ভাব জেগে ওঠে'।

নরেন্দ্রনাথের বেলাও তাই। নরেন্দ্রনাথ হয়তো দু'একদিন গেলেন না দক্ষিণেশ্বরে কোন-কিছু কাজের জন্য, শ্রীঠাকুর ঠিক পাঁচ বছরের ছেলের মতো উতলা হ'য়ে উঠতেন। কাকেও হয়তো বলতেন : 'তাই তো, নরেন্দ্রর কেন আজ এলো না বলো দিখিনি? তুমি যেও তো একবার তার কাছে, গিয়ে আমার কথা বলবে'। কিংবা নিজেই হয়তো কোন কাজের অছিলা ক'রে কলকাতায় উপস্থিত হতেন নরেন্দ্রনাথকে দেখার জন্য। শ্রীঠাকুর বলতেন : 'নরেন্দর আমার শ্বশুর ঘর'।

রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন শ্রীঠাকুরের অতি আদরের দুলাল—তাঁর মানসপুত্র। রাখাল মহারাজ প্রায় সদাসর্বদা থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কালীপ্রসাদকে দেখিয়ে বাবুরামকে (প্রেমানন্দ) একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন : 'তোদের আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ। তোরা যেন বাঁদর, আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, বাঁদর তখন ঠিক হ'য়ে যায়'।[২] বাবুরাম মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে তিনি

২। আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী প্রেমানন্দ মহরোজের একটি পত্রে এ'কথাগুলির উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 'পত্র-সংকলন' পুস্তকে সে' পত্র ছাপা হয়েছে।

বলেছিলেনঃ 'ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ও সন্তানদের স্বভাব-প্রকৃতি ভালভাবে জানতেন ও বুঝতেন, আর সে'ভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনাদি করতেন। সাধারণ লোকেদের বেলায়ও তাই, তিনি বলতেনঃ 'সকলের মধ্যে কি ভাব আছে— কাচের পরকোলার ভেতর দিয়ে যেমন সব দেখা যায় তেমনি দেখতে পাই'।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক-বেশে বেরিয়ে পড়েন ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করার জন্য। স্বামী অভেদানন্দ তখন থাকতেন বরাহনগর মঠবাড়ীতে, সর্বদাই শাস্ত্র-আলোচনা ও ধ্যান-ধারণাদি নিয়ে ডুবে থাকতেন। তাঁর জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট ছিল, সকল সময়ই থাকত সে' ঘরের দরজা বন্ধ। সকলে সে'টিকে বলত তাই 'কালী-তপস্বীর ঘর'।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন চিরদিন স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী, সত্যবাদী ও অসাধারণ মেধাবী। শাস্ত্র-বিচারের বৈঠক বসতো কখনো কখনো বরাহনগর মঠে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারে অবতীর্ণ হতেন স্বামী অভেদানন্দ, কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি, সুক্ষ্মযুক্তি ও বিচারশৈলী দেখে সকলেই বিমুগ্ধ হতেন। অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল অনেক সময় তাঁর সকল বিচারের লক্ষ্য। তবে সকল মতবাদকেই তিনি শ্রদ্ধার প্রণতি জানাতেন। ভক্তিমতের তিনি মোটেই বিরোধী ছিলেন না। তবে ভাবপ্রবণতা, ভাব বিহ্বলতা বা উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী কোনদিনই ছিলেন না। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে ধারণা তাঁর অলোক-

সামান্য আচার্যদেবের মতোই ছিল, দু'টিকে দেখতেন অভিন্নদৃষ্টি নিয়ে। ভক্তির পর জ্ঞান কি জ্ঞানের পর ভক্তি— এ'ধরণের বিচার-বিতণ্ডাকে তিনি নিরর্থক বলতেন। জ্ঞান ও ভক্তি কোনটি কারু বিরোধী নয়, বরং উভয়েই উভয়ের সহকারী ও প্রতিপূরক। ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়—কি জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়—এ'ধরনের বিচারবুদ্ধিকেও তিনি বলতেন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট। পক্ষপাতশূন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি ভগবদনুগ্রহ-লাভের পথে সহায়ক বলতেন। পরমতকে হীন প্রতিপন্ন করতে যাঁরা প্রয়াসী সেই অসহিষ্ণুদের তিনি বলতেন জ্ঞানদৃষ্টিহীন।

কিছুদিন বরাহনগর মঠে অতিবাহিত ক'রে স্বামী অভেদানন্দ বার হলেন (১৮৮৮ খ্রীঃ) পরিব্রাজকের বেশে দেশভ্রমণ করতে। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করেন কপর্দকহীন হ'য়ে। তাঁর অবলম্বন ছিল একটিমাত্র গৈরিকবস্ত্র, কম্বল ও কমণ্ডলু। তারপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে রওহনা হলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে (১৮৯৭ খ্রীঃ) সাগরপার হ'য়ে যান আমেরিকায়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের কিছু বেশী তিনি কাটালেন আমেরিকায় অবিশ্রান্ত কর্ম-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। বিশ্রামসুখ-লাভের সৌভাগ্য তাঁর জীবনে খুব কম দিনই ঘটেছে। তাঁর পাশ্চাত্যে কর্মপ্রবাহের কথা আমরা আগেই বলেছি। সেখানকার প্রতিদিনের কর্মপঞ্জী ছিল ঘড়ি দিয়ে ভাগ করা। প্রত্যহ তিনটি চারটি ক'রে বক্তৃতা দিতেন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন জায়গায়। তারপর উপনিষৎ, গীতা, যোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে ক্লাস, ঘরোয়া ধর্ম-আলোচনা, আশ্রমের প্রত্যেকটি

কাজ নিজে দেখা, কখনো কখনো নিজে হাতে করা, পাইন আপেল প্রভৃতি ফলের বাগান করা, শাকশব্জী প্রভৃতি চাষের তত্ত্বাবধান করা, নূতন-কিছু পাকপ্রণালী ও কৃষিবিষয়ক নানান বই কিনে পড়া ও সে' সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া, বই লেখা ও চিঠিপত্রের জবাবাদি দেওয়া, জামা-কাপড় নিজের হাতে সেলাই করা বা নূতন জামা টুপী তৈরী করা—এই সমস্ত ছিল তাঁর আমেরিকায় পঁচিশ বছর থাকাকালীন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। তারই মধ্যে সতেরবার আতলান্তিক মহাসাগর তিনি অতিক্রম করেন, তিনবার পরিভ্রমণ করেন পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশগুলি (কন্টিনেণ্টস) ও তাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নূতন নূতন। অলসতা তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনগতির পথরোধ করতে কোনদিনও সক্ষম হয়নি।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন তিনি তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য দেশ পরিভ্রমণ ক'রে প্রত্যাবর্তন করেন আবার বেলুড় মঠে। কলকাতার বুকে ও পরে দার্জিলিঙে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আশ্রম। অসংখ্য সভা-সমিতিতে যোগদান করা, বক্তৃতা দেওয়া, প্রাত্যহিক ক্লাস ও ধর্ম-আলোচনা প্রভৃতি কাজ, তা'ছাড়া নবগঠিত আশ্রম-দু'টির কাজ-কর্ম দেখা, শ্রীঠাকুরের আদর্শে আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসীদের জীবনকে গড়ে তোলা, নিজের বই ছাপানো, বইয়ের প্রুফ দেখা প্রভৃতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক কাজের দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কাজেই বিশ্রাম লাভ তাঁর শেষের জীবনেও কোনদিন ঘটেনি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙ মেলের দুর্ঘটনায় যখন

তিনি অসুস্থ ও ডাক্তাররা উপদেশ দেন পূর্ণবিশ্রাম করার জন্য, তখন তিনি বলেছিলেন: ‘হাঁ, এতদিন পরে ঠিক ঠিক বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিলেন আমায় করুণাময় শ্রীঠাকুর। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক’। এ’সকল কথারও আলোচনা করেছি আমরা আগেই।

অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও বিশ্রাম তাঁর জীবনে এতটুকু ছিল না। সারা দু’টি বছর—এমন কি শরীর যাবার পূর্বদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তিনি করেছেন সকলের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য ক’রে। এ’ সম্বন্ধে কেউ পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন: ‘বাবা, এ’ শরীরটা তো একদিন যাবেই। এখন এই ভাঙা শরীর দিয়েও যদি কারু কিছু উপকার করতে পারি তো শরীর ধারণ করা আমার সার্থক হবে’।

স্বামিজী মহারাজ বলতেন: ‘*Be the instrument in the hand of the Almighty*’ (সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র-রূপে সর্বদা থাকবে)। কিংবা বলতেন: *Be the play-ground of the Almighty*’ (নিজেকে সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত কর)। কিন্তু ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বা তাঁর লীলাভূমি হওয়া বা করা কি সাধারণ কথা! কত সাধনা ও কত পুণ্যকর্মের ফল থাকলে তবে নিজের কর্তৃত্বাভিমান দূর করা যায়। অভিমান দূর হ’লে তবেই মানুষ নিজের ব্যষ্টি ইচ্ছা ভগবানের বিরাট ইচ্ছার কাছে বলি দিতে পারে। আর তখনি হৃদয়ে আসে আত্মসমর্পণের ভাব, তখনই মানুষ হয় ঠিক ঠিক ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলতেন: ‘নিজের এতটুকু কর্তৃত্বাভিমান, ভোগের ইচ্ছা বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লালসা থাকলে ভগবানের কৃপা লাভ করা

মানুষের ভাগ্যে হয় না। তাই যতক্ষণ না মানুষ নিজের অহমিকাকে বলিদান দিচ্ছে, যতক্ষণ না নিজের পার্থিব শরীরকে ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত করছে, ততক্ষণ ঈশ্বর অতি নিকটে হ'য়েও অতিদূরে থাকেন। দিব্যচেতনার বিকাশ হ'লে তবেই মানুষ তাঁর আত্মাকে অনুভব করতে পারে, আর তখনই মুক্তি হয় তার করতলগত'।

এ'কথাগুলির প্রত্যক্ষ রূপও দেখেছি আমরা স্বামিজী মহারাজের মধ্যে। যে'কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, তার উত্তরে তিনি বলতেন: 'শ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় যা হয়—তাই হবে, আমি কিছু জানি না বাপু। শ্রীঠাকুর করান তো নিশ্চয়ই হবে'।

দীক্ষা, সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্যব্রত-গ্রহণের পক্ষপাতী হ'লেও ঐসব বিষয়ে স্বামিজী মহারাজের অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বেলুড় মঠে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অনেকে তখন অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাছে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস নেবার জন্য, কিন্তু তিনি স্থিরভাবে বলতেন: 'রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে যাও, অধ্যাত্ম অনুভূতির তিনি অতলস্পর্শী সাগর'। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাসমাধির (১০ই এপ্রিল ১৯২২) পর দীক্ষাপ্রার্থীদের তিনি বলতেন: 'মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) আছে যাও। তিনি মঠ ও মিশনের সভাপতি, তাঁর কাছেই দীক্ষা নেওয়া উচিত'। অনেক অনুরোধের পর গোড়ার দিকে তিনি দু'চারজনকে মাত্র বেলুড় মঠেই সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন। কলকাতায় ও দার্জিলিঙে যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখনও দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-দান সম্বন্ধে একরকমেরই কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। কেউ দীক্ষা নেবার

জন্য অনুরোধ জানালে সস্নেহে বলতেন: 'শ্রীঠাকুরের নাম জপ কর। তিনিই সব ক'রে দেবেন'। জীবনের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজনকে তিনি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য ও অনেককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সবার বেলায়ই ছিল ঐ একই রকমের নিয়ম। অনেকে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে দীক্ষা বা ব্রহ্মচর্য নেবার কথা বলতে সাহসী হতেন না। স্বামিজী মহারাজের কাণে সে'কথা গেলে বলতেন: 'ও, তাই নাকি, আমি বড় গম্ভীর ব'লে লোকে আমার কাছে ঘেসতে ভয় করে? তা' খিল খিল ক'রে আর হাসি কাঁহাতক বলো'। এই ব'লে স্বামিজী মহারাজ সরল বালকের মতো উচ্চহাস্য ক'রে উঠতেন।

একেবারে শেষের দিকে তাঁর জীবনযাপনপ্রণালী ছিল নূতন রকমের। দীক্ষা ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস এদের কোনটার বিষয়েই আর কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। দীক্ষার প্রসঙ্গে তাঁর কথাগুলি ছিল অতি অপূর্ব রকমের। তিনি বলতেন: 'দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি কি, কিন্তু দীক্ষা দেব মানে কারু দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আমি রাজী নই। শ্রীঠাকুরই সবার মালিক, আসলে তিনিই সবার কর্ণধার। আমি দীক্ষা দিই কিরকম জানো? শ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম শুনিয়ে দিয়ে তাঁরই হাতে দীক্ষার্থীকে সঁপে দিই। ভালো বা মন্দ তিনিই সব দেখুন বা বুঝুন, আমার কি আর বলো। দীক্ষা দেওয়ার পর আমি কিন্তু সকলের জন্য বসে বসে জপ করতে কোনদিনই পারবো না। আমার কাজ হ'ল তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া। আমি উপলক্ষ্য মাত্র, শ্রীঠাকুরই সকলকে পার করার মালিক'।

আমরা শুনে বিস্মিত হতাম, ভাবতাম শ্রীঠাকুরের হাতে

সঁপে দেওয়াও কি অত সহজ কাজ, আর সঁপে দিলেই তিনি (শ্রীঠাকুর) শিষ্যের সকল-কিছু ভার নেবেন একথা যিনি জোর ক'রে বলতে পারেন তিনিওতো সাধারণ লোক নন। সহজ (সাধনসিদ্ধ) মানুষ না হ'লে সহজকে (ভগবানকে) কেউ ঠিকঠিক বুঝতে ও বুঝিয়ে দিতে পারে না। আসলে সহজকে যিনি বুঝেছেন, তিনিই সহজ মানুষ। বাউলরা সহজ বা সহজ-মানুষকেই সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষ বলে। ভগবানের অপর নাম 'সহজ'। স্বামিজী মহারাজ ছিলেন সেই সহজশ্রেণীর লোক। তাই তাঁর অভয় আশ্বাসের বাণী শুনে আমাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভাব জেগে উঠত ও শ্রদ্ধায় অবনত হ'ত আমাদের শির!

তাঁর দীক্ষাদানের কথায় একটা কথা মনে পড়ে এখানে। দীক্ষাদেবার আগে দীক্ষার্থীকে তিনি বলতেন: 'একথা সত্য যে, তিনিই (শ্রীভগবানই) তোমাদের গুরু, তিনিই আসলে তোমাদের সকলের ইষ্ট (ইষ্টদেবতা)। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র এই তিন এক। গুরুতে কখনও মনুষ্য-বুদ্ধি করবে না। দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের মাঝখানে শুভ্র জ্যোতির্ময়-মুর্তি গুরুকে ধ্যান করবে। তিনি জ্ঞানময়। বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ ব'লে তিনি শুভ্র ও জ্যোতির্ময়। তিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল-কিছুই জানেন। তাঁর কল্যাণময় হস্ত সর্বদা তোমার দিকে প্রসারিত। মন্ত্রের সঙ্গে ইষ্টের সমন্বয় সাধন করবে, ভাববে মন্ত্র ও ইষ্ট এক ও অভেদ। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'—প্রণব বা ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ ব্রহ্মকেই বুঝিয়ে দেয়। মন্ত্রও তাই। নাম যেমন নামীকে বোঝায়, শব্দ যেমন অর্থের প্রকাশক, জ্ঞানদাতা গুরুও তাই। ইষ্টকে বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেন ব'লে তিনি ইষ্ট থেকে ভিন্ন নন।

ইষ্টকে তিনি জেনেছেন ও অনুভব করেছেন বলেই তিনি গুরু ও তারই জন্য তিনি ইষ্টকে দেখাতে পারেন। উপনিষদেও আছে ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্ম থেকে আলাদা নন। তাই ইষ্টবিদ্ বা ব্রহ্মবিদ্ গুরু ইষ্টমূর্তি বা ব্রহ্মের স্বরূপ। গুরুর প্রণামমন্ত্রে আছে: অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে যিনি জ্ঞানের অঞ্জন চোখে পরিয়ে দেন, শিষ্যের জ্ঞাননেত্র খুলে দেন তিনিই গুরু। শ্রীঠাকুর বলতেন ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এ' তিনই এক। মন্ত্র, গুরু ও ইষ্টও তাই। এটাই সর্বদা মনে রাখবে ও এই ভাবকে ঠিকঠিক উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। গুরুর প্রয়োজন কেবল তারি জন্য। গুরুই ভবসাগর-পারের উপায় ব'লে দেন, কেননা তিনিই পারের দিশা জানেন'।

কিংবা বলতেন: 'ইষ্ট (ইষ্টদেব) কি রকম জানো, যেন একটি ডায়নামো (dynamo), আর তোমরা সকলে এক একটি বাল্‌ব (bulb—আলো)। ডায়নামো থেকে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট (বৈদ্যুতিক তরঙ্গ) তারের মধ্যে দিয়ে বাল্‌বে যায়, তাতেই আলো জ্বলে। সুইচের সাহায্যে তাকে জ্বালা বা নিবানো যায়। গুরুর কাজ হ'ল ঐ সুইচ্‌টা টিপে আলো জ্বেলে দেওয়া, নইলে ইলেকট্রিক কারেণ্ট তো বইছেই। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন: 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দাও'। ভগবান অন্তরাত্মা বা জ্ঞানরূপে সবার অন্তরে বিরাজিত। কেবল অজ্ঞান থাকার জন্য মানুষ তা' জানতে পারে না। গুরুর কাজ ঐ অজ্ঞানকে সরিয়ে দেওয়া। গুরু বিচারের জাগপ্রদীপ শিষ্যের হৃদয়-মন্দিরে জ্বেলে দেন। শিষ্যের মধ্যে বিবেক-বিচারের আগুন জ্ব'লে উঠলে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, তখন জ্ঞান আপনা

হতেই প্রকাশ পায়। প্রকাশ তো আছেই, তবে সেই প্রকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া চাই, আর এই জ্ঞান হওয়ার নামই মুক্তি। মুক্তি জ্ঞান থেকে তাই ভিন্ন জিনিস নয়। গুরু সহায়ক হন কেবল ঐ মুক্তিলাভের পথকে দেখিয়ে দেবার জন্য। তিনি আলোর সুইচটা টিপে দেন, আর অমনি আলো দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে'।

কোন-কিছুর সম্বন্ধে কাণে শোনা, তাকে চোখে দেখা ও তাকে ঠিক ঠিক বোঝা বা অনুভব করা এ' তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস—এ'কথা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন। বইয়ে পড়ায় বা কাণে শোনায় মনে একটা কোন-কিছুর ধারণা বা সংস্কার হয় সত্য, কিন্তু সেটা আবছা-আবছা বা অস্পষ্ট, কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। স্বামিজী মহারাজ বলতেন: 'চোখে দেখলে প্রত্যক্ষ ধারণা হয়, কিন্তু তাতেও সত্যকারের জ্ঞান হয় না। ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় প্রাণ দিয়ে বুঝলে—অনুভব করলে। বোধে বোধ। একটা মানুষের সম্বন্ধে শুনলে বা তাকে চাক্ষুষ দেখলেই কি লোকটার মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক ঠিক জানা যায়? তার সঙ্গে আলাপ করতে হয়, দিনের পর দিন মিশতে হয়, তার সকল-কিছু জানতে হয়, তবেই বোঝা যায় লোকটার যথার্থ স্বরূপ কি। ঈশ্বরানুভূতিও তাই। শুধু বইয়ে পড়লে বা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শুনলে হয় না, তাঁকে প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা চাই, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞান লাভ করা চাই, তবেই তাকে অনুভূতি বলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় আছে: 'একজন দুধের কথা শুনেছে, একজন দুধ দেখেছে, আর একজন দুধ খেয়েছে, এই তিনজনের ভেতর যে দুধ খেয়েছে সেই বলতে পারে দুধ

জিনিসটা ক্যামন। দুধের কথা যে শুনেছে সে অজ্ঞানী, দুধ যে দেখেছে সে জ্ঞানী ও দুধ যে খেয়েছে সে বিজ্ঞানী'। বিজ্ঞানী কিনা বিশেষ জ্ঞানী। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্যষ্টি-জ্ঞান লাভ করলে জ্ঞানী, আর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সমষ্টি-জ্ঞান লাভ করলে বিজ্ঞানী। আসলে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীতে কোন ভেদ নেই। একটা বিশেষ কিনা ব্যষ্টি ও আর একটা সামান্য কিনা সমষ্টি। সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আলাদা, কিন্তু যে একবার 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান লাভ ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, সেই আবার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আপনা-হতেই অনুভব করে। জ্ঞান হলেই জ্ঞানী দেখে 'ঈশাবাস্য মিদং সর্বম্'—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে জরে আছে। সেই বিজ্ঞানী। আসলে জ্ঞানীও যে, বিজ্ঞানীও সে। কাশীর কথা বইয়ে পড়া, নিজে গিয়ে কাশী দেখা, আর কাশীতে থেকে তা'র সব-কিছু তথ্য সংগ্রহ করা—তিনটের জ্ঞান আপাতত আলাদা বৈকি। অধ্যাত্ম জগতের কথাও তাই। আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরানুভূতি ছাড়া ধর্ম ও সাধন-জগতের আসল তত্ত্ব কিছুই জানা যায় না, আর তত্ত্বের সমাধান না হ'লে সংসারে মানুষ মায়ানির্মুক্ত হ'তে পারে না। এই সাক্ষাৎকার একটা অনুভূতি-বিশেষ। ইংরেজীতে একে বলে *feeling* বা *experience*, কিন্তু আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরানুভূতির এগুলি উপযুক্ত পরিভাষা নয়, বরং *realization* বা *God-realization* বল্লে অনুভূতির কিছুটা অর্থ প্রকাশ পায়। 'জ্ঞান'-কে ইংরেজীতে আমরা *knowledge*, 'প্রজ্ঞা' বা 'সম্বিৎ'-কে *consciousness*, ও 'চৈতন্য'-কে *intelligence* বলি, কিন্তু সত্যিই কি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চৈতন্যের এগুলি ঠিক ঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ ?'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, পার্থিব ও অপার্থিব-ভেদে জ্ঞান তো দু'রকম। অপার্থিব জ্ঞানের নামই অদ্বিতীয় জ্ঞান। এই অদ্বিতীয় জ্ঞানই কি সর্বব্যাপক ব্রহ্মজ্ঞান?'

স্বামিজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, সাধারণভাবে প্রশ্নটা ঠিকই জিজ্ঞাসা করছ। অদ্বিতীয় জ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান, সর্বব্যাপক জ্ঞান, অখণ্ড-জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান—সবই এক পর্যায়ের জ্ঞান। দর্শনের ভাষায় এদেরকে বলে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, সবিকল্প ও নির্বিকল্প বা সবিশেষ ও নির্বিশেষ জ্ঞান। আসলে জ্ঞান একটাই, বিষয়ভেদে মাত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আচার্য শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই changeless বা permanent (অবিকৃত ও নিত্য)। ঐ একই জ্ঞানের বিকাশ জাগতিক সকল রকম জ্ঞান'।

আমরা: 'মহারাজ, শঙ্কর কি পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করেছেন?'

স্বামিজী মহারাজ: করেছেন বৈকি। তিনি বলেছেন বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি হয়, তাই তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা' পারমার্থিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে ব্যবহারিক জ্ঞানও থাকে, তবে তখন তা' ব্রহ্মসংস্কৃত হয়। যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয় ততদিন ব্যবহারিক জ্ঞানকে নিত্য ব'লে মনে হয়'।

আমরা: 'ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ কি?'

স্বামিজী মহারাজ: 'পারমার্থিক জ্ঞানে subject (জ্ঞাতা বা বিষয়ী), object (জ্ঞেয় বা বিষয়) ও relation (সম্বন্ধ বা জ্ঞান) এ' তিনটির কোনটাই থাকে না, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানে এই সব থাকে। আসলে জ্ঞান তো একটা। এক জ্ঞানই

subject, object ও relation (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও সম্বন্ধজ্ঞান) এই তিন রকমভাবে প্রকাশ পায়। Relation (সম্বন্ধ) থাকলেই জ্ঞান limited (পরিছিন্ন) হয়। শঙ্কর তাই ব্রহ্মজ্ঞানে কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন সম্বন্ধ থাকলে জ্ঞান কখনো পারমার্থিক হয় না। তাই তিনি নৈয়ায়িকদের সমবায়সম্বন্ধ অস্বীকার করেছেন। সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করলে দু'টো বা অনেকগুলো জিনিসের সত্যতা স্বীকার করতে হয়। শঙ্কর ও শঙ্করপন্থীরা তাই বলেন যদি একান্তপক্ষে সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয় তবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধই (relation of identity) ভাল। তাদাত্ম্য ও স্বরূপ সম্বন্ধ একই। শঙ্কর বলেন object বা predicate (বিষয়) subject-এরই (বিষয়ীরই) concrete expression (চাক্ষুষ বিকাশ)। আসলে শঙ্কর কিন্তু subject ও object-এর (বিষয়ী ও বিষয়ের) মধ্যে কোন relation (সম্বন্ধ) স্বীকার করেন নি, কারণ relationটা (সম্বন্ধ) পরিচ্ছিন্ন উপাধি (limiting adjunct)। তা' অখণ্ড জিনিস বা জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ ও ভাগ করে। দুই বা ততোধিক বস্তু থাকলে তবেই সম্বন্ধের দরকার হয়, কিন্তু যেখানে একটাই মাত্র বস্তু বা জ্ঞান, সেখানে কে কার সঙ্গে আর সম্বন্ধ পাতাবে বলো'।

'শুদ্ধজ্ঞানে subject, object ও relation (বিষয়, বিষয়ী ও সম্বন্ধ) কোনটাই থাকতে পারে না। 'Subiect-কে (বিষয়ীকে) অপেক্ষা ক'রেই তো object (বিষয়ী)। অপেক্ষা করা মানে object is related to subject (বিষয় বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত)। এই সম্বন্ধই limitation (পরিচ্ছিন্নতা) কিনা মায়া'।

'রামানুজ শঙ্করের মত স্বীকার করেন নি। রামানুজের মতে সৃষ্টি, জীব ও ঈশ্বর নিত্য। আর সে'জন্য তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। রামানুজ বলেন বিষয়ের অস্তিত্ব চিরদিন থাকে, বিষয়ীও থাকে, আর বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাও নিত্য। রামানুজের মতে ঈশ্বরই সৃষ্টির কারণ, কিন্তু সে'জন্য তাঁর শক্তি কোনদিনই limited (সীমাবদ্ধ) হয় না। তাঁর শক্তি অপরিসীম ও অনন্ত, সুতরাং অপরিণামী ও নিত্য। তিনি স্বয়ংপূর্ণ। তিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য ও সকল মাধুর্যের আকর। অদ্বৈতবাদীরাও ঈশ্বর স্বীকার করেন ও ঈশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু সে ঈশ্বর মায়ানির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম নন। তাঁরা বলেন সৃষ্টিকে অপেক্ষা ক'রেই স্রষ্টা ঈশ্বর, কিন্তু সৃষ্টি যখন মিথ্যা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, তখন অনিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্রষ্টা ঈশ্বরও পারমার্থিক বা নিত্য নন।' শঙ্করের মতে ব্যাস

১। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন: (a). ' * * but that which is unconditioned, is beyond the relative, is the Absolute. Take, for instance, the conception of a Creator. Can He be the Absolute? No, He is relative. Because a Creator requires to be related to the creation. If the creation is taken away from Him, He is no longer the Creator. It is a name, a name that is related to the created object, and that relation makes a Creator what He is. So the Creator of the universe or God is not the absolute being, or *Brahman.* He is relative. He is a part of the phenomena, and, therefore, He is the first-born Lord of the universe. He is the first manifestation of the Absolute. The Absolute, as if, projects out of its own body the first-born Lord or *Isvara*, projects this cosmic con-

'ন প্রযোজনবত্ত্বাৎ' (২।১।৩২) সূত্রে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব খণ্ডন করেছেন'।

'অদ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর আবার দু'টি : একটি মায়াধীশ বা অব্যক্ত-ঈশ্বর ও অপরটি মায়াধীন বা ব্যক্ত-ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ। অব্যক্ত-ঈশ্বরে মায়া কারণ বা বীজাকারে থাকে, তখন সৃষ্টি থাকে না, কিন্তু সৃষ্টির ইচ্ছা ও উন্মুখতা বীজাকারে আছে। কার্য-ঈশ্বর বা হিরণগর্ভে মায়া ক্রিয়াশীল, সুতরাং সেখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, কিন্তু কারণ-ব্রহ্মে সৃষ্টি অব্যক্ত। ব্যবহারিক সৃষ্টি বা জগতের ঈশ্বর বা স্রষ্টা যিনি, তিনি হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর। বিরাটে সৃষ্টি স্থূলভাবে প্রকাশ পায়। বেদান্তে অব্যক্ত-ঈশ্বরকে কারণব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভকে কার্যব্রহ্মও বলে। কিন্তু শঙ্করের মতে নিরুপাধিক মায়ানির্মুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম কোন-কিছুর কারণও নন, কার্যও নন। কারণ ও কার্য উপাধি

---

sciousness, or the cosmic ego, which becomes the Creator, the *prime-mover* of the evolution. And matter again comes out of the same Absolute'.—*True Psychology* (1954), pp. 196-97.

(b). 'So, personal God is not the Absolute. It is a phase, or the expression of the absolute expression, through the force of nature, and that expression will last so long as the objects to which that expression is related, will last. So, if the phenomenal world would vanish, there would be no more necessity of a Creator or a personal God. Therefore the monistic thinkers who are the sincere, and earnest seekers after the Absolute, do not stop in dualism, do not stop in qualified non-dualism, but they want to go deeper and still further, and try to find out the absolute truth, which is beyond all changes and beyond all relations.'—Ibid., pp. 197-98.

বা গুণ। এই উপাধি বা গুণ শুদ্ধব্রহ্মে অজ্ঞানের জন্য আমরা আরোপ করি। আরোপ কিনা কল্পনা। এই কল্পনাই মায়া কিনা মিথ্যা। মিথ্যা কিনা সত্য নয়—অনিত্য, আজ আছে কাল নেই। সগুণ ও নির্গুণ—উপাধিক ও নিরুপাধিক শব্দগুলি সুতরাং কল্পিত বা উপাধিবিশেষ'।

'শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের মতের এখানেই পার্থক্য। শঙ্কর নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষণ বা উপাধিহীন অনুভূতিস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞান (ব্রহ্ম) ছাড়া আর কিছুকেই নিত্য বলেন নি। কিন্তু রামানুজ নিত্য ও লীলা—স্রষ্টা ও সৃষ্টি দু'রকমই স্বীকার করেছেন ও দু'টিকেই নিত্য বা সত্য বলেছেন। রামানুজের মতে জ্ঞানে subject ও object (বিষয় ও বিষয়ী) দুই থাকে। তাঁর মতে নিরুপাধিক ও নির্বিশেষ জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নেই, সার্থকতাও নেই। কর্তা বা বিষয়ীরই জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান কিন্তু বিষয়ী থেকে ভিন্ন। বিষয়ও বিষয়ী ও জ্ঞান থেকে ভিন্ন। আর তারি জন্য বিষয়ীর কাছে বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয়। Subject (বিষয়ী) না থাকলে object-এর (বিষয়ের) জ্ঞান করবে কে, আর object (বিষয়) না থাকলে জ্ঞানই বা হবে কোন জিনিষের। নিরুপাধিক জ্ঞানই নির্বিকল্পক জ্ঞান। রামানুজের মতে নিরুপাধিক নির্বিকল্পক জ্ঞানের কোন প্রামাণ্য নেই, অর্থও নেই'।

'রামানুজ তাই সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক দু'রকম জ্ঞান স্বীকার করেছেন। কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য: শঙ্কর নির্বিকল্পক জ্ঞানকে নির্বিশেষ, অর্থাৎ subject-object (বিষয়-

---

২। রামানুজ ভাষ্যে বলেছেন: 'নির্বিশেষবস্তুবাদিভিঃ নির্বিশেষে বস্তুনি ইদম্ প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্'।

বিষয়ী) উপাধিশূন্য বলেছেন, আর রামানুজের মতে নির্বিকল্পক জ্ঞানেও subject-object (বিষয়-বিষয়ী) থাকে, কেননা subject ও object (বিষয় ও বিষয়ী) না থাকলে নিরুপাধিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অনুভব হয় না।[৩] রামানুজ বলেছেন জ্ঞান তখনি হয় যখন তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট আকার ও সত্তার নিশ্চয়তা থাকে। সুতরাং তাঁর মতে নির্বিকল্পক জ্ঞানেরও নির্দিষ্ট একটি আকার বা বিষয় থাকে, যদিও সে জ্ঞানের আকারে কিছুটা ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সে' জ্ঞান সর্বভেদশূন্য নয়। কারণ সর্বভেদশূন্য নিরুপাধিক জ্ঞানের কোনদিন প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না'।[৪]

'শঙ্কর কিন্তু এ'কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বসংবেদ্য, তা' অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয়; অর্থাৎ নির্বিকল্প জ্ঞানকে জানার জন্য অন্য কোন প্রমাণের দরকার নেই। ব্রহ্মজ্ঞানও তাই। আসলে অনুভূতিই ব্রহ্মের স্বরূপ। শঙ্করের নিজের কথায় বলতে গেলে 'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য'। ভক্তিসূত্রে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদ বলেছেন ভক্তির স্বরূপ মূক বা বোবার আস্বাদনের মতো। আস্বাদন অর্থাৎ নিজের অনুভূতি। তিনি বলেছেন: 'মূকাস্বাদনবৎ'। মূক বা বোবা কথা বলতে পারে না, কিন্তু কিছু খেলে তার আস্বাদন কি ধরণের সে তা'

৩। রামানুজের ভাষ্যেও আছে: 'নির্বিকল্পকমপি সবিশেষবিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্নহুভূতপদার্থ-প্রতিসন্ধানহেতুত্বাৎ'।

৪। রামানুজ ভাষ্য: 'নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং ন সর্ববিশেষরাহিত্যস্য; তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাদ্ অনুপপত্তেশ্চ'।

ভালভাবে জানে। ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি। যিনি অনুভব করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের কি যথার্থ স্বরূপ তা বুঝতে পারেন। বোধে বোধস্বরূপ, কিন্তু অপরকে তা' বোঝানো যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত—'অবাঙমনসোগোচরম্', ব্রহ্মজ্ঞান মন-বুদ্ধির অগোচর। আসলে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অজ্ঞানের পরিণতি। তাই অন্ধকার দিয়ে যেমন আলোকে প্রকাশ করা যায় না, তেমনি অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকাশ করা যায় না। অজ্ঞানের নাশই ব্রহ্মজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রাপ্ত ও সিদ্ধ বস্তু বলেন (an accomplished fact)। কোন কার্য দিয়ে তাকে জানা বা লাভ করা যায় না। অনেকে বলেন ব্রহ্মজ্ঞান সাধনালব্ধ, অর্থাৎ সাধনার ফলরূপে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা ভুল। ব্রহ্মজ্ঞান কোন সাধনালব্ধ ফল নয়। তা' চিরদিনই আছে ও থাকবে, তবে অজ্ঞানের জন্য জানতে পারছ না এই যা। তুমি যে সত্য শিব সুন্দর এটা নিজের দেহের ওপর মায়া মমতা আছে ব'লে জানতে পারছ না। শরীরের ওপর থেকে মমতা চলে গেলে তোমার নিজের আসল স্বরূপ তখন উপলব্ধি করতে পারবে। ব্রহ্ম নিজের মহিমায় মহিমময়। সে' মহিমা আর অন্য কোন্ জিনিস দিয়ে জানবে বলো। প্রদীপ দিয়ে তো আর সূর্যকে প্রকাশ করা যায় না, সূর্য নিজেই চিরপ্রকাশমান'।

আমরা : 'মহারাজ, জ্ঞান নিয়ে কি অন্যান্য দেশেও এ'রকম মতভেদ আছে ?'

স্বামিজী মহারাজ : 'আছে বৈকি। এ'সব নিয়ে দ্বন্দ্ব এদেশে যেমন, ওদেশে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভেতরও তেমনি। সাধারণ লোক জ্ঞানের অখণ্ডত্ব ও নির্বিশেষ ভাব

উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া time, space ও causation-এর (দেশ, কাল ও নিমিত্তের) জগতে বাস ক'রে মানুষ সহজে অসীমত্ব ও নির্বিশেষ ভাব কল্পনা করতে পারে না। শঙ্কর বলেছেন দেশ, কাল ও নিমিত্তই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।[৫] দেশ, কাল, নিমিত্তই মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা।[৬] মায়ার জন্যই আমরা আমাদের আসল স্বরূপ বুঝতে পারি না। অধ্যাস প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর এ'কথাই বলেছেন। অধ্যাসভাষ্যটি শঙ্করের একটি বিশিষ্ট দান। তিনি মায়ার definition (অভিধান) দিতে গিয়ে বলেছেনঃ 'অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ', অর্থাৎ যেটা যা নয়, তাকে তাই ব'লে মনে করানোর নামই অধ্যাস কিনা মায়া বা ভ্রম। দেহ আত্মা নয়, কিন্তু দেহকেই আত্মা বলে আমরা ভ্রম করি। দেহের জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু দেহের জরা মৃত্যু প্রভৃতি আত্মার ওপর আরোপ করি ও দেহটাকেই নিত্য ব'লে মনে করি। মনে করাটাই মায়া বা ভ্রম। অন্ধকার রাত্রে একটা কাঠের গুঁড়ি বা থামকে দেখে যেমন ভূত (অপদেবতা) ব'লে ভ্রম করি, কিংবা একটা দড়িকে হটাৎ দেখে সাপ ব'লে ভুল করি, তেমনি দেহকে ভুল ক'রে আমরা শাশ্বত আত্মা ব'লে

৫। 'প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গ যতঃ'—প্রভৃতি।

৬। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে অনেকে ভেদ স্বীকার করেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতে ঈশ্বরে যে অজ্ঞান থাকে তার নাম 'মায়া' ও জীব বা মানুষে যে অজ্ঞান থাকে তার নাম 'অবিদ্যা'। কিন্তু আচার্য শঙ্কর ও বিবরণমতাবলম্বীরা মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন না।

মনে করি। আসলে কাঠের গুঁড়ি বা থামটা ভূত নয়, দড়িটা সাপ নয় ও মরণশীল দেহটাও শাশ্বত আত্মা নয়। শঙ্কর বিশেষভাবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ দিয়েছেন। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমই মায়া। ব্রহ্মে জীববুদ্ধিই মায়া। জীবে আত্মবুদ্ধিই মায়া। মায়া বা ভ্রম তখনই দূর হয় যখন 'জীবই ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি হয়। মাধব-বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতে বলেছেন,

> মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
> স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা ॥

যেমন মানুষ ঘুম থেকে জাগলেই তার স্বপ্ন দূর হয়, তেমনি সদসদ্‌বিচারের পর শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা দূর হয়। অবিদ্যা দূর হওয়ার নামই মুক্তি। আকাশ থেকে যেমন মেঘ সরে গেলে সূর্যের প্রকাশ হয় তেমনি'।

তারপর প্রসঙ্গ উঠলো আদর্শের কথা নিয়ে। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন: 'আদর্শ কিনা—গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথায় Ideal বা perfect Type। Ideal বা Type নিখুঁৎ একটি ছাঁচ—যাতে ফেলে মানুষ জীবন তৈরী করে। প্রত্যেক মানুষই আদর্শ-রূপে তাঁর চোখের সামনে একজন লোক বা দেবতাকে রাখতে চায়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রতিটি মানুষ কোন-না-কোন উন্নত শিল্পী, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বীর, জ্ঞানী বা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী মানুষকে অনুসরণ করে তার জীবন তৈরী করার জন্য। সাধক ভগবানকে আদর্শ-রূপে অনুসরণ করে। মনের কোণে বা কল্পনায় কোন-না-কোন আদর্শ মানুষ বা জিনিসকে তাই লোকে

জীবনে অনুসরণ ক'রে চলে। প্লেটোর Type বা Ideal-এর অর্থ অবশ্য ভিন্ন। প্লেটো ভারতীয় ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন। হিন্দুদর্শনে সৃষ্টির বীজকে 'প্রকৃতি' বলে। প্রকৃতি যেন একটি বিরাট ভাণ্ডার, মানুষের সমস্ত সংস্কার একীভূত হয় ঐ প্রকৃতিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রকৃতিকে বলেছেন গিন্নির ন্যাতাকাতার হাঁড়ি। ঐ হাড়ীতে কুম্‌ড়োর বীজ, ঝিঁঙের বীজ, লাউয়ের বীজ ও ফল, ফুল ও গাছের বীজ যত্ন ক'রে রাখা থাকে নতুন গাছ তৈরী করার জন্য। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের সংস্কার-রূপ বীজ অর্থাৎ perfect Type সূক্ষ্মাকারে বিরাট প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চিত থাকে। আসলে প্রকৃতি সমষ্টি বীজ—সমস্ত ব্যষ্টি বীজের আধার। ইংরেজীতে প্রকৃতিকে বলে cosmic Mind,—individual mind-এর সমষ্টি। বাইবেলে নোওয়ার (Noa) Arch-ও (নৌকাও) ঐ প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি। সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির mythology (পুরাকাহিনী) অনুসন্ধান করলে দেখবে সৃষ্টির কাহিনী সকল দেশে একই ধরণের, তবে ভাবে ও ভাষায় হয়তো ভিন্ন ভিন্ন'।

'আবার perfect Type বা Ideal বলতে এমন কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবান মানুষকে বোঝায় যার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, মালন্য নেই, তাতে স্বভাব বা স্বরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই সচরাচর Ideal বা আদর্শ বলতে আমরা অবতারকল্প পুরুষ, মহামানব বা ভগবানকে মনে করি।' Who has seen the Son, has seen the Father (যিনি ভগবানের পুত্রকে দেখেছেন, তিনি স্বয়ং ভগবানকে দর্শন করেছেন)। আবার এ'কথাও বলা যায়, যিনি ঈশ্বরের অবতারকে দেখেছেন, তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানকেই

দেখেছেন। Son (পুত্র) এখানে অবতার ও Father হলেন ভগবান'।

'অবতারপুরুষরাও এক একটি perfect Type। মুক্তির ও মোক্ষশাস্ত্রের তাঁরাই এক একজন চাক্ষুষ প্রমাণ। তাঁদের সাধনাময় জীবনই আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁদের চেষ্টা অর্থাৎ কাজকর্ম ও সাধন-ভজন সবই লোকশিক্ষার জন্য। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষাকে বলেছেন 'লোকসংগ্রহ'। মহাপুরুষ ও অবতারদের জীবন তাই আমাদের কাছে Ideal বা আদর্শ। তাঁদের জীবনের ছাঁচে ফেলে, তাঁদের পবিত্র জীবনের চেষ্টা বা কার্যকে অনুসরণ ক'রে আমাদের জীবন তৈরী করতে হয়। সংসারসমুদ্রে তাঁরা যেন ধ্রুবতারা, তাঁদের দিকে আমাদের জীবনের compass (দিকদর্শন যন্ত্র) নির্দিষ্ট রেখে সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়। তবেই জীবন ঠিক পথে চলে। তবেই কর্মময় সংসারে থেকেও মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ কর যায়'।

আমরা: 'মহারাজ, অবতার ঠিক ঠিক কাকে বলে?'

স্বামিজী মহারাজ একটু হেসে রহস্যচ্ছলে বল্লেন: 'অবতার? এই একটু আধটু শক্তিসম্পন্ন লোক হ'লেই তাকে অবতার বলে। একটু তন্ত্রমন্ত্র ও অলৌকিক কিছু জানা চাই আর কি'। সে'কথা শুনে আমাদের হাসতে দেখে তিনি আবার বল্লেন: 'হাসির জিনিস নয়, সত্যই তাই। শ্রীঠাকুর বলতেন ঈশ্বরের অবতার। থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ। অবতার ঈশ্বরেরই শক্তিবিশেষ। মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর বা প্রত্যেক-বুদ্ধরা অবতারের নিদর্শন। পঞ্চরাত্রসংহিতায় সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি অবতারের উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অবতারের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য পঞ্চরাত্র ও পুরাণের ভাবকেই পরিপুষ্ট করা হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে অবতারদের বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণব দার্শনিকরা বিশেষ ক'রে আবার অবতারবাদ প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অবতার বলেন। তাঁরা বলেন ঈশ্বর নিজেও আসেন, আবার তাঁর শক্তিসম্পন্ন আধিকারিক পুরুষ মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ব'লে তাঁদের বলা হয় 'অবতার'। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—অংশাবতার নন। এ'যুগে শ্রীরামকৃষ্ণও তাই। শ্রীঠাকুর নিজেই বলেছেন এবারে ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ করা। ছদ্মবেশ মানে মানুষের দেহ ধারণ ক'রে আসা'।

'অবতার আসেন লোককল্যাণের জন্য। গীতায়ও 'যদা যদা হি ধর্মস্য' ব'লে অবতারবাদ স্বীকার করা হয়েছে। যুগে যুগে এক একজন আদর্শবান মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন লোককে পথনির্দেশ করার জন্য। অবতার-রহস্য অতিনিগূঢ়। তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, কিন্তু সময়ে সময়ে বিশ্বের কল্যাণ-সাধনের জন্য এক একজন আধিকারিক পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন—তা' তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলো, আর জীবন্মুক্ত পুরুষই বলো। বেদান্তদর্শনে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (২।১।৩৩) সূত্রে অবতারদের কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষ্যে শঙ্কর ঈশ্বরের লীলার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে লীলাকে তিনি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন বলেছেন। সৃষ্টি অবিদ্যাকল্পিত, সুতরাং অবিদ্যার ভিতর ঈশ্বরের লীলার কোন সার্থকতা

দেখা যায় না। কিন্তু শঙ্কর একথাও আবার বলেছেন : 'তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কবলেয়ম্, অপরিমিতশক্তিবত্বাৎ'। কিন্তু শক্তি পরিমিতই হোক বা অপরিমিতই হোক, শঙ্করের মতে তা' নিত্য নয়। তিনিই আবার বলেছেন 'ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ'। সৃষ্টিশ্রুতি যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) আছে : 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি'। তাছাড়া 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর এ'কথা আলোচনা করেছেন।[৭] সৃষ্টিশ্রুতি থাকলেও পারমার্থিক সৃষ্টিতে শ্রুতির তাৎপর্য নয়। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস যেমন মানুষের প্রযত্ন ছাড়া স্বভাবতই প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের লীলাও তেমনি প্রযত্নহীন স্বাভাবিক। শঙ্কর এ'কথা ভাষ্যে স্বীকার করেছেন'।[৮]

'কিন্তু psychology-র (মনোবিজ্ঞানের) দৃষ্টিতে natural বা automatic (স্বাভাবিক) কাজের পিছনেও মানুষের ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব থাকে, ইচ্ছা ছাড়া কোন জিনিষই ঘটতে পারে না। সুতরাং 'স্বভাবাদেব কেবলম্' কথাগুলির অর্থ বিচার করা দরকার। কিন্তু 'আপ্তকামশ্রুতেঃ', 'সর্বশ্রুতেশ্চ' প্রভৃতি কথাগুলিতে শঙ্কর নিজের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রমাণ

৭। 'অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য * * * জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তে কারণাদ্ ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি'।

৮। 'এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য ' ঞ্চিৎপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি'।

করেছেন। যখন জীবন্মুক্তপুরুষই অজ্ঞাননাশ ও আত্মোপলব্ধির পর অজ্ঞানকল্পিত শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বাস করেন ও সর্ববাসনা ও কর্মফলস্পৃহা শূন্য হ'য়ে লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করেন তখন মায়ানির্মুক্ত ঈশ্বরের পক্ষে সর্বপ্রয়োজন শূন্য হ'য়ে লীলা করা অস্বাভাবিক কি। তবে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত ভিন্ন রকম। তিনি বলেছেন এই সূত্রের উদ্দেশ্য অবতারবাদ প্রমাণ করা নয়, কিন্তু জগৎ বা সৃষ্টির ব্রহ্মাত্মভাব প্রতি-পাদন করা।[১] জগৎ বা সৃষ্টি যে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ'কথা বোঝানই সূত্রের আসল উদ্দেশ্য'।

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বল্লেন: 'কি জানো, অদ্বৈতবাদের কথা স্বতন্ত্র। অদ্বৈতবাদে অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া স্রষ্টা ঈশ্বরও নেই, সৃষ্টি জগৎও নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। তাই জীব, জগৎ ও ঈশ্বরকে স্বীকার করলে মুক্তি লাভের আশা ও সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কঠ-উপনিষদে আছে: 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া, দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। জ্ঞান বা বিচারের পথে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োজন, তাই সাধারণের পক্ষে তা' দুর্গম। 'কশ্চিদ্ধীরা'— কোন কোন বৈরাগ্যবান বিচারশীল পুরুষ ঐ জ্ঞানপথের

১। শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন: 'অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহার-গোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব বিস্মর্তব্যম্'।

বাচস্পতি মিশ্রও ভামতী-টীকায় উল্লেখ করেছেন: 'অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া বিবক্ষস্ত্যাগময়াঃ, অপি তু জগতো ব্রহ্মাত্ম-ভাবম্'।

ঠিক ঠিক অধিকারী হন, নইলে সর্বসাধারণের পক্ষে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতই ভাল। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এ' তিনটি সত্য, সুতরাং একজন আদর্শ, সত্যদ্রষ্টা পুরুষ বা অবতারের সেখানে স্থান আছে'।

'অবতারপুরুষরা কি রকম জানো,—মানুষ হ'য়েও তাঁরা অতিমানুষ। মানুষের বেশে তাঁরা আসেন, মানুষের মতোই তাঁদের চলন-বলন ও আচার-ব্যবহার, কিন্তু আসলে সে' সব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংসারিক মানুষ যে'পথে চলে, তাঁরা চলেন যেন তার ঠিক বিপরীত পথে। সাধারণ মানুষ চায় পৃথিবীর আপাতরম্য আনন্দ, পার্থিব সুখভোগ—যা' আজ আছে কাল নেই, কিন্তু অবতারপুরুষরা চান অনন্ত সুখ ও শাশ্বত আনন্দ। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তুচ্ছ সাংসারিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কি আকুলতা, কি তীব্র বৈরাগ্য, কি কঠোর সাধনাই না করেছিলেন তিনি ভগবানকে লাভ করার জন্য! নিজের আচরণ দিয়ে বিশ্বজগৎকে শেখালেন সাধনা ও সিদ্ধির মহিমময় মাধুর্য। মানুষমাত্রের তাই তিনি অনুসরণযোগ্য ও অনুকরণীয়, বিশ্ববাসীর তিনি আদর্শ, চিরপ্রণম্য ও চিরবরেণ্য'।

'আমাদেরও সহায় সম্বল তাই সর্বভাবসমন্বয়রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভাব ও পবিত্র আদর্শ যত বেশী বিশ্বের সর্বত্র প্রচার হয় ততই কল্যাণ। মানুষের ঘরে ঘরে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে, ঘৃণা দ্বেষ হিংসা মারামারিরই কেবল অভিনয়। চারদিকে অশান্তির আগুন। তাইতো পৃথিবীতে শান্তি

দূতরূপে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সার্বভৌমিক তাঁর ভাব, নির্বিকার তাঁর প্রেম ও নির্মল তাঁর ভালবাসা, মিলন-মৈত্রীর বাণী রেখে গেলেন তিনি সারা বিশ্বের জন্য। সেই ভাবকে অনুসরণ করা সকলের কর্তব্য, তবেই ফিরে আসবে আবার জীবনে শান্তি ও জীবন হবে সার্থকতায় পূর্ণ'।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক এই কল্যাণ-কামনাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর অন্তরে সর্বদা পোষণ করতেন। শ্রীঠাকুরের মঙ্গলময় হস্ত সর্বক্ষণই সর্বত্র প্রসারিত এ'কথা তিনি বলতেন। তাই যখনই তিনি হাত দিয়েছেন কোন কাজে, যখনই করেছেন কোন কর্মের সংকল্প, তখনই অনুভব করেছেন শ্রীঠাকুরের মঙ্গলময় ইঙ্গিত ও আশীর্বাদ সেই সবের পিছনে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অপার্থিব এই লীলাভূমি— এ'কথা তিনি বলতেন নিজের শরীর দেখিয়ে। আত্মাভিমানও দিয়েছিলেন চিরজলাঞ্জলি শ্রীঠাকুর ও শ্রীসারদাদেবীর পাদপদ্মে।

একবারের এক ঘটনার কথা মনে পড়ে যদিও সে' ঘটনা অতীব তুচ্ছ। বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় এসে তিনি 'বেদান্ত সমিতি'-র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। জনৈক ভক্ত করলেন কিছুটা বাধার সৃষ্টি। স্বামিজী মহারাজের মন নির্বিকার ও তেজোদ্দীপ্ত, ক্ষমাসুন্দর তাঁর মূর্তি। নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ভক্তটিকে তিনি বলেছিলেন: 'একে কি কাগী-বগী পেয়েছ? এর ভেতর তিনটে শক্তি খেলা করছে, একটা শ্রীঠাকুরের, একটা শ্রীমা-র, আর একটা স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের)'।

আত্মবিশ্বাসের জয়পতাকা নিয়ে বিশ্বের সর্বত্রই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। বেশীর ভাগ সময় নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হ'য়ে সকল কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নির্ভীক মন নিয়ে, সহায়তা ও সফলতার আশীর্বাদও পেয়েছেন তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। স্বামিজী মহারাজ বলতেন: 'নিজের ওপর বিশ্বাস হারালে তো সবই গেল। তাই স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করলে ভগবান সহায় হন। এর অর্থ কি জানো? মানুষের *indivdual will*-টা (ব্যষ্টি ইচ্ছা) *cosmic Will*-এর (সমষ্টি ইচ্ছার) কাছে *surrender* (সমর্পণ) করা। *Individual will*-এর তরঙ্গ *cosmic Will*-এর প্রবাহের সঙ্গে এক হ'লে শক্তির অদম্য স্ফুরণ হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তখন আর সে গতির প্রতিরোধ করতে পারে না। *Individual will* এক-একটি মানুষ, আর *cosmic Will* সেই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি। সকল সৃষ্টি—সকল কামনা-বাসনার বীজ বিশ্বপ্রকৃতিতে কারণাকারে সঞ্চিত থাকে। মানুষ ভগবানকে ভুলে গিয়ে যখনই নিজের সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয় তখনই সে নিজেকে দুর্বলভাবে, আর তখনই তার শক্তি হয় সীমায়িত, আর যখনই সে' ভাবে 'আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার' তখনই বিশ্বপ্রকৃতি ও তার মধ্যে থেকে সকল ব্যবধান নিমেষে তা' অন্তর্হিত হয়, আর তখনই প্রকৃতির বিরাট শক্তির সে হয় অধিকারী, *then he becomes the playground of the Almighty* ('সে হয় তখন ভগবানের লীলাভূমি')।

'আত্মবিশ্বাস মানে নিজের মধ্যে অন্তর্হিত বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট

ইচ্ছা বা শক্তি, তাকে ঠিকঠিক ভাবে জেনে তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করতে হয়। প্রকৃতি বা ভগবানের সমষ্টি ইচ্ছা থেকে নিজেকে ভিন্ন ভাবলেই মনে দুর্বলতা আসে। এই ভিন্নজ্ঞানই সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি বা অহংকার। ভগবানকে ভুলে নিজেকে স্বতন্ত্র ও সর্বময় কর্তা ভাবলে মনের মধ্যে আসে অহংকার, আর এই অহংকারই সকল অনিষ্টের মূল'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই সকল কর্তৃত্বাভিমান সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর শ্রীগুরুদেবের চরণে। বিভিন্ন সময়ে তিনি বলতেন: 'আত্মসমর্পণের (self-surrender) ভাবই ভগবদ্‌কৃপা লাভের সহজ পথ। নিজের কর্তৃত্বাভিমান মুছে দিয়ে ঈশ্বরই সব করাচ্ছেন একথা ভাবতে হয়। তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই রকম'। নিজের মধ্যেও তিনি গোপন ক'রে রেখেছিলেন এ' ভাব সকল সময়। কিন্তু এই ভাব প্রকাশ পেয়েছিল আবার তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর। কোন-কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন: 'কি জানি বাপু, শ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে, আমি কিছু জানি না'।

দার্জিলিঙ আশ্রম থেকে কলকাতা ফেরার সময় (ইং ১৯৩৭, ২১শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার[১]) ঘুম-ষ্টেশনের আগে বাতাসিয়া-লুপের (Batasia Loop) কাছে তাঁর গাড়ীর চাকা পড়ে যায় লাইন থেকে নীচে।[২] গাড়ী থেকে তিনি পড়েন লাফিয়ে ও এতে আঘাত পান হার্টে (heart)। পরের দিন

১। ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার (প্রতিপদতিথি), ১৩৪৪ সাল।

২। দার্জিলিঙ-মেলের ১ম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি ছিলেন ঠিক সে'টিই পড়ে যায় রেল থেকে নীচে।

(ইং ১৯৩৭, ২২শে সেপ্টেম্বর, বুধবার) শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে মঠে এলেন পরিশ্রান্ত হ'য়ে। চিংড়িহাটার জমীদার হরিহর দাসচৌধুরীর মোটরে তিনি এলেন মঠে। নাট-মন্দিরে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হ'ল। বসেই বল্লেন : 'এবার আমার অগস্ত্যযাত্রা, দার্জিলিঙ যাওয়া বোধহয় এই আমার শেষ। যাক, বেঁচে এলাম এ' যাত্রায় একমাত্র শ্রীঠাকুরেরই কৃপায়'। হ'লও তাই। তারপর দার্জিলিঙ আশ্রমে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর কোনদিন ঘটে ওঠেনি।

বাতাসিয়া-দুর্ঘটনাই স্বামিজী মহারাজের শরীর অসুস্থ হবার পক্ষে কারণ। তাঁর পা ধীরে ধীরে ফুলতে লাগলো ও তারই ফলে কিছুদিন পরে পেটে জল জমতে লাগলো। চিকিৎসারও হ'ল ব্যবস্থা। ডাক্তাররা ব্যবস্থা দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম ('complete rest')। স্বামিজী মহারাজ শুনে বল্লেন : 'বাঁচা গেল বাবা, এতদিন পরে হ'ল আমার পেন্সন। সারা জীবনটাই গেল কেবল কাজে আর কাজে, এতটুকু বিশ্রাম আর কোনদিন শ্রীঠাকুর আমায় দিলেন না। নেওয়াই যাক এখন complete rest (পূর্ণ বিশ্রাম)'।

যথার্থ কথাও তাই। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্মময় জীবনে 'বিশ্রাম' কথার যেন কোন অর্থ ই ছিল না কোনদিন। যোগশিক্ষার তীব্র আকুলতা নিয়ে পদব্রজে উপনীত হল্লেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, শ্রীরামকৃষ্ণ করলেন তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ। ধ্যান ভজন জপ তপ এতেই কাটতো দিবারাত্র বেশীর ভাগ সময়। অবসর যতটুকুও বা পেতেন ততটুকু কাটাতেন তাঁর আচার্যদেবের সেবা-পরিচর্যায়। সাধন-ভজনের সময়ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তিনি তাঁর আলোকসামান্য শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা ও উপদেশ। সাধন

অবস্থায়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীভগবানের সর্বদর্শী চক্ষু। বিশাল আকাশের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত বিস্ফারিত সেই চক্ষু—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'। একমাত্র জ্যোতিষ্মান দেবতারা (সূরয়ঃ) ও জ্ঞানীরাই সেই আকাশের মতো (দিবি ইব) দিগন্তবিস্তৃত চক্ষু (চক্ষুরাততম্) সর্বদা দর্শন করতে পান (সদা পশ্যন্তি)। স্বামিজী মহারাজ ইংরেজীতে তার নাম দিয়েছিলেন 'Omnipresent Eye,' —যা সর্বক্ষণই আছে নিবদ্ধ সৃষ্টিময়ী লীলার সাক্ষ্য দান করতে।

আর একটি অপূর্ব দর্শনও হয়েছিল সে' সময়ে। ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি অসংখ্য স্তম্ভশোভিত একটি বিরাট শ্বেতস্ফটিকের প্রাসাদ। তার অভ্যন্তরে চারদিকে আসীন এক একটি বেদীতে সকল অবতার-পুরুষ ও দেবতারা, মধ্যস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি। 'কোটিসূর্যপ্রতিকাশং কোটিচন্দ্রসুশীতলম্' সেই জ্যোতিচ্ছটা, প্রাসাদের অভ্যন্তর ছিল স্বচ্ছ ও আলোকস্নাত। ক্রমে অবতার ও দেবতারা প্রবিষ্ট হলেন একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য শরীরে। অপূর্ব সে' লীলা ও অপূর্ব সে' দর্শন! ধ্যানশেষে আনন্দাপ্লুত দেহ-মন নিয়ে স্বামিজী মহারাজ গেলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আচার্যদেব সমীপে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বল্লেন: 'তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হ'য়ে গেল। এখন তুই অরূপের ঘরে উঠলি'। এই মহিমোজ্জ্বল দর্শনকে স্মরণ ক'রেই স্বামিজী মহারাজ বরাহনগর মঠে তপশ্চর্যার সময় রচনা করেছিলেন তাঁর 'রামকৃষ্ণ-অবতারস্তোত্রম্'—

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং,
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥
নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতং সচ্চিদ্ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

—প্রভৃতি

সৎ ও অসতের ভেদ যাতে নাই, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ ও প্রকৃতির বিকার যাঁর মধ্যে নাই সেই নির্বিকল্প পরমচৈতন্যই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে। সৃষ্টির পূর্বে ও সৃষ্টির আদিতে যে মহান চৈতন্যঘন পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীরূপে অনন্তকাল ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি থাকবেন, তিনিই বর্তমানে মনুষ্যদেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ এ'কথাই বুঝাতে চেয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর সুললিত সংস্কৃত ছন্দগাথার মাধ্যমে। অতিসূক্ষ্ম প্রপঞ্চবিকারহীন দিগন্ত-ব্যাপী আকাশের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের অন্তরে অন্তর্যামী-রূপে প্রকাশমান, আর—

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

প্রাণীমাত্রের দুঃখে কষ্টে ব্যথিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্থিব শরীরে এলেন মর্ত্যবাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য। আপনি আচরণ ক'রে মানুষকে শেখালেন ধর্ম ও সাধনার পরমরহস্য। জানালেন বিশ্বের মানুষকে জীবনের চরমসার্থকতা অমৃতময় শাশ্বতলোকের দিকদর্শন ক'রে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্মময় সাধনসিদ্ধ জীবনের অবসান হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর (১৩৪৬ সাল, ভাদ্র) শুক্রবার প্রাতে ৮টা ১৬ মিনিটে। বিরাট বিচিত্র তাঁর জীবনের কাহিনী। আমরা আর একটি দিনের মাত্র স্মৃতিদীপ্ত ঘটনার উল্লেখ ক'রে 'মন ও মানুষ'-এর করব উপসংহার।

সে'টি ইংরেজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। বেলা সাড়ে এগার-পৌণে বারোটা হবে। স্বামিজী মহারাজ কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁর অফিস-ঘরে একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। অসুস্থ তাঁর শরীর। আমরা তিন চার জন ছিলাম কাছে। ঘর বেশ নিস্তব্ধ। তু'একটি সামান্য কথার পর তিনি বল্লেন: 'দেখ, এখন সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এই তো সেদিনের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কত লীলাখেলা করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে মিশেছি, তাঁকে স্পর্শ করেছি, তাঁর সেবা করেছি, কি অফুরন্তই না ছিল তাঁর ভালবাসা! আজ প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠছে সেই সব দিনের কথা। যা ছিল একদিন জাগ্রত, আজ মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন। এই সে'দিনের কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিন—কত শতাব্দী যেন কেটে গেছে'।

আমরা নির্বাক হ'য়ে শুনছি। স্বামিজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত। তিনি বল্লেন: 'তাঁর মতো আলোকসামান্য লোকনায়কের কৃপা পেলে জীবন কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যায়। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানও তুচ্ছ মনে হয়'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন অতিধীরে জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞান পাবার জন্যই তো মানুষের জন্ম ও সাধনা, সুতরাং তাকে তুচ্ছ মনে হবে কেন'?

স্বামিজী মহারাজ ঈষৎ হেসে বল্লেন : 'ঠিকই বলেছ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্যই তো মানুষের জীবন ও সাধনা। কিন্তু তা' আর ক'জন ভাবে বলো। ব্রহ্মবস্তুটি কিরকম বলো দেখি। লাভই বা তাঁকে ক্যামন ক'রে করবে?'

আমরা পূর্বের মতোই শুনছি নির্বাক হ'য়ে। তিনি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন : 'ব্রহ্ম কি আর তুমি আমি ছাড়া? তিনিই তো সব হয়েছেন—জীবজন্তু বিশ্বসংসার সকল-কিছু। এই যে চেয়ারটা দেখছ, তোমরা মনে করছ জড়, কিন্তু এই জড়ের মধ্যেই চৈতন্য আছে। এর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যেই চৈতন্যশক্তি অনুস্যূত। জড়বস্তুও resist করে কিনা বাধা দেয়। দেওয়ালে জোরে একটা ঘুঁষি মার, দেখবে দেয়ালটা তার return (ফেরৎ) দেবে। এই return (ফিরিয়ে) দেওয়ার নামই resist করা। দেওয়াল resist করলে, ফলে তুমি হাতে ব্যথা পেলে। Resist করার শক্তি জড়ের মধ্যে আছে। এই শক্তিই energy অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি। সেই চৈতন্য জড়ের ভিতর অব্যক্ত আকারে থাকে। অব্যক্ত অবস্থার নামই জড়বস্তু। যে চৈতন্য জড়ে আছে, সে' চৈতন্যই আকাশে বাতাসের ও পৃথিবীর সর্বত্র অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা' যেমন জলের প্রতিটি কণায় বা পরমাণুতে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে, ব্রহ্ম-চৈতন্যও তেমনি। ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অনুস্যূত। ব্রহ্মের ব্যাপক সত্তাকে উপলব্ধি করার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। নইলে ব্রহ্মজ্ঞান কি আর গাছে ফলে? এই উপলব্ধি মন বা বুদ্ধি দিয়ে হয় না, অতীন্দ্রিয় শুদ্ধজ্ঞান দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের অনুভূতি—বোধে বোধ। বোধ কিনা শুদ্ধচৈতন্য। শুদ্ধচৈতন্যের অনুভূতি

তখনই আসে যখন ভাববে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে তুমি আলাদা নও, তোমার সত্তাই বিশ্বসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা। এটা অনুমানের জিনিস নয়, প্রাণে প্রাণে অনুভব করার জিনিস। বোধে বোধ। এই অনুভূতি হয়েছিল বলেই শ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) একদিন কালীমন্দিরের পূজার কোশাকুশি, থালা-বাসন ও এমন কি দরজা-জানালা, চৌকাঠ সমস্ত চৈতন্যময় দেখেছিলেন। এ'রকমই হয়। এই অনুভূতি এখুনি—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে'।

স্বামিজী মহারাজঃ 'এখুনি—এই মুহূর্তেই হ'তে পারে' কথাগুলি এমনই দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন যেন আমাদের মনে হ'ল—ব্রহ্মজ্ঞান বুঝি মানুষমাত্রের অনায়াস-লভ্য জিনিস, দুর্লভ এতটুকুও নয়। তারপর তিনি ও আমরা নির্বাক হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। আফিস-ঘরের পরিবেশ এক জমাট ভাবে আচ্ছন্ন। নীরব ও নিস্তব্ধ চারদিক। আমাদের সর্বশরীরে তখন এক অব্যক্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত। কতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো সে'ভাবে ছিলাম মনে নাই, তবে স্বামিজী মহারাজ যখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন আমাদের হুঁস এলো। ঘড়িতে তখন বেজেছে বেলা একটা। তাঁকে প্রণাম ক'রে বাইরে এলাম। ভাবের আচ্ছন্নতা তখনো আমাদের মধ্যে থেকে কাটেনি। সামান্যক্ষণের এই ঘটনা, কিন্তু আজও সেই স্মৃতি অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ বাঙ্গালা ॥

'মন ও মানুষ' অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে। তিনি ইংরেজী বক্তৃতা যা দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য মনীষীদের সামনে তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজীতে ও বাংলা অনুবাদে। বিশ্বসংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের ভাণ্ডারে সে'গুলি অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থ—গ্রন্থকার তথা মানুষের চিন্তাধারা, মানুষেরই তা' বিচার-বুদ্ধির চাক্ষুষ প্রতিফলন। স্বামী অভেদানন্দের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় লাভ করার অর্থই বিরাট ব্যক্তিত্ববান ও চিন্তাশীল সাধনসিদ্ধ স্বামিজী মহারাজের চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, দর্শন, ধর্ম, মুক্তি, আত্মা এ'ধরণের সকল-কিছু জীবন-জিজ্ঞাসার আলোচনাই তাঁর গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে ও সত্যই তারা আজ স্বাধীন ভারতের ও সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিত কয়েকটি অনূদিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

॥ মরণের পারে ॥

মরণের পর মানুষ থাকে কি থাকে না, কোথায় যায়, পরলোকেই বা কিভাবে থাকে এই সব জিজ্ঞাসা আদিমযুগ থেকে মানুষের মনকে অধিকার ক'রে আছে। কিন্তু তার মীমাংসা ও উত্তর চাই। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইহলোক ও পরলোকের নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দিয়ে প্রমাণ করেছেন মানুষ ও প্রাণীমাত্রের আত্মার বিনাশ নাই, আত্মা অবিনশ্বর, তবে তার ক্রমবিকাশ আছে, আর মৃত্যু ক্রমবিকাশেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষ জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কালে তার পরমরহস্যময় আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করে।

॥ পুনর্জন্মবাদ ॥

মানব ও জীবজন্তুর আত্মা অমর, তবে কর্মানুযায়ী তাদের বিচিত্র গতি বা পরিণতি আছে। বৈজ্ঞানিকের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও বিচারের মধ্য দিয়ে স্বামিজী মহারাজ আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করেছেন। পুনর্জন্ম আছে। মানুষ বা প্রাণীমাত্রের জন্মের পর মৃত্যু যেমন অবধারিত সত্য, মৃত্যুর পর তেমনি তাদের জন্ম হয় একথাও সত্য। শরীরেই জন্ম ও মৃত্যু, আত্মার কোনদিন জন্ম নাই—মৃত্যুও নাই। তবে প্রাণীমাত্রের ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন করে সে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। এ' সকল আলোচনাই স্বামিজী মহারাজ তাঁর 'পুনর্জন্ম' বইখানিতে করেছেন।

॥ শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম ॥

ভারতের শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের প্রকৃত রূপ ও মাধুর্য কি বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহায়ে আলোচিত হয়েছে। মানুষের জীবনে এ' তিনটি অপরিহার্য, সুতরাং এ' তিনটির বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত।

॥ কর্মবিজ্ঞান ॥

স্বার্থজড়িত কর্ম যেমন বন্ধনের জন্য দায়ী, স্বার্থহীন কর্ম তেমনি বন্ধন-মুক্তির কারণ। স্বামিজী মহারাজ বিজ্ঞান ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষণে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

॥ আত্মবিকাশ ॥

আত্মসংযম, ধ্যান, ধারণা ও চরম আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কি ও তাদের কিভাবে জীবনে অধিগত করা যায়, সুনিপুণভাবে প্রতিটি জিজ্ঞাসু সাধকের জন্য স্বামিজী এ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

॥ ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ॥

পার্থিব ভালবাসা স্বার্থগন্ধযুক্ত ও একমাত্র ভগবানের প্রতি অপার্থিব ভালবাসাই নিঃস্বার্থ শাশ্বত প্রেম। এই প্রেম জীবনে পরিস্ফুট করা মানুষের কর্তব্য। স্বামিজী মহারাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে

পার্থিব প্রেম ও ঈশ্বরীয় ভালবাসার রহস্যকথা এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

॥ মনের বিচিত্র রূপ ॥

সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্য মনের খেলা ও বিলাস। অথচ মনের চেয়ে মানুষের আর কেউ নিকট আত্মীয় নেই। মন যেমন বন্ধন, মায়া ও মোহ সৃষ্টি করে, তেমনি মনকে পরিশুদ্ধ করলে মনই আবার সংসারের পারে নিয়ে গিয়ে পরমশান্তি দিতে পারে। মনের অদম্য শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মানুষ তার সকল রকম আধি-ব্যাধি ও দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান করতে পারে। স্বামিজী মহারাজ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন। মনকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে কিভাবে সংসারে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা যায়, 'মনের বিচিত্র রূপ' তার পরিচয় দিয়েছে।

॥ আত্মজ্ঞান ॥

স্বামিজী মহারাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে উপনিষদের সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আত্মজ্ঞান কি—প্রাণ ও আত্মা—আত্মার অন্বেষণ—আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়—অমরত্ব ও আত্মা—প্রাণ, প্রজ্ঞা ও আত্মা—জড় ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও বিরোচন—আত্মতত্ত্ব-বিচার—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—আধ্যাত্মিকতা ও সর্বোপরি আত্মানুভূতির স্বরূপ কি এ'সকল জটিল বিষয় সরল ভাষায় এ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

॥ যোগশিক্ষা ॥

যোগ কি, হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও বিশেষ ক'রে প্রাণায়ামপ্রণালী বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া যীশুখৃষ্ট যোগী ছিলেন কিনা এই আলোচনাতে স্বামিজী মহারাজ প্রমাণ করেছেন যীশুখৃষ্ট ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বেদান্তের ও যোগশিক্ষার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরিশিষ্টে

পাতঞ্জলদর্শন, নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র ও বিভিন্ন সংহিতা থেকে যোগসম্বন্ধীয় আলোচনা নিবদ্ধ হয়েছে।

॥ ভারতীয় সংস্কৃতি ॥

ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা, রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপ, কর্মপ্রচেষ্টা ও শিক্ষানীতি, পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর ভারতের ও ভারতের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব, ইংরেজ-শাসনের আমলে ভারতের অবস্থা ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এ' সমস্ত বিষয় যুক্তির আলোকে সুনিপুণভাবে এতে আলোচিত হয়েছে।

॥ স্তোত্র-রত্নাকর ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ছ'টি ও শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে একটি সংস্কৃত স্তোত্র, তাঁদের ধ্যানমন্ত্র, প্রণামমন্ত্র প্রভৃতি ও প্রত্যেকটি স্তোত্রের পদ্যে বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রসঙ্গত ও বিশুদ্ধভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমা ও শ্রীগুরুর দৈনিক ও বিশেষ পূজাপদ্ধতি, হোম এ'গ্রন্থের সৌন্দর্য ও সম্পদ। পরিশেষে মুদ্রাপ্রকরণের পরিচয় আছে।

॥ হিন্দুনারী ॥

(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-সম্পাদিত ও সংযোজিত টীকা ও পরিশিষ্টসহ)

বেদ, তন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, সংহিতা, বৌদ্ধসাহিত্য প্রভৃতিতে নারীজাতির স্থান—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের নারীজাতি সম্বন্ধে অভিমতের সমাবেশ—হিন্দুনারীর শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারীজাতির অধিকার—নারীজাতির প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচার—হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি—রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর অধিকার—সাহিত্যে ও সমাজে নারীর অবদান—নারীজাতির প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা—সতীদাহ প্রথা বৈদিক কিনা প্রভৃতি বিষয় ও বর্তমান যুগে নারীশিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত তার সবিশেষ আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।

॥ ইংরেজী ॥

THE SAYINGS OF RAMAKRISHNA

The present volume contains a larger number of sayings than as yet appeared in any one English collection. As an exposition of the universal truths of religion and their application to the daily life, this books takes its place among the great scriptures of the world.

MYSTERY OF DEATH

A Study in the Philosophy and Religion of the Katha Upanishad.

Preface—Introduction—The Ruler of Death—Death and Immortality—The Abode of Death—The Changeable and the Unchangeable—Knowledge of the Absolute—Ego and the True Self—Ego, Self and Sensation—The Divine Element in Us—The Immortal Self—The Realm of Immortality—Unity in Variety—Body and the Soul—Perfection to the Soul—Oneness amidst the Manifold—World as the result of Vibrations—End of Worldliness means the beginning of Realization—Realization of the Absolute.

LIFE BEYOND DEATH

A Critical Study of the Science of Spiritualism.

Modern Science and Higher Spiritualism—Does the Soul exist after Death—The Scientific View of Death—The Soul after Death—Rebirth of the Soul—The Soul and Its Destiny—Pre-existence and Reincarnation—Pre-existence and Immortality—Science and Immortality—Spiritualism—Spiritualism and Vedanta—Spiritualism and Ancestor-Worship—Spiritualistic Mediumship—Automatic Slate-writing—What is there beyond the Grave—Questions and Answers.

TRUE PSYCHOLOGY

A New Contribution to the Domain of Western Psychology

True Psychology—Conciousness—Powers of Mind—Mind and its Modifications—Power of Concentration—Individuality and Personality—States of Existence—Our Relation to the Absolute—Questions and Answers.

The Swami deals with the critical problems of psychology and philosophy. He has made his lectures quite compatible with logic and modern science.

WHY A HINDU ACCEPTS CHRIST AND REJECTS CHURCHIANITY

Christianity as preached by the Church has been criticized from the broad vision of the universal religion of the Hindus, with a series of historical evidences.

SCIENCE OF PSYCHIC PHENOMENA

The Psychic Phenomena -Prana and the Healing Power—The Magnetic Healing—Science of Mental Healing—Spiritual Healing by discarnate Spirit—Science of perfect Health.

How tremendous the power of mind is and what wonderful miracle the mind can play, when mastered and controlled.

PATH OF REALIZATION

I. Search after Truth, II. Worship of Truth, III. Faith and Knowledge, IV. Necessity of Symbols, V. Efficacy of Prayer, VI. Ecstasy, VII. Salvation through Love.

These inspiring lectures from the lips of a Man of Realization will help the true and sincere seekers after Truth.

ATTITUDE OF VEDANTA TOWARDS RELIGION

Vedanta Philosophy—Practical Vedantism—Is Vedanta Pantheistic—Ideal of Vedanta and How to Attain to It—Vedanta in daily Life—Ethics of Vedanta—True Basis of Morality—Vedanta towards Religion—Religion of Vedanta—Theory and Practice of Vedantic Religion—Evolution and Religion—The Necessity of Religion—Aim of true Religion—Unity in Variety of Religion—Universality of the Vedantic Religion—Ideal of Universal Religion—Steps towards Realization—Realization of the Vedantic Truth.

RELIGION OF THE TWENTIETH CENTURY

Swamiji has dealt in this book with a scientific treatment of religion and philosophy which delights the modern mind of the twentieth century.

PHILOSOPHY AND RELIGION

Comparative Study of Philosophy and Religion of the East and West.

Philosophy and Religion—Vedanta Philosophy—Teachings of Vedanta—Religion of Vedanta Philosophy—Religion of the Hindus—Unity and Harmony—Cosmic Evolution and its Purpose—Philosophy of Good and Evil—Word and Cross in Ancient India—Who is the Saviour of Souls—God our Eternal Mother—Divine Communion—Way to the Blessed Life—Appendix.

'Of the tree of knowledge', said Swami Abhedananda, 'Philosophy is the flower and religion is the fruit. Philosophy is the theoretical side of religion, and religion is philosophy in practice'.

WORD AND CROSS IN ANCIENT INDIA

A short history of the sacred Word and Cross in ancient India.

INDIA AND HER PEOPLE

I. The Prevailing Philosophy of today, II. The Religion of India today, III. The Social Status of the Indian people, their system of caste, IV. Political Institutions of India, V. Education of India, VI. The Influence of India on Western Civilization, and the Influence of Western Civilization on India. VII. Woman's Place in Hindu Religion.

CHRISTIAN SCIENCE AND VEDANTA

Christian Science does not see any harmony between the absolute truth and the scientific truth discovered by socalled mortal mind. but Vedanta, on the contrary, sees perfect harmony underlying all the laws and phases of Truth. which human minds have discovered. The Swami has ably and marvellously proved this fact in this neat volume.

HOW TO BE A YOGI

Introductory—What is Yoga—Hatha Yoga—Raja Yoga—Karma Yoga—Bhakti Yoga—Jnana Yoga—Science of Breathing—Was Christ a Yogi.

The book contains the directions that must be followed in physical as well as in mental training by one who wishes to have full and perfect control of all his powers.

DIVINE HERITAGE OF MAN

Existence of God—Attributes of God—Has God any Form—Fatherhood and Motherhood of God—Relation of Soul to God—What is an Incarnation of God —Son of God—Divine Principle in Man.

SWAMI VIVEKANANDA AND HIS WORK

For the first time the Vedanta Society of New York in America celebrated the birth anniversary of Swami

Vivekananda after his passing away in the year 1902, by holding a public meeting in Carnegie Lyceum, New York. In this meeting Swami Abedananda, President of the Vedanta Society, delivered this little but illuminating speech.

SELF-KNOWLEDGE

I. Spirit and Matter, II. Knowledge of the Self, III. Prana and the Self, IV. Search after the Self, V. Realization of the Self, VI. Immortality and the Self.

DOCTRINE OF KARMA

A Study in the Practice and Philosophy of Work

I. Law of Causation, II. Law of Action and Reaction, III. Law of Compensation IV Law of Retribution, V. Philosophy of Work, VI. Secret of Work, VII. Duty or Motive in Work. *Appendices* : A. Delusion, B. Mind and Heart.

LECTURES IN INDIA

Comprising all the lectures and replies to the various Addresses of Welcome—Discourses and conversations—A complete account of the Swamiji's memorable tour throughout the whole of India in 1906.

REINCARNATION

I. Reincarnation, II. Heredity and Reincarnation, III. Evolution, and Reincarnation, IV. Which is Scientific—Resurrection or Reincarnation, V. Theory of Transmigration.

UNITY AND HARMONY

It explains that the *Atman* is the source of Unity and Harmony. When a man attains Self-knowledge, he finds no contradiction with any one and any thing.

SPIRITUAL UNFOLDMENT

Self-Control—Concentration and Meditation—God-consciousness.

IDEAL OF EDUCATION

Ideal of Education—Practical Education—Women's Education—An Address to Educational Conference in America.

GREAT SAVIOURS OF THE WORLD

Krishna and his Teachings—Zoroaster and his Teachings—Lao-Tze and his Teachings—Buddha and his Teachings—Christ and his Teachings—Christ and Christmas—Vedanta and the Teachings of Jesus—Did Christ teach a new Religion—Mohammed and his Teachings—Ramakrishna and his Teachings.

MEMOIRS OF RAMAKRISHNA

Life and Teachings

His Life Divine—Dialogues of the Master in excellent English—Personality of the super-mystic has become living in these sweet incidents—A learned Introduction by the Swami reveals a new light to understand the Life and Teachings of Sri Ramakrishna, translated into various languages of the world.

HUMAN AFFECTION AND LOVE

This especially applies to the closing chapter where aptly chosen illustrations so dear to the Oriental mind elucidate the two characteristics of ecstatic love, the three states of consciousness and their correspondence to the five sheaths of the soul, beyond which is the true self or Absolute.

AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY ON PANCHADASI

An attempt of throwing light upon the Vidyaranya or Vivıana School of Vedanta, This Inroduction will

serve as a guide tthe seekers of Vedantic truth and knowledge.

YOGA PSYCHOLOG

The Patanjala system Raja Yoga has been explained with scientific manne It comprises with the chapters on : I. Steps to atn Yoga—II. Obstacles to the Practice of Yoga—I Remedy and Practice—IV. Science of Breath—V.Psychic Prana—VI. Concentration—VII. Meditn—VIII. Superconsciousness —IX. Kriya Yoga— Nescience and the World —XI. Bondage an Freedom—Attachment and Aversion—XII. Karmand Meditation—XIII. Mystic Word and Godconscusness—Appendix : Ego and Egoism. The book isn unique contribution to the domain of the theory d practice of Raja Yoga.

VEDANTA PHILOSOHY

It has been deliveredin the Philosophical Union of the California Univety, in 1901. Prof. Howison presided, and 400 disguished professors of different Universities of Amica attended the lecture. A unique contribution tthe Vedanta philosophy, with a synthetic vision.

BHAGAVAD GITA HE SYNTHESIS

It contains the Sanskit Texts, the Swami's own translation in Englia, and his elaborate English commentary. A systmatic treatment on the *Gita*. The psychology and phlosophy of the *Bhagavad Gita* have been depicted n i, in their true perspective.